নিবেদন

প্রায় বছর দশেক আগে লেখার আনন্দেই বইটি লিখেছিলুম। লেখাটি ভ্রমণ কাহিনী। এর মূল উপাদান ঐতিহাসিক তথ্য ও কিছু পথে দেখা চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা। চরিত্রগুলি কিছু সত্য ও কিছু কল্পণার সংমিশ্রণে হয়েছে সাহিত্যে সৃষ্টিরই তাগিদে। আমি ঐতিহাসিক নই। তবু যতটা পেরেছি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলুম। ঐতিহাসিক তথ্য গল্পের মত সরস করা যায় কিনা বইটি তারই প্রচেষ্টা। সফল হয়েছে কিনা সে কথা পাঠক পাঠিকারা বিচার করে নেবেন। তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে পাণ্ডুলিপিটি শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবীকে দেখাই এবং তাঁরই উৎসাহে শনিবারের চিঠিতে পাঠাই। লেখাটি শ্রদ্ধেয় সজনীবাবু গ্রহণ করে ভাল হয়েছে জানিয়ে আমায় উৎসাহিত করেন ও শনিবারের চিঠিতে সময়মত প্রকাশিত হবে জানান। পাণ্ডুলিপিটি শনিবারের চিঠিতে বছর খানেক থাকার পর খবর নিয়ে জানি স্থানাভাবের জন্য সমস্ত বইটি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয় শুধু বৃন্দাবন পর্বটিই প্রকাশিত হবে—তখন আমি প্রথম অংশটি জয়শ্রীতে পাঠাই ও পাঠানোর পরের মাস অর্থাৎ ১৩৬২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকেই কয়েক-মাস ধারাবাহিক ভাবে জয়শ্রীতে শ্রদ্ধেয়া লীলা রায় আমার লেখাটি প্রকাশ করেন। সেই বছরই অর্থাৎ ১৩৬২ চৈত্র সংখ্যায় বৃন্দাবন পর্বটি শনিবারের চিঠিতে এবং হরিদ্বার পর্বটি ফাল্গুণ সংখ্যায় বসুমতীতে প্রকাশিত হয়।

পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছেই রাখা ছিলো এবং হয়ত রাখাই থাকত কারণ প্রকাশক খুঁজে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হত না। P.E.N. উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তাঁকে আমার পাণ্ডুলিপিটির কথা জানাই। তিনি বইটী প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করে আমায় বাধিত

করেন। বইটাতে দোষ ত্রুটী যা, সে সবই আমার কিন্তু প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক পাঠিকারা যদি কিছুমাত্র আনন্দ পেয়ে থাকেন তবে তার সমস্ত কৃতিত্বই শ্রদ্ধেয় সুধীরবাবুর—তাঁকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সকলকেই যাঁরা আমার লেখাটি প্রকাশিত করে আমায় উৎসাহিত করেছেন।

বিভা সরকার

প্রীতি ধন্য করল যারা তাদেরই স্মরণে

পথের টানে

ভ্রমণ পিয়াসী মন ঘুরে মরে পথে পথে—পথ বেঁধেছে বন্ধনহীন বন্ধনে।

বনানীর শ্যামলিমায় বন্ধুর প্রান্তরে, সাগরের ঢেউয়ের দোলায়, পর্বতের শিখরে মন-শিখী, নৃত্য পাগল। ঘরের আগল আপনি যায় ভেঙ্গে!

মনের গোপনে কে এ চঞ্চল অহরহ আন্‌চান্ করে! পথিক বেরিয়ে পড়ে পথে। সহায় সম্বল তার একমাত্র যাযাবরীয় নেশা!

বিবেক তর্জনী তোলে—তীর্থ-প্রয়াসী মন ঘরে যা—সবার সেরা তীর্থ যে তোর সেইখানেই। হায়রে! মিথ্যে এ সদুপদেশ, বৃথা এ তর্জনী তাড়ন। ভূস্বর্গ চঞ্চল যাঁর খেয়ালে সেই বিরাটের স্পর্শ কি পাব না? তাঁর রূপ কি দেখব না দুনয়ন ভরে। জীবনের সার্থকতা তবে কোথায়? পথের হাতছানি যে পেয়েছে সেই জানে এই অজানা পথের অজেয় আকর্ষণ! কোনও বন্ধন তাকে বাঁধতে পারে না, রাখতে পারে না কোনও সজল চোখের চাহনি। সে যাবে বারে বারে, ফিরে আসবে বারে বারে। স্থিতি তার নেই। চির পথিক তোমার জয় হোক

জন্ম যাযাবর যাত্রা সুরু করল। সাগর পারের স্বপ্ন—সে থাক দূরে। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও দুহাতে কুড়িয়ে—যা পেলে না, নাই বা পেলে! সামান্যের মধ্যেও যে অসামান্যকে খুঁজে পায়, সেই ত দৃষ্টিবান, অপরের দরদে যে দরদ বোধ করে সেই ত দরদী!

বিরহী বর্ষার বর্ষণক্লান্ত আনন্দ-লগ্নটীতে যাদুর কাঠি হাতে নিয়ে শরৎ কি ধরায় এল? আলোছায়ার অপূর্ব্ব এ আলোড়নে

বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয় কি তাই আনচান করে উঠল! কাশ কমলের দল কি তাই ফুল ফোটানোর মাতনে হল মাতোয়ারা, শেফালি বকুলে কি জাগল আগল-হারা মত্ত মাতন? প্রভাত-রবির সমস্ত মহিমা কি ছড়িয়ে পড়ল মাঠভরা ধানের সোনায় সোনায়! রাঙ্গা ধূলির তুফাণ তুলে মত্ত বাতাস ছুটে চল্লো কোন্ দিকে?

তবু এ কঙ্করময় বনভূমির কি বৈরাগ্যময় রূপ। সর্ব্ব অঙ্গে তার জড়ানো গৈরিক বসন! ঘর-ভোলানো এ রূপ অস্থির করে তোলে। পথ-পিয়াসী মন বেরিয়ে আসে কিসের সন্ধানে?

কে যেন অলক্ষ্যে বলে, ওরে হিসাবী, সব যে তোর বেহিসেব হয়ে গেল! জীবন-পথে কি পেলি কি পেলিনে, কাজ কি তার হিসেব নিকেশে! বিশ্ববাউল ডাক দিয়েছে উদাস করা সুরে··· শীতের পর বসন্ত····বর্ষার পর শরৎ····'এই তরে ভাই মানব-জীবন ফুল ফোটা, ফুল ঝরা' বেজে ওঠে বাউলের একতারায়। পেছনের সব থাক পেছনে পড়ে, ভার-মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে চল। রাঢ়ের এ রাঙ্গামাটী কি মানুষের চোখের জলে ভিজে? এ গেরুয়া প্রান্তর কি জন্ম-উদাসী····এখানের আকাশে বাতাসে কি ঘর-ভোলানো সর্ব্বহারার ডাক!

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥

কোথায় চলেছে এ আত্মহারা বৈরাগিনী? একতারার ঝঙ্কারে ঝংকৃত হচ্ছে ও কিসের সব-ভোলানো গুঞ্জন? এরা ত ফাঁকি দেয় না। প্রাণ ভরেই ভালবাসে; প্রাণ খুলেই গ্রহণ করে। কিন্তু কোন আসক্তির শক্তিই যে এদের পথ-চলা রোধ করতে পারে না—কিসের টানে কার সন্ধানে এরা এমন চির-মুক্ত, চির-উদাসী? গেরুয়ামাটী কি যাদু জানে? তাই বা হবে; নয় ত কেন যুগে যুগে এ মাটিকে ঘিরে এমন বৈষ্ণবের সমারোহ!

অজানা নেশায় মানুষ ঘুরে মরে পথে পথে। আদি অন্ত তার আজও রহস্যাবৃত, আজও কুহেলিকা। অলক্ষ্যে সকৌতুকে কে যেন বলে, মানুষ কত আবিষ্কার করল, কত ভাঙ্গল, গড়ল। কত বিজ্ঞানের অন্বেষণ, দার্শনিকতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা! কিন্তু হায়রে! তবু সে আজও শিশুর মতই অসহায় সেই অদৃশ্য শক্তির পায়, যার ইচ্ছায় বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে যুগ যুগান্তর কাল ধরে!

কোন্ সে আদিম কিরাত-দম্পতীর মত বনলক্ষ্মীর বন্য ছেলেমেয়ে সাঁওতাল সাঁওতালী চোখের ওপর জীবন্ত ছবি এঁকে কঠিন মাটীতে পা ফেলে ফেলে দূরে মিলিয়ে যায়। ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে আজও এরা সুন্দর শিশুর সরলতায়। দুঃখ দৈন্য অভাব অনটনকে এরা উপহাস করেছে প্রাণ-প্রাচুর্য্যে। তাই এরা মন-মাতানো মাদল বাজায়। চাঁদনী রাতে বাঁশের বাঁশি বন্য সুরে চঞ্চল করে তোলে নিঃসঙ্গ বন্ধুর প্রান্তর!

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সে কোথায়?—এই বর্দ্ধমানের সিঙ্গি গ্রামেই না!

আর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের দামুন্যাও যে এই রাঙ্গামাটীর দেশেই। বৈষ্ণব মহাতীর্থ অগ্রদ্বীপও এইখানেই। পঞ্জিকার ১৫৩০ এর পাতায় দাগ টেনে এইখানের একচক্রা গাঁয়েই না জন্মেছিলেন বৈষ্ণব কুলতিলক নিত্যানন্দ মহাপ্রভু! আর তারও পর বিখ্যাত মঙ্গলবংশে এই একচক্রাতেই না বৈষ্ণব মহাকবি জ্ঞানদাসের হয় জন্ম—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁন্ধিলু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

ভুল হয়ে যায় এ কার ?—জ্ঞানদাসের না চণ্ডীদাসের।

এ হেন জ্ঞানদাসের কেঁদুড়ি বা কাঁদড়া গ্রামের মঠ আজও দূর দূরান্তর থেকে বৈষ্ণব জনকে টেনে আনে এই বীরভূমের গেরুয়া মাটীতে। বহু বৈষ্ণব-পদরজঃ-রঞ্জিত এ মাটি যে বৈষ্ণবের জয়তিলক —এ ধূলি যে তার অক্ষয় স্বর্গ। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র-জন্মধন্য বহু পুরাতন কীর্ত্তি বুকে নিয়ে পাণ্ডুয়া আজও দাঁড়িয়ে আছে পথিক জনের মন ভোলাতে। বাঙ্গালীর কবিকুলের গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মহা সঙ্গম হয়ে গেছে এই বীরভূমে। বৈষ্ণব কবিদের স্পর্শ-ধন্য এ যে মহাতীর্থ।

'দেহি পদপল্লবমুদারম্', 'ভক্তেরই ভগবান', বলে গেলেন কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেব সারা ভারতের হৃদয় জয় করে তাঁর গীতগোবিন্দে।

তারপর ঐ ত নান্নুর যেখানে বাশুলী দেবীর পূজারী কবি চণ্ডীদাস বলে গেলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার অধিক নাই।' তাই না তাঁর চোখে রজকিনী রামী হয়েছিল শ্রীরাধা রূপময়ী: তাই না দেখি,

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডাদাস গায়।

নিকষিত হেমই বটে। মর্ত্ত্যে এ প্রেম দুর্ল্লভ। কোথায় সে অমৃত-সন্ধান।

স্তব্ধ রাত্রির মৌন মূর্চ্ছায় নীল দিগন্তের পানে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই—নীলবসনা এ কোন সুন্দরী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কার অভিসারে চলেছে? বিশ্ব-প্রকৃতিও কি এই পরম আনন্দ-লগ্নে বিশ্বনাথের অভিসারিকা?

থামল গাড়ী বোলপুর—গেরুয়া ধূলি কি যেন যাদু জানে। মনের বাউল একতারা হাতে ঘর ছেড়ে পালায়। তাইনা বাউল কবি শান্তির নীড় বাঁধলেন বন্ধুর এই গেরুয়া দেশে। তাইত এখানে পথে পথে এত ঘর-বিবাগী উদাসী ঘুরে বেড়ায় ভবঘুরে হয়ে—

'নিঠুর গরজী তুই কি মানস মুকুল
ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে ?

সবুর সয় না !

এ সংসার যে তাকায় না কারো পানে। পালিয়ে যে গেল বেঁচে গেল, পিছনে যে রইল পড়ে বিড়ম্বনা তারই। আপন ভোলা এই দেশের রূপ, তাইত এর বুকে আশ্রম স্থাপনা করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ছাতিম তলায় পেলেন পরমতম দীক্ষা। এই কঙ্করময়, মরুভূমে কত সাধনায় কত বেদনা অধ্যবসায়ে, গড়ে উঠল শ্যামল বনভূমি। এ যে তপস্বীর তপোবন।

মহর্ষির আদি বাড়ীটি আজ অতিথি নিকেতন। পাশেই একটি পুকুর—আজকাল প্রায়ই থাকে জলহীন হয়ে। সামনের প্রবেশ পথের বাম ধারে উপাসনা মন্দির।

প্রভাতী ভজন নিত্য আশ্রমের বাতাস পূত পবিত্র করে তোলে। তারও আগে গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গায় ভোরের বৈতালিকদল।

আশ্রমের পেছনে আম্রকুঞ্জ। ঋতুতে ঋতুতে কত উৎসব কত বিদ্বৎ-সভা। কত বরেণ্য মানবের পায়ের ধূলায় এ মাটী ধন্য !

আম্রকুঞ্জ ছাড়িয়ে শালবীথি—পায়ে পায়ে এগিয়ে চল, সিংহসদন বা ঘণ্টাঘর পড়বে বাঁ দিকে। ছাত্রছাত্রীদের যত সভা, যত উৎসব,

যত নৃত্যগীত এই গৃহেই। এইটীই এ আশ্রমের সভা গৃহ। ডান দিকে বিদ্যাভবন—শ্রীভবন—ভোজনাগার। বাঁ ধারে ছেলেদের খেলার মাঠ—আরও একটু যাও কলাভবন, সঙ্গীত ভবন তারও পরে।

গুরু-পল্লী ছাড়িয়ে এগিয়ে যাও, লাল-বাঁধ জলে টলমল, ছেলেরা সাঁতার কাটে, স্নান করে। খোয়াইয়ে হারিয়ে একাকার হয়ে গেছে তারও ওপাশ—অতিথি নিকেতনের সীমানা-প্রান্তের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা উত্তরায়ণে। মহর্ষি পিতার রাজর্ষি পুত্রের বাসভবন।

এ যে রাজপুরী!

সুন্দর লাল পাথরের বাড়ীটির সর্ব অঙ্গে আছে বিশিষ্টতা, আছে নৈপুণ্য। এর ভিতরে দেব-বিগ্রহ নেই, আছে শিল্প-দেবতার বিচিত্র অর্চ্চনা। কত না তার রূপ, কত না তার ভঙ্গী। শিল্পীর কল্পনা এখানে তার মূর্ত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে আছে কবিগুরুর স্বহস্ত অঙ্কিত কত ছবি—আরও আছে অবন ঠাকুরের টুকিটাকি, কুটুম-কাটাম। কত আর বলব! উত্তরায়ণের বাগান ছোট হতে পারে, কিন্তু কত যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য সেখানে। কত দেশের কত বিদেশিনী ফুল এখানে পেয়েছে সাদর অভ্যর্থনা, সযত্ন সমাদর। সহকার শাখাও এখানে লতিয়ে উঠেছে। পল্লবিনী তার রূপ। কবির প্রিয় সারস-ময়ূরগুলি স্বচ্ছন্দে বেড়াচ্ছে ঘুরে।

ভবঘুরে কবি থাকতে পারতেন না একজায়গায় বেশী দিন। তাই তৈরী হয়েছে কোনার্ক। গড়ে উঠেছে কবির পরম প্রিয় মাটির ঘর শ্যামলী, গড়ে উঠেছে পুনশ্চ, কবির শেষ বাসস্থান উদয়ন।

কোনার্কের গা বেয়ে উঠেছে নীলমণি লতা, ফুল-ফোটার আনন্দ-লগ্নে হয়ত ফোটে গুচ্ছ গুচ্ছ নীলমণি মঞ্জরী। সামনের বিরাট শিমূল গাছটিকে সহস্র পাকে জড়িয়ে শীর্ষে উঠে গেছে মালতীলতা—এই বুঝি—

ঐ পিয়াল তরুর কোলে
মালতীলতা দোলে !

রাত্রে সেদিন দেখি সহস্র জোনাকি কোন খেয়ালে আলোর মিটিমিটি দেয়ালী জ্বালিয়ে দিয়েছে এই গাছটিকে ছেয়ে !

আশ্রম ছাড়িয়ে হিমঝুরি বীথি পার হয়ে আবাগড়ের রাজবাড়ী। লাল কাঁকরের রাস্তা চলে গেছে তারপর খোয়াইয়ের বুকে গোয়ালপাড়া গাঁয়ের দিকে।

ক্ষীণা যে গিরিকন্যা শীতে, বর্ষায়, সেই হয় অনন্যা—যৌবনমত্তা কল-নাদিনী জলোচ্ছ্বাসে। শীতের এ শীর্ণ কোপাই বর্ষায় হয় কোপবতী।

এযে মানবের মহামিলনের তীর্থ। এখানে যে সারা বিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন কবি। এরই বুকে বিরাজমান বিরাট চীনাভবন। তার শিল্প বিদ্যাবিজ্ঞান নিয়ে। এশিয়ার দুটি ঐতিহ্যময় গৌরবান্বিত জাতি পরস্পর পরস্পরকে সখ্যতার বন্ধনে বেঁধেছে। বাংলার শেষ ব্রাহ্মণ তাঁর আদর্শ আশ্রম রচনা করে রেখে গেছেন এইখানেই।

তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার দায় আশ্রমবাসীদের, দেশের, দশের—এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হবেন কিনা তার জবাব দেবে ভাবি কাল।

শ্যামল বনানী, ধূসর পর্বত, গিরি নদী বন, বন্ধুর প্রান্তর, এরা যে সদাই জাগ্রত, লীলাচঞ্চল। এদের ত বার্দ্ধক্য নেই—নেই অবসাদ। নদীর জল একঘাটে দুবার আসে না। যে পথে যায় সাধ্যমত সঞ্জীবিত করে যায় পথের দুধার। প্রকৃতির এই লীলানিকেতনে লুকিয়ে আছেন যে চিরনবীন, ছয়টি ঋতুর ভরা ডালায় এ বিশ্ব যাঁর বন্দনা মুখর, হে বিরাট অদেখা, সেই তোমাকে নমস্কার করি !

পাথেয় যদি আর কিছু নাও মেলে তবু তোমার এই বিচিত্র জগৎকে প্রাণভরে দেখবার সৌভাগ্য আমার হবে—তাই হবে আমার পরম পাওয়া! জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়!

বহুত্বের মধ্যে, জনারণ্যের মাঝখানে, আমি আত্মপরিচয়ের সুযোগ পাব। পাঠ করব জীবন-বেদ।

আমি আমাকেই জানব সাধারণের মাঝখানে প্রকৃতির বৃহত্তর পটভূমিকায়। কুপ-মণ্ডুক, সাগরের অতল রহস্যের সন্ধান কি জানি? গোষ্পদেই হাবুডুবু খাই। ডাক যদি এল, তবে কেন এ দ্বিধা? কিসের পেছু-টান?

পিছে নয়! আগে চল! আগে চল।

সাঁওতাল পরগণা—রুক্ষ রূঢ় পাহাড়ী দেশ 'তালি-তমালি বনরাজি নীলা'।

কাশফুলে ছেয়ে গেছে রেল লাইনের দুধার। শরতের আকাশে বাতাসে মন মাতান আলোছায়ার হাতছানি, মাঠে মাঠে ধান কাটা সবে হয়েছে সারা।

নতুন ধানের গন্ধে গ্রাম্য বাতাস ভরপূর। দলে দলে গৃহের পানে ফিরে চলেছে আলো করা কালো রূপ, শালবনের মাঝ দিয়ে।

ঘরে ঘরে হাঁড়িয়া সিদ্ধ হয়েছে—ঘনায়মান সন্ধ্যায় দূরের মাদলের ক্ষীণ বোল শোনা যায়—বাঁশের বাঁশী বেজে উঠবে যাদু করা সুরে। সাপুড়ের বীণ শুনে সাপেরা যেমন স্থির থাকতে পারে না—এরাও তেমনি স্থির থাকতে পারবে না। দলে দলে কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে—নাচের মাদকতায় জমে উঠবে উৎসবে চাঁদনীরাত। 'বন্যেরা বনেই সুন্দর।'

আসানসোল—কোলিয়ারীর দেশ। মাটীর কত গভীর পর্যন্ত এখানে কালো হয়ে আছে কে জানে!

সারা ভারতের বেশীর ভাগ কয়লা যোগায় এই দেশ—কালো সাঁওতাল কঠিন হাতে গাঁইতি মেরে কঠিন ভূমি কেটে কেটে জমিয়ে তোলে কালোর স্তূপ—কয়লার পাহাড়। কত দুঃখ, কত দৈন্য, কত অত্যাচারের কাহিনীতে এদের জীবন জর্জর। সভ্য মানুষের স্বার্থের কলুষতায় এ বন্যেরা কলুষিত। তবুও এরা হাসতে জানে, নাচতে জানে, বাঁচতে জানে সব দুঃখ দৈন্যকে তুচ্ছ করে।

পেট ভরে এরা পায় না দুবেলা দুমুঠো খেতে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, তবু হাহাকার নেই।

এরা যে মাটীর ছেলেমেয়ে। অল্পেই এদের সন্তোষ। শরীরের রক্ত জল করে এরা তুলছে কালোর পাহাড়, আর ধনীর ঘরে জমে উঠছে সোণার পাহাড়। বেড়ে চলেছে অত্যাচার ব্যাভিচার অন্যায়। তবু প্রশ্ন জাগে—কে সুখী? এরা—না তারা, যারা পরের অন্ন গ্রাস করছে মিথ্যা সভ্যতার আওতায়?

চিন্তার পর চিন্তার ঢেউ ওঠে। অতল মানস সমুদ্র সদাই ঊর্মি চঞ্চল! দূরে দূরে অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলছে কোলিয়ারীর আগুনের ছটা, কাঁচা কয়লা-পোড়ান হচ্ছে।

মন্থর হয়ে আসে যন্ত্রদানবটার গতি—বরাকর নদী পার হবে একটু পরেই। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি কোলিয়ারীর যন্ত্রপাতি—অন্ধকারে দৈত্যের মত দেখাচ্ছে তাদের। আসে পাশে গড়ে উঠেছে কুলি কামিনদের একটি বস্তি-বিশেষ। টিমটিম করে জ্বলছে দুএকটি হ্যারিকেনের আলো—যে দোকান বা ঝোপড়ীটী থেকে শিখা উজ্জ্বলতর দেখা যাচ্ছে, সেটি বোধ হয় তাড়িখানা। কুলি-পতঙ্গেরা যেখানে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে আসে। এদের অন্য একটি চির সাথী হচ্ছে সুদখোর মহাজন। কবে কখন কোথায় তারা বা তাদের বাপপিতামহ ঋণ করেছিল, অনেক সময় এ তারা ভুলেই যায়। আজন্ম ঋণ শুধতে যায় কেটে। প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে দেখি

রেলওয়ে কর্মচারীদের মৃদু কোলাহল, চলা-ফেরার মন্থর আয়োজন। ছোট্ট ষ্টেশন জন-মানবহীন। পাণ্ডব-বর্জিত এই দেশে নেই জনতার উত্তেজনা, মানুষের ব্যস্ত-ত্রস্ত পদক্ষেপ। গ্যাস পোষ্টটীর নীচে কয়েকটি সাঁওতাল একটি পাত্রে স্তূপীকৃত সাদা রংয়ের কি যেন ঘিরে বসেছে। দেখে মনে হল ভাত। লঙ্কা ও নুনের সংযোগে সেই একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে অন্নমুষ্টি তুলে নিয়ে গো-গ্রাসে গিলছে পরম তৃপ্তিতে। কালো কালো মুখে ঝকঝকে সাদা দাঁতের প্রাণখোলা হাসি কিছুটা যেন বীভৎসই দেখাচ্ছে। দশ ব্যঞ্জনের স্বাদ জীবনে যাদের রসনা পরখ করেনি, তারা তার অভাব বোধ করবে কেমন করে। তাদের জগতে নুন পান্তাই নিত্যকার আহার। বড় জোর একটা কাঁচা লঙ্কা বা পেঁয়াজ। আর উৎসবমুখর রাত্রে ঝলসানো মাংস ও হাঁড়িয়ার ঘটা। এই নব্য পৃথিবীতে আজও এরা সেই আদিম প্রকৃতিরই রয়ে গেল!

মনে হয়, হয়ত বা বেশ আছে এরা! সভ্যতার পূজা করে শেষ পর্যন্ত কী পেল সভ্য মানব? স্বাভাবিক হৃদয় বৃত্তি, চিত্ত বৃত্তির বিকৃতি ঘটিয়ে মানবতার পরিবর্তে জেগে উঠছে দানবতা। ধ্বংসের উন্মাদনায় মারণোন্মুখ পৃথিবী! তাইত আজ মানুষের ব্যর্থতায় ধরিত্রীর আর্ত্ত ক্রন্দন গুমরে গুমরে উঠছে, দিকে দিকে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে পালিশকরা সভ্যতার তলায় স্বচ্ছ মানবতার চাপা কান্না।

দিনান্ত ঘনিয়ে এলো! রাত্রি দিনের এই সন্ধিক্ষণটির কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে। অ-ভাবুক মনও বুঝি ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হয়ে পড়ে এই লগ্নটীতে, দরদী মন, ভাবুক মনের ত কথাই নেই!

বিশ্বের অশান্ত বিরহী যেন এই সময়টিতে আবার নতুন করে জেগে ওঠে—মনের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে—নেই! নেই! কি যেন চাই! কাকে যেন চাই; কিছুই যেন জীবনে পাওয়া হল না—কিসের এ আকিঞ্চন? এর ত কোনও জবাব পাইনে! মনে হয় এ বুদ্ধি

দিয়ে বিচারের বাইরে! এ হয়ত সেই জন্ম বিরহীর আকুল আকুতি তার চিরসুন্দরের জন্য; লুকিয়ে বসে আছে যে মনের অতল কোঠায় চিরদিন। কোথায় তার সেই অজানা বাঞ্ছিত—কে জানে? তবু বিশ্ব-প্রকৃতির আহ্বানে পথিক বেরিয়ে পড়ে পথে, নির্ঝর পর্বত অরণ্যের ডাকে!

গাড়ীর মধ্যে তাকিয়ে দেখি এযে জনারণ্য—কত লোক এল গেল, কত লোক আসবে যাবে। জীবনে এমন কত লোকের উদয়-অস্ত নিত্যই ঘটে থাকে। কেউ দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার আগেই যায় মিলিয়ে। কেউবা চিরদিনের জন্য আসন করে নেয় স্মৃতির মণিকোঠায়। সব সময় এর কবাট খোলে না, তবে বিস্মৃতির অতলেও তারা তলিয়ে যায় না। মাঝে মাঝে দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে, আবার যায় চলে।

আমরা সকলেই পরস্পরের কাছে অপরিচিত, তবু আমরা আজকের জন্য সহযাত্রী। এই সামান্য সূত্রের বন্ধনে নৈকট্য বোধ করি। মনে হয়, আমরা যেন সকলেই বড় কাছের জন, অন্তত আজকের এই বিশেষ দিনটির জন্য। বহুবার দেখেছি সহযাত্রী হিসেবে আমরা এমন অনেককেই পেয়েছি যাদের সাহচর্য আমাদের মনের সঞ্চয়ের ঝাঁপিতে চিরদিনের মত সঞ্চিত হয়ে আছে পরম যত্নে।

জন্মযাত্রী আমরা—আমাদের আদিও রহস্যাবৃত, অন্তও অজানা; জানা শুধু মাঝের এই কটা দিন, যা নিয়ে আমরা কত না চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া-নেওয়ার ইতিহাস গড়ে তুলি। কেউ পায় জীবনে পরশমণির ছোঁয়া, সে সোণার ফসল ফলিয়ে যায়। কোন অভাগা শুধু হাতড়েই বেড়ায়, সে ক্ষ্যাপার জীবন—খুঁজে খুঁজেই যায় কেটে!

ধানবাদ—কোলিয়ারীতে ভরা দেশ। তোপচাঁচী এখানের দর্শনীয় বস্তু। তিন দিক উচুঁ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ও এক দিকে বাঁধ

দেওয়া একটি বৃহৎ প্রকৃতি-সৃষ্ট হ্রদ এই তোপচাঁচী। কাক-চক্ষুর মত স্বচ্ছ জল টলমল করছে। সমস্ত কোলিয়ারীতে জল যোগান হয় এই তোপচাঁচীতে ফিলটার করে। হ্রদটিকে ঘিরে সুন্দর পিচের রাস্তা। বেড়ানোর পক্ষে মনোরম, পিকনিক করতেও বটে!

মাঝে পড়ে 'সত্‌গড়ি' বা সপ্তগড়। মাঝে মাঝে মেলা বসে—তারপরই কাত্রাসগড়। হাট বাজার আছে—আছে স্কুল, সরকারী হাসপাতাল। কাত্রাস-গড়ের কাছেই আছেন নীলকণ্ঠ-বাসিনী দেবী; তাঁর নিরালা নিবাসে পাহাড়িয়া কত্রী-নদীর কূলে, ছোট মন্দিরে। বনতুলসীতে ভরে গেছে চলার পথ। আম, জাম, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বনস্পতিতে ঘেরা জায়গাটিতে দিনের বেলাতেই গা ছম-ছম করে। দেবী মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন। মুখ দর্শন কেউ পায় না। কিংবদন্তী শোনা যায়, তিনি মানুষ বলি নিতেন। ঐতিহাসিকেরা তা সমর্থন করেন। অন্যত্রও দেখা গেছে, বিগ্রহ যেখানেই নরবলি নিয়েছেন মুখ দেখান নি।

স্থানীয় লোকরা বলে দেবী একদিন ক্ষুধার জ্বালায় পুরোহিত কন্যাকে খেয়ে ফেলেছিলেন। কন্যার বসনাঞ্চল তখনও লেগেছিল তাঁর মুখে। তাই দেখে আছড়ে পড়েন দেউল-পূজারী রাক্ষসীকে শাপ দিতে দিতে। সেই থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, লজ্জায় জনসমক্ষে তা আর দেখাননি। দেবীর এ হেন দানবীপ্রকৃতি হয়েছিল কিনা জানিনা—তবে জায়গাটীতে কেমন যেন থমথমে ভাব। কাত্রাসগড় থেকে সুন্দর পীচের রাস্তা গেছে সোজা তোপচাঁচী পর্যন্ত।

ভোজন সমাধা করে ঘন হয়ে কাছে এসে বসলেন এক মাঝ বয়সী বিহারী; এখানের কোলিয়ারীতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন কর্মচারী হিসাবে। বোধ হয় আফিং সেবনের অভ্যাস আছে এবং বেশ মৌতাত জমে উঠেছে, নাকে একটিপ নস্য গুঁজে খুলে বসলেন

তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝাঁপি। বহুরূপী বিচিত্রমনা মানবের চিরন্তন ইতিহাস—হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহভরা দৈনন্দিন মাটীর কথা। কবে কোথায় কোন কোলিয়ারী ধ্বসে কত গরীবের অকাল মৃত্যু হয়েছিল, তারই বেদনা-বিধুর কাহিনী। কেমন করে দানবমনা মালিক আপন দোষ স্খালনের জন্য কত জীবন্ত অর্দ্ধমৃত হতভাগ্যকে কোলিয়ারীর কালো গর্ভে জীয়ন্তে বিলীন করে দিয়েছে; কলঙ্ক কলুষ সেই দানবীয় কাহিনী আজও শিহরণ জাগাচ্ছিল শ্রোতাদের মনে!

কোলিয়ারীর আগুন? ওরে বাসরে!! সে কি একবার লাগলে আর রক্ষে আছে? অগ্নির সে লেলিহান জিহ্বা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না—কি করবে নিরূপায় মানুষ—দূর দূর পর্যন্ত মাটী কেটে ঢালতে থাকে বালী, তুলতে থাকে প্রাণপণ শক্তিতে আশে পাশের খাদের কয়লা যতটা পারে।

'অরে ভইয়া হমারে রাজাসাহবকে বড়ে কোলসামেঁ আগ না লগতি তব তো বহ রাস্তেমেঁ সোনা বিছবা দেতে, সোনা! নশিব করেঁ ক্যা। আঁখকে সামনে লাখোরুপয়া কি দৌলত বরবাদ হো রহি হৈ, লেকন মজবুর হৈঁ, কুছ নহিঁ কিয়া যা সকতা হৈ। অরে ভইয়া! য়হি তো ঈশ্বর কি মহিমা, উনকি ইচ্ছা পর কিসি কি ইচ্ছা নহি চলতি। আজ যো অমীর, কল বহ ফকীর, য়হ হৈ দুনিয়া কি রীত। আগ লগে কেঁ্যা না—পাপকা বেড়া কঁহি থোড়িত নহিঁ। উনকি বুরাইওঁ কি ক্যা কুছ কমী হৈ? বহতো পৈসেকি ঘমাও সে অপনে আপকো দুনিয়া কি মালিক সমঝতে থে।

রামজী কহো ভইয়া! রাম রাম কহো—

অরে ভইয়া ইহাঁ কি হওয়াতো দুখিওঁ কি আত্মাওসে ভরি হুই হৈ? যো পূণ্যবান হোতেহৈঁ, উনে সব কুছ দেখাই দেতা হৈ।

বেচারেঁ। কি গতিত হুই নহিঁ। সব রাতভর ভূত পিশাচ বনকর ঘুমতে রহতে হৈঁ।'

বলে চল্লো বহু অভিজ্ঞ সেই কোলিয়ারীর কর্মচারী তাদের কলঙ্কিত ইতিহাস। কেমন করে পাঁচশ জন কুলি কেবলমাত্র মালিকের লোভের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। তলার পর তলা কয়লা খুঁড়ে চলেছে লোভী ধনলিপ্সু। খনন-রীতির নিয়মমত মাঝের খিলান গুলিও রাখতে চায় না—দ্বিগুণ মজুরির লোভ দেখিয়ে রাতারাতি খাতের কয়লা যত পারে বেআইনীভাবে কাটতে চেয়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই মৃত্যুযজ্ঞে অজ্ঞ অবুঝ কুলি কামিনদের দল বেশী রোজগারের আশায়। সেই যে তারা অন্ধকারের গর্ভে নেমেছিল—আর আলোর মুখ দেখেনি, আর বুক ভরে টেনে নিতে পারেনি উদার আকাশের নির্মল বাতাস। সেই যাত্রাই শেষ যাত্রা হয়েছিল—সেই হতভাগ্যদের। তাদের বুড়ো মোড়ল ঝুমরু ছিল না তখন সেখানে। ছুটে আসতে আসতে দেরী করে ফেলেছিল। সাবধান করার সুযোগ হয়নি তার হতভাগ্য অনুচরদের।

"একি করলি বাবু! এতগুলো মানুষকে এমন করে মরণের মুখে জেনে শুনে ঠেলে দিলি—ওরে বাবু! দে, দে ফিরিয়া দে আমার ছেলে। ওরে শয়তান, বদলা চাই! বদলা নেবই।" বলতে বলতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বুড়ো নেমে গিয়েছিল মাটীর তলায়, বাইরের লোকে মাটিতে কান পেতে শুনেছে তাদের অসহায় চিৎকার—শেষ জীবনাকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুকাতর আর্ত্ত আহ্বান। নিজের হাতে বাবু কেটে দিয়েছিল পাশের কোলিয়ারীর বদ্ধজল, চিরদিনের মত নীরব হয়ে গিয়েছিল সেই হাহাকার জল কল্লোলের তলায়।

কিন্তু আজও তারা রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় প্রতিকার চেয়ে, প্রতিহিংসা চেয়ে। আজও কান পাতলে শোনা

যায় সেই অশরীরী অভিশপ্ত আত্মাদের বিক্ষুব্ধ চিৎকার, সেই অভিশপ্ত হতভাগাদের অশান্ত ক্রন্দন এখানের আকাশে বাতাসে। ঝুমরু সর্দার আজও বুক চাপড়ে বেড়াচ্ছে 'বেটা দে! বদলা দে! বদলা!'

আকাশে বাতাসে কেমন ভয়াচ্ছন্ন থমথমে ভাব। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। মৃত আত্মারা যেন ভীড় করে আছে এ ছায়াছন্ন প্রান্তরে।

সত্যই যেন মনে হয় কারা গুমরে, গুমরে উঠছে নিস্ফল আক্রোশে রেলগাড়ীর ঘড় ঘড় রব ছাপিয়ে! নির্বাক নিস্পন্দ যাত্রীদের মনে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া। শোনা গেল শুধু বক্তার বিহ্বল কণ্ঠস্বর—

"রাম কহো ভইয়া! রাম রাম কহো—রাম নাম কহো।"

বিহ্বল মন আনমনা হয়ে কতক্ষণ ছিল জানি না—হঠাৎ চেয়ে দেখি দূরে দেখা যায় পাহাড়ের শিখরে পরেশনাথের শ্বেত মন্দির। জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধ্যানে মৌন একি অপরূপ রূপ পৃথিবীর! হিন্দু আমি, আমার মধ্যে যে পিতৃপিতামহ ঘুমিয়ে আছেন তাঁরাও যেন সুন্দরের এই অপূর্ব রূপে অভিভূত হয়ে শ্রদ্ধানত প্রণতি পাঠালেন আমার মধ্য দিয়ে। মন বলে উঠল, "ওগো মহেশ, ওগো সুন্দর, তোমায় বারংবার প্রণাম। কেন তোমার সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এ দেবতাদানবের লীলা প্রভু? একি তোমার কৌতুক? ওগো রহস্যময়! হে ভয়ঙ্কর সুন্দর! তোমার বিশ্বরূপ নয়ন ভরে দেখতে পেয়েছি, আর আমার কোনও আক্ষেপ নেই, সার্থক হয়েছে আমার জন্ম, তোমার সৃষ্টিতে অসুন্দর নেই, কলুষ নেই, এ শুধু বোঝার ভুল!"

'ভোর ভই হৈ জাগি ছুনিয়া ভাগি ঘন আঁধিয়ারী হৈ'—ঘুম ভাঙ্গল উষার আগমনেরও আগে, অতি প্রত্যুষে। আধ আঁধারের কুহেলিকায় সমস্ত আকাশ তখনও ধ্যানমগ্ন। নিস্তব্ধ তারার ঝাঁক মনকে অব্যক্ত ব্যথায় আকুল করে তোলে—হৃদয় উদাস হয়ে যায়।

আকাশে অস্তগামী ক্ষীণ চাঁদ তার ক্ষীণতর আলোয় সৃষ্টি করছে রহস্য লোক। জ্বল জ্বল করছে শুধু শুকতারা সুদূর সুন্দরের মহিমা জাগিয়ে স্তব্ধ নক্ষত্র পুঞ্জের মাঝখানে অতন্দ্র প্রতিক্ষায়!

ধীরে পূব আকাশ রাঙ্গিয়ে হয় উষার অপূর্ব আবির্ভাব। সমস্ত ব্যথা বেদনা যেন কুয়াশার মত দূরে সরে যায়—ভোরের নতুন আলো মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যায় তমসা থেকে।

সহরের বুকে বসে এমন করে ত সূর্য ওঠা দেখিনি, এমন করে সকাল হওয়া তো আগে চোখে পড়েনি। দিন রোজ আসে, কিন্তু বিশেষ দিন, বিশেষ মুহূর্ত্ত—এ তো রোজ আসে না!

সাঁওতাল পরগণা কখন পার হয়ে গেছে তার বন্ধুরতা নিয়ে—এখানে আর কোষ্ঠি-পাথরেখোদা আলো করা কালোরূপ চোখে পড়ে না, আর চোখে পড়ে না সেই আদিম দিনের কিরাত দম্পতি। কঠিন পায়ে, কঠিন মাটি মাড়িয়ে চোখে জীবন্ত ছবি এঁকে তারা আর দূরে মিলিয়ে যায় না।

ধরিত্রী এখানে শ্যামল মহিমায় ঢাকা—চারদিকে সবুজের সমারোহ চোখ জুড়িয়ে দিল, মন ভরিয়ে দিল বন্দনা গানে। অন্তরের নীরব কবি বন বনান্তের কলকাকলির সঙ্গে সমস্বরে বুঝি মুখর হয়ে উঠল—

'বাজাও আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।'

ছোট ছোট জলাশয়, গ্রাম, গ্রামান্ত, কত জনপদ পেরিয়ে চোখের উপর ছবির পর ছবি এঁকে রংয়ের আল্পনা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে অবিশ্রান্ত একটানা।

অতি প্রত্যুষে, ব্রহ্মমুহূর্ত্ত তখনও শেষ হয় নি—হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ গয়ার মাটিতে পা দিয়ে সচকিত হয়ে উঠলো মন। পারলৌকিক চিন্তায়, পিণ্ডদানের বিশ্বাস মহিমায় এ যে মহাপীঠস্থান। মন কল্পনা সায়রে ভেসে চলে—এই পথেই একদিন এসেছিলেন নদীয়াদুলাল। যে শচীমায়ের বরপুত্র এসেছিলেন এইখানে, তাঁর যে জন্মান্তর ঘটেছিলো বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে। কত মানুষেরই না পদধূলি পড়েছে এখানে—কত মহামানবের। "যদৃশী ভাবনা যস্য" সত্যই বুঝি তাই। মানুষ যেমন মন নিয়ে আসে তেমনি তার দর্শন লাভ হয়। ষ্টেসনের সামনেই রামশীলা পর্ব্বত দেখা যায়, ৩৭২ ফিট এর উচ্চতা। ভোরের প্রথম আলোয় হেসে ওঠে বন-বনান্ত। সহরের বুকে পা দিয়েই কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়। এমন মধুর প্রাকৃতিক রূপ এদেশের, কিন্তু কি অপরিচ্ছন্ন পথ ঘাট, বিশৃঙ্খল পুরাণো সহর। রাস্তার দুধারে খোলা ড্রেন ভোরের বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা দেখি এই প্রদেশে কত রাজার, কত রাজত্বের উত্থান পতন ঘটে গেছে—এই মহাভূমিতেই সাধনা করে গেছেন মহাতপা গৌতম। কৈবল্য লাভ করে গেছেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর। কত চৈত্য, কত মঠ রচনা করিয়েছিলেন অশোক চন্দ্রগুপ্তের মত রাজারা—দেশটা জুড়ে এত বিহার রচনা হয়েছিল যে এ প্রদেশের নামই বিহার হয়ে গেছে, কিন্তু এ সবই গত। আজকের বিহার একান্তই শ্রীহীন—আজকের বিহারী, আর মনে কোনও নাড়া দেয় না, একেবারেই গতানুগতিক। বহু প্রদেশ দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে কিন্তু এ জনতার মত অপরিচ্ছন্ন স্থূল প্রদেশবাসী আর কোথাও চোখে পড়েনি—

অপরিচ্ছন্নতায় এরা পাঞ্জাবীদেরও হার মানিয়েছে। মনে বড় আঘাত পাই—এর চূড়ান্ত রূপ দর্শন করতে বাধ্য হই গদাধর ঘাটে যাবার পথে। মনের সমস্ত শান্তি, সমস্ত প্রসন্নতা কোথায় যেন পালিয়ে যায়! প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে ওঠে। ঘাটে দাঁড়িয়ে এত ভীড় এত অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেও মন মুগ্ধ হয়ে যায় ওপারের দিকে তাকিয়ে। প্রভাত সূর্যের প্রখর আলোয় ঝলমল করছে ওপারের পান্না গলানো শ্যামশ্যামলিমা। ফল্গুনদী বালুস্তর মাত্র—তবুও ক্ষীণ স্রোতধারা বয়ে চলেছে বর্ষার পর ঘাটের কোল বেয়ে। কোথাও জল কোথাও চড়া। ওপারে ঘন সবুজ অরণ্যানী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। একটি তার মধ্যে সীতাকুণ্ড—সীতাদেবীর কাছে পিণ্ড ভিক্ষা করেছিলেন দশরথের লোকান্তরিত আত্মা এই মহাপুণ্য স্থানে, ইহাই কিংবদন্তী—সম্বলহীনা সীতা বালুর পিণ্ডদানে তৃপ্ত করেছিলেন সে বিদেহী আত্মাকে, আজও তাই এখানে বালুর পিণ্ডদান হয়ে আসছে। অন্য পাহাড়টিতে ধর্ম্মারণ্যে একটি গুহা আছে, সেই গুহায় দীর্ঘ ছয় বৎসর তপস্যা করেছিলেন শাক্যমুনি—তারপর কঠোরতার ব্যর্থ, ব্যর্থতার প্রয়াস ত্যাগ করে ফল্গু নদীতে স্নানস্নিগ্ধ তনু নিয়ে গিয়ে বসেছিলেন বোধগয়ায় মহা বোধিদ্রুমের নীচে বজ্রাসনে—তৃপ্ত হয়েছিলেন পরম নিষ্ঠাবতী সুজাতার পরমান্ন পানে। এমনি করেই আর এক মহাযোগীকে তপস্যা শেষে প্রথম অন্ন দানের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন আর এক তপস্বিনী, নাম তাঁর চন্দনবালা। এই মহিয়সীকে মহিমান্বিতা করেছিলেন প্রথম ও প্রধানা ভিক্ষুণী হবার সৌভাগ্য দিয়ে তপস্বীরাজ মহাবীর। বড় নিবিড় মিল এই দুই মহা তাপসের জীবন কথায়। দুই জনই রাজপুত্র—উভয়েই রাজ্য ত্যাগ করে যৌবনে যোগী হয়ে মহাসত্যের সন্ধানে পথে বেরিয়ে পড়েন। উভয়েই বাল্যাবধি বৈরাগ্য-প্রবণ, কোমল প্রাণ, জীব দুঃখে

বিগলিত হৃদয়। উভয়েই কঠোর তপশ্চারণ করেন। উভয়েই অহিংস ধর্ম্মের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। মহাতপা গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করেন—বর্দ্ধমান জিতেন্দ্রিয়ত্ব বা জিনত্ব লাভ করে কৈবল্যের পথ নির্দ্দেশ করেন।

ফল্গু কিনারের গদাধর ঘাটে দাঁড়িয়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায় এই জনতার পানে তাকিয়ে—কত লোক এসেছে, বেশীর ভাগই কিন্তু বিহারী। তবুও আছে ভারতের নানা প্রদেশবাসীরা, চিন্তা কিন্তু সবারই এক—সবাই ছুটে এসেছে পারলৌকিক কর্ম্মের প্রেরণায়, পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদানের আকাঙ্ক্ষায়। পিণ্ডদানের বিশ্বাসমহিমায় এ ভূমি ধন্য, এযে মহাপিঠস্থান—ঐ একটি চিন্তাই যে আর সব চিন্তাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যে যেখানে পেরেছে বসে গেছে পিণ্ড দিতে—কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির মধ্যে দুই পায় দলিত মথিত হচ্ছে সমাপ্ত অসমাপ্ত পিণ্ডাংশ। মন ব্যথিত হয়, সচকিত হয়, কিন্তু উপায় কি ? যেখানে একত্র বহুজনের একই কর্ম্ম করার তাড়া, সেখানে এ হবেই—এ ক্রিয়াটুকু আছে বলেই না আজও এ ঘাট এই বিষ্ণুপাদপদ্ম যুগ-যুগান্তের ব্যবধান পেরিয়েও সজীব হয়ে রয়েছে, প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে—পরিত্যক্ত এক ভগ্ন দেউল ও জীর্ণ ঘাটে এর পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ঘাটের ওপরেই সামনে গদাধর মন্দির, বামদিকে শঙ্কর-বাগ বা পাদপদ্ম মন্দির সংলগ্ন উদ্যান; সেখানেও হচ্ছে পিণ্ডদান। সহজেই দৃষ্টি টেনে নেয় বিরাট কোষ্ঠি পাথরের বিষ্ণুপাদ পদ্ম মন্দির। মারহাট্টা রাণী অহল্যাবাঈ রচনা করান এ মন্দির—বুকাননের মতে নয় লক্ষ টাকা সেই সময়েও ব্যয় হয়েছিল এটি প্রস্তুত করাতে। বহু মন্দির বিভিন্ন স্থানে দেখেছি কিন্তু কোষ্ঠি-পাথরের এমন সুন্দর মন্দির আর কোথাও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সোনার আলোয় স্বর্ণ-কলস ঝলমল করছে দিগন্ত প্রসারী নীলাকাশের নীচে। জনতার সঙ্গে আমিও গিয়ে দাঁড়াই বিষ্ণুপাদ-

পদ্মের সম্মুখে। আধো আঁধারের মাঝখানে কালো পাথরের উপর স্পষ্ট একটি পায়ের ছাপ—স্তব্ধ হয়ে যায় মন। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমং তপঃ। সবাই স্মরণ করছে আপন আপন স্বর্গীয় পিতা-মাতাকে—এই যে যুগ যুগ ধরে মানুষ আসছে একই চিন্তা নিয়ে. দিয়ে যাচ্ছে একটু পিণ্ড, তুফোঁটা চোখের জল—এ যে অমূল্য! এইখানেই না মহাপ্রভুর নবজন্ম ঘটেছিলো! সেই মহাপুরুষের চোখের জলের স্মৃতি নিয়ে এযে অক্ষয় স্বর্গ! তিনি দৃষ্টিবান, তিনি মহান—তাই না তিনি এই পূণ্য ভূমিতে অমৃতের দর্শন পেয়েছিলেন। অকারণেই মন বিহ্বল হয়ে গেল, চোখে জল ভরে এলো, কি জানি কেন। ক্ষণিকের জন্য কে যেন আমায় অন্য লোকে টেনে নিয়ে গেলো!

জনতার পানে দৃষ্টি যায়—তাকিয়ে দেখি পলিত কেশ ন্যুব্জ দেহ —আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভক্তি বিহ্বলতা। এযে স্থান—মাহাত্ম! অতি বড় নাস্তিকও বুঝি মানুষের এ বিহ্বল ভক্তির সামনে মাথা নোয়ায়। পাদ পদ্ম জড়িয়ে ধরে কেউ চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, —কেউ চুম্বন করছে,কেউবা আপন মনে জোড় হাতে বিড়্ বিড়্ করে কি সব বলছে—ঢেলে দিচ্ছে বুঝি ব্যর্থ জীবনের, বেদনাহত মনের সমস্ত অভিযোগ সমস্ত আক্ষেপ—সেই পরমতমের পায়ে, যিনি অনাথের নাথ, বান্ধবহীনের শেষ গতি। স্তব্ধ মন ভাবে এইতো ধূলায় স্বর্গ নেমে এসেছে ···! দে, দক্ষিণা—দে! ছোড় দক্ষিণা! কর্কশ সে চিৎকারে এ সৌম্য পরিবেশকে খান খান করে দিল—চেয়ে দেখি বিরাট বপু নধর কান্তি, এক চৌবেজি গরীব বিহ্বল জনতার পিঠে নির্দ্দয় চাপড় মেরে দক্ষিণা আদায় করছে—ঠেলে ঘরের বার করে দিচ্ছে একান্ত ভক্তিকাতর এই গ্রাম্য জনতাকে। মন বিষাক্ত হয়ে উঠলো মানুষের লোভাতুর মনের এক নগ্ন ছবি চোখের সামনে জাগতে দেখে। তাকিয়ে দেখি, জনতাকে ঠেলে, তুই হাতে দক্ষিণা

কুড়ুচ্ছে পাদপদ্মের কুণ্ড থেকে পূজারী ব্রাহ্মণ বা মন্দির প্রধানের অনুচর। আজ এই মহাক্ষেত্রে জীবনের এক পূণ্য লগ্নে পাশাপাশি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দুটি ছবি যুগপৎ চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটল। এখানে এসে কে কি পেয়েছেন জানি না—আমি দেখলুম সেই চিরন্তন মানুষকে যার অন্তর স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দোলায় চির দোলায়মান।

মধু বাতা ঋতায়তে মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মধু নক্তম্ উতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধ্ দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥

স্তব পাঠ করাচ্ছেন পুরোহিত। আমরা ছেড়ে চলেছি পাদপদ্ম মন্দির।

হে পরমতম! তোমারই আশীর্ব্বাদে তোমার এ পৃথিবী মধুময় হ'ক!

পাদপদ্ম মন্দির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বিষ্ণুপদ রোড় ধরে ষোল বেদী পেরিয়ে ধাপে ধাপে নীচে গিয়ে দাঁড়াই। জনতা ও ভিখারী আতুরের কলকোলাহল ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁছায় বাদ্যধ্বনির রব। সবাই ত্রস্তে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়—মৃতদেহ দাহন করতে নিয়ে চলেছে শব যাত্রীরা। মন্দির পরিক্রমা করে বিষ্ণুপদ রোড় গিয়ে পড়েছে শ্মশান ঘাটে। শব যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি দূরে শ্মশানভূমিতে চিতা জ্বলছে, এখান থেকেই দেখা যায়; তার অগ্নিশিখা—প্রখর সূর্যতাপকে বুঝি আরও প্রখর করে তুলছে এই দাহনশিখা। শ্মশান ঘাট ও গদাধর ঘাটের মাঝখানেই সীমায়িত গদাধর ও বিষ্ণুপদ মন্দির। ফল্গু কিনার জুড়ে চলে গেছে একটির পর একটি ঘাট—শ্মশান ঘাট, গদাধরঘাট, দেবঘাট, গায়ত্রীঘাট ও পিতামহেশ্বরঘাট। মন্দিরে সোপানে যেন তটহীন এ অঞ্চলটুকু।

ব্রহ্মপুত্র গয়াসুর আপন বক্ষে ধারণ করে রেখেছে এ গদাধর ঘাট, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস।

কথিত আছে—বিরাটদেহী দৈত্যপতি, কোলাহল পর্ব্বতে হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেন—সে তপস্যা দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত দেবতাকুল ব্রহ্মা ও মহেশকে সহায় করে বিষ্ণুর কাছে হাজির হন। ভগবান বিষ্ণু দৈত্যপতিকে বর দিতে চাইলে সে প্রার্থনা জানায়—"হে প্রভু, আমার দেহ স্পর্শ মাত্রেই যেন জীবাত্মার মুক্তি হয় আর আমি যেন দেবতার চেয়ে পবিত্র গণ্য হই"। বিষ্ণুর এ বরদানের পর সব নরনারীই গয়াসুরকে স্পর্শ করে সোজা বিষ্ণুলোকে চলে যাওয়ায় যমপুরী শূন্য হয়ে পড়ে। আবার যমরাজ দেবতাদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হয়ে এ বৃত্তান্ত নিবেদন করায় বিষ্ণু ব্রহ্মাকে যজ্ঞার্থে গয়াসুরের শরীর প্রার্থনা করতে জানান। ব্রহ্মার প্রার্থনায় হৃষ্টচিত্ত গয়াসুর আপন পাঁচ ক্রোশ লম্বা ও একক্রোশ ব্যাপী দেহ দক্ষিণদিকে পদদ্বয় বিস্তার করে শয়ন করে। ব্রহ্মার যজ্ঞান্তে গয়াসুর উঠতে চাইলে সকল দেবতারা গিয়ে তার দেহে অধিষ্ঠান করেও ওঠা নিবারণ করতে অক্ষম হওয়ায়—ব্রহ্মা যমরাজকে গচ্ছিত ধর্ম্মশিলাখণ্ড তাহার দেহে রাখতে বললেন কিন্তু ইহাতেও বিফল হওয়ায় দেবতাদের নিয়ে বিষ্ণু এসে গয়াসুরের দেহে অধিষ্ঠিত হলেন—তুষ্ট হয়ে গয়াসুরও নিবৃত্ত হলো ওঠা থেকে। এর পর প্রসন্নচিত্ত বিষ্ণু সেই মহাসুরকে বর দিতে চাওয়ায় গয়াসুর প্রার্থনা জানায়—প্রভু, এই বর দিন যতক্ষণ আকাশে চন্দ্র সূর্য উদিত হবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেবতা আমার শরীরেই উপবিষ্ট থাকবেন এবং এখানে পিণ্ডদান করলে হাজার কুল উদ্ধার লাভ করবে—এই প্রর্থনান্তে গয়াসুরকে বরদানে তুষ্ট করে—'এবমস্তু' জানিয়ে বিষ্ণু অন্তর্হিত হন, ইহাই পুরান কথা। এই যে শিলাখণ্ডটি যমরাজ ব্রহ্মার আজ্ঞায় অসুর দেহে স্থাপনা করেন সেই শিলাও কিন্তু বড় সাধারণ শিলা নয়—তার সম্বন্ধেও

এক বিচিত্র পুরাণ কাহিনী কথিত আছে। ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মব্রতা নামে এক কন্যা ছিল। সেই কন্যা বড় হলে ধর্ম্মরাজ তাঁকে যোগ্য পতি লাভার্থে তপস্যা করতে আদেশ দেন। ঋষি মরীচি এই কন্যাকে উত্তমা জেনে ধর্ম্মরাজের কাছে প্রার্থনা করায়, তুষ্ট ধর্ম্মরাজ কন্যা সম্প্রদান করেন। কিছুদিন সুখে অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন শ্রান্ত ক্লান্ত ঋষি ঘরে ফিরে স্ত্রীকে আপন পদসেবা করতে বলেন। স্বামীর আজ্ঞায় স্ত্রীও পদসেবায় রত হন। কিছুক্ষণ পর মরীচির পিতা ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মব্রতা পতি অপেক্ষা শ্বশুর সেবা প্রথম ও উত্তম জ্ঞানে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। ওদিকে ঋষির নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর স্ত্রীকে সেবারতা না দেখে হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে ক্রোধে ও অভিমানে "তুই প্রস্তর হইয়া যা" এই শাপ দেওয়ায় ধর্ম্মব্রতা পাথরে পরিণত হয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন ধর্ম্মব্রতার কঠোর তপস্যায় বিষ্ণু তুষ্ট হয়ে বর দান দিতে চাওয়ায় ধর্ম্মব্রতা পতি অভিশাপ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করায় বিষ্ণু জানান, ঋষি শাপ মুক্ত করার ক্ষমতা তাঁরও নেই—তুমি অন্য বর চাও। তখন ধর্ম্মব্রতা বলেন, আপনার বরে আমার দেহাবশেষ এই শিলা যেন একান্ত পবিত্র বলে গণ্য করা হয় আর সকল দেবতাদের নিয়ে সর্ব্বতীর্থ যেন এ শিলাখণ্ডে বাস করেন—এবং এই শিলাখণ্ডে কৃত সকল কর্ম্ম যেন অক্ষয় হয়!

বিষ্ণু বলেছিলেন "এবমস্তু", তোমার প্রস্তর গয়াসুরের দেহে স্থাপিত করা হবে আর সে সময় সব দেবতা সকল তীর্থসহ উপস্থিত হবেন—এতকাল গচ্ছিত ঐ শিলাটিই ধর্ম্মরাজ সময় উপস্থিত হওয়ায় গয়াসুর বক্ষে স্থাপনা করেন। পাদপদ্ম মন্দিরের আট মাইল উত্তরে প্রেতশিলা। অপঘাতে মৃত আত্মার শান্তি কামনায় পিণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে সেইখানে।

এই বিষ্ণু পদেরই আধমাইল পশ্চিমে অক্ষয় বট ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের

পাদমূলে বিরাজিত। এই মহাভূমিতে তিন স্থানে পিণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে—প্রথম ফল্গুঘাটে, দ্বিতীয় পাদপদ্মে ও তৃতীয় এই মহা বৃক্ষ মূলে। আমরা যখন এই অক্ষয় বটে এসে পৌঁছলাম মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে চারিধার তখন খাঁ খাঁ করছে; এক অতি প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নানা নুতন ও বহু প্রাচীন সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি ছড়ানো রয়েছে, নানা লোকে নতুন কাপড়ের ফালি বটশাখায় নানা কামনা করে বেঁধে দিয়ে গেছে—সহজেই মনে পড়ে পুরীর মন্দির প্রাঙ্গণস্থ বটবৃক্ষের কথা। অক্ষয়বটের সামনেই জলে টলমল করছে ব্রহ্মকুণ্ড; তারই ওপারে কিছু দূরে আরম্ভ হয়েছে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে ওঠার সিঁড়ি—প্রায় হাজার ধাপ উঠে ব্রহ্মযোনি শিরে দাঁড়িয়ে গয়া নগরীর অপূর্ব্ব আকাশ চিত্র দেখা যায়। বুদ্ধস্মরণ ধন্য এই ব্রহ্মযোনি—কথিত আছে মহারাজা অশোক এখানে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, আজ কিন্তু তার কোন চিহ্নই নেই—শুধু আছে বুদ্ধ ভক্তের মনে সেই স্মৃতির বেদনা—এরই পাশে মুরলী পাহাড়। এইখানেই আমরা গয়াতীর্থের সীমানা টানতে পারি—এর পরই বুদ্ধগয়া। তীর্থের সুফল আশীর্ব্বাদ দিলেন পাণ্ডাঠাকুর—ওঁ শান্তি। শান্তি। শান্তি।

একটি দুর্ল্লভ সন্ধ্যা। পশ্চিমাকাশে দিনের চিতা জ্বলে জ্বলে নিভে এল—রাঙিয়ে দিয়ে গেল বিশ্বভূবন, শেষ রশ্মি-ধারায় বিদায় নেওয়ার আগে।

গোধূলি উড়িয়ে ফিরে গেল রাখাল ছেলের দল, কল-কাকলি মুখরিত চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেল। গৃহমুখীন পাখীরা আকাশের অঙ্গন পথে দলে দলে উড়ে চলে গেল তাদের কুলায় কুলায়। দূর সীমানায় আকাশ দিগন্তে মিলে গেল, এক হয়ে গেল যেন মহামিলনে। টেনে দিল ঘন রহস্য যবনিকা। শূন্য নীলিমায় ফুটে উঠলো তারার ঝাঁক

—এই সুন্দর স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রির যাত্রী-পথিক আনমনা হয়ে বসে আছি ফল্গুনদীর কিনারে।

জনশূন্য ঘাট। দিনের সে মুখরতা কোথায় মিলিয়ে গেছে—নেই যাত্রীর ভীড়। শত মানবের পদলাঞ্ছিত শূন্য ঘাট, মহাশূন্য—তার পানে উদাস দৃষ্টি মেলে পড়ে আছে—সারাদিন সে শুধু শুনেছে পরলোকের কথা, মৃত্যুর অভেদ্য রহস্যের পরিচয়!

আকাশে ধীরে ধীরে উঠল পূর্ণ-চাঁদ। আজ ত পঞ্চদশীই নয়, আজ যে পূর্ণিমা—ষোলকলায় পরিপূর্ণ এ রাকা চাঁদ বিশ্বভুবনে মায়ার অঞ্জন পরিয়ে দেয়। মনকে করে উতলা, দূরকে টানে কাছে।

অহল্যা বাঈ রচিত বিরাট মন্দির, স্বপ্নের কুয়াশায় মায়াময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ এই আনন্দ লগ্নে আমার প্রসন্ন মন বারে বারে এই কথাই বলছে—নিজেকে তুই কৃপণ করিসনে, পরিপূর্ণ মানবতার প্রকাশ নিয়ে এগিয়ে চল—

'জলে স্থলে তোর আছে আহ্বান
আহ্বান লোকালয়ে
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুঃখে লাজে ভয়ে।'

এ মন্ত্র তোর জপের মালায় তুলেনে, 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে ভাল করে আগে জান—হৃদয় তোর শতদলে বিকশিত হয়ে উঠবে সহজ মহিমায়। আপনি দেখবি সেই প্রস্ফুটিত কমলটির মাঝখানে কবে এসে বসেছেন বাঞ্ছিত চিরসুন্দর, তুই তা বুঝতেও পারিসনি।

প্রাচীর প্রাণ-সাধনা ফল্গুধারার মতই এই ভূমিতে বয়ে চলেছে আত্মার শান্তি ও কল্যাণের পথ ধরে। ভারতের ভাবনা ধারার এও এক শাশ্বত রূপ!

বুদ্ধগয়া—নামেই তার পরিচয়।

ব্যথার সমুদ্র তীরে ওগো রত্নাকর
করেছিলে জ্ঞান-সিন্ধু মন্থন মহান
মানব কল্যাণ লাগি হে রাজতাপস
পরম অমৃত সেই করি গেছ দান।

এ মর জনমে মহা অমৃতমণ্ড অসমান হয়েছে. তুমি পান করেছিলে আপন তপস্যায়—পান করিয়েছিলে সেই অমৃত বিশ্ববাসীকে অপার করুণায়!

হে বিশ্ব-বিজয়ী ভিক্ষুক, তোমার চরণ স্পর্শে যে ধূলি ধন্য, আমি আজ সেই পবিত্র ধামে এসে দাঁড়িয়েছি।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু জ্ঞানান্বেষী রাজার ছেলে ভিক্ষু সেজে পথে পথে ফিরেছিলে—হয়েছিলে সর্বত্যাগী পরিপূর্ণ পূর্ণতার মাঝখানে।

পিছনে পড়ে রইল তোমার প্রাণের গোপা—পড়ে রইল জীবনসর্বস্ব রাহুল, ব্যর্থ হল শুদ্ধোধনের আতুর পিতৃস্নেহ। পার্থিব অভাব তোমার কি ছিল! তবু তুমি তৃপ্ত হতে পারনি, ভঙ্গুর জীবনের নশ্বরতা তোমায় ব্যাকুল করেছিল। তাই তুমি দেশে দেশে ছুটেছিলে জরা মৃত্যু ব্যাধি-ভীত মানবের কল্যাণের পথের সন্ধানে, মহাভাবের প্রবল প্রেরণায় ঘোর অরণ্যে, মরুময় প্রান্তরে প্রান্তরে! কোথাও পাওনি আলো—পাওনি শান্তি। পাওনি তৃপ্তি, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনজনিত ঘোর তপস্যায়।

অন্তরের তৃষ্ণা তোমার মিটল না—চিত্ত তোমার ভরল না—হল না অন্বেষণের শেষ!

দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী তপস্যার অতৃপ্তি বুকে নিয়ে এই নৈরঞ্জনায় অবগাহন করে তুমি শরীরের জ্বালা জুড়িয়েছিলে! তৃপ্ত হয়েছিলে সুজাতার পরমান্ন পানে। ধন্য হয়েছিল সুজাতা আপন নিষ্ঠায়।

এই পরম ভূমিতেই সম্বোধিলাভ করেছিলে, পেয়েছিলে পথের

নির্দেশ। তারপর মহাতৃপ্ত তুমি মূর্তিমান সন্তোষের মত পঞ্চ শিষ্য সন্ধানে ঋষি পত্তনের পথে পা বাড়িয়েছিলে—রুষ্ট, পথভ্রান্ত তোমার প্রথম পঞ্চ শিষ্যের সব জ্বালা সব বিদ্বেষ জুড়িয়ে গিয়েছিলো তোমার অলৌকিক সৌম্যরূপ দর্শনে—তুমি যে তখন পরম অমৃতের অধিকারী।

সেই মহাপুণ্যলগ্নের স্মৃতি বুকে নিয়ে ধন্য হয়ে আছে এই বুদ্ধগয়া—মহাতপস্বীর তপোবন, বিশ্বের করুণা-নিকেতন। এর আকাশে বাতাসে আজও যেন অনুরণিত হচ্ছে শুনতে পাই—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ; সেই মহাবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা ভারতে, তথা সুদূর তিব্বতে, চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল—ছড়িয়ে পড়েছিল যাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপময় ভারতে।

চণ্ডাশোক হয়েছিলেন ধর্মাশোক সে পরশমনির দুর্লভ স্পর্শে। মানস নেত্রে ভেসে উঠলো—ঐ যেন চলেছেন রাজার ছেলে-মেয়ে তোমার মহাবাণী নিয়ে ভিক্ষুবেশে সিংহলের পথে—ধন্য তুমি সঙ্ঘমিত্রা, হে মহামহেন্দ্র, জন্ম তোমার সফল হয়েছিল সত্যের আরাধনায়!

মৃত্যুঞ্জয় তোমার মন্ত্র—বিশ্বাস-মৈত্রী-প্রেম ; এ যে ভারতের আত্মার বাণী! সেই মুক মন্ত্রকে তুমি ভাষা দিয়ে গেছ, দেখিয়ে গেছ অবিনাশী ভারতের শাশ্বত স্বরূপ। তোমার জন্মভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করে আমরাও ধন্য!

"আরোগ্য পরম লাভা সন্তুট্ঠী পরমং ধনং
বিস্সাসা পরমা ঞাতী নিব্বাণং পরম-সুখং।"

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি, নির্বাণই পরম সুখ—

হে তপস্বী! এই পরম সুখ লাভ করে তোমার তপস্যা মৃত্যুহীন।

সকলের দুঃখ দূর হউক, সকলে সুখী হউক—এই ছিল তোমার একমাত্র কামনা। অহিংসা মন্ত্রের মূর্তপ্রতীক, ধন্য তুমি রাজপুত্র। নগণ্য ছাগশিশুর জন্যও তুমি আপন জীবন বিসর্জনে দ্বিধা কর নাই। মত্ত মাতঙ্গ স্থবির হয়ে গিয়েছিলো তোমার দর্শনে, বুঝি বা লজ্জায়। মহা আত্মগ্লানি থেকে তুমি বাঁচিয়েছিলে পাষণ্ড অঙ্গুলীমালকে।

মৃত পুত্র বুকে নিয়ে পথে পথে ফিরেছিল কিসা গৌতমী, কোথাও পায়নি সান্ত্বনা, পায়নি শান্তি।

তুমিই দিয়েছিলে সান্ত্বনার মহাচন্দনের প্রলেপ সেই পুত্রহারা জননীকে। তোমার কাছে দিব্য দৃষ্টি পেয়ে সে দেখেছিল মৃত্যুর পরেও যে অমৃত, জীবন ছাপিয়েও যে মহাজীবন!

তোমার কাছে আমরা যা পেয়েছি সে ত 'না' নয় 'শূন্য' নয়। আশা ও আনন্দ তোমার মন্ত্র—অভয় ও অশোক তোমার বাণী। চিরন্তন সত্যই তোমার সাধনা। নিজের জন্য কোনও কৃতিত্ব তুমি কামনা করনি। তুমি বলে গেছ "অমৃত ছিল—অমৃত আছে!" কিন্তু তোমার কাছে বন্ধ অমৃতের সেই দুয়ার খুলে গেছে। সেই অমৃতই তুমি বিশ্বের জরা, ব্যাধি, দুঃখ-জর্জ্জর নর-নারীকে এনে দিয়েছ।

মহামুক্তির পরম ধর্মকথা এমন সহজ সুরে, এমন সরল ভাষায়, এমন সত্য হৃদয়ের একান্ত নিষ্ঠায় আর বুঝি কেউ বলেনি। মানবের চিরশত্রু হিংসানাগিনীকে তুমি জয় করতে বলেছিলে মানবীয় মহিমায়। ব্যথাতুর জীবের তুমি চিরমরমী বন্ধু!

আপন তপস্যায় বিশ্বজনায় ডেকে তুমি বলতে পেরেছিলে—

"অপারুতা তেসং অমতস্স দ্বারা
যে সোতবন্তো পমুঞ্চন্তু সদ্ধং
বিহিংস সঞ্ঞী পগুণং ম ভাসিং
ধর্ম্মং পনীতং মনজেস্সু ব্রহ্মে।

"শোন শোন তোমরা ! অমৃত দুয়ার খুলে গেছে, শ্রদ্ধা দ্বারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎ লাভ হবে।"

এ যেন সেই বৈদিক যুগের ঋষিদের বেদবাণী, ভারত আত্মার শাশ্বত কথা—'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

হে অমৃতের পুত্রগণ ! শোন—ভোর হল ! ভোর হল ! "নিশা গতা", পুরবাসীগণ তোমরা জাগ, চোখ মেলে দেখ—ঐ দেখ পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোর মহিমায় !

তোমার মিলন মন্দিরে কারো বাধা ছিল না—ছিল না কোনও জাত্যাভিমানের প্রাচীর ! পতিতেরাও তোমার ধর্মে আশ্রয় পেয়েছিল —পেয়েছিল শ্রদ্ধা। তাইত দেখি ক্ষৌরকার উপালি ধর্মশাস্ত্রের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা তোমার করুণায়। পতিতা বারাঙ্গনা আম্রপালী ভিক্ষুণী শিরোমণি।

তোমার সাম্য-মৈত্রী মন্ত্রের উদার আহ্বান বিশ্বকে কল্যাণের পথে ডাক দিয়েছিল।

মুগ্ধ হয়ে তাই ত আমরা শুনি স্থবির শীলবানের মুখে, "আমি চণ্ডাল, তবু এই মহান ধর্ম প্রভাবে আজ সর্বজনবরেণ্য মানবের পূজনীয় !"

এতখানি সাম্য এত বড় সত্য communism আর কি হতে পারে ?

মানবকে তুমি দেবত্বে রূপান্তরিত করেছ। জীবে সেবা ও করুণাই তোমার মন্ত্র ! 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—চণ্ডীদাস বুঝি এই বাণী তোমার কাছেই পেয়েছিলেন। হে মহামানব, মুগ্ধ হৃদয়ের একান্ত প্রণাম গ্রহণ কর !!

রৌদ্র করোজ্জ্বলে ঝলমল দিন—ধূ ধূ বালুকার বুকে মেঘ-রৌদ্রের অপূর্ব আলোছায়ার লুকোচুরি। কত স্তূপ, কত অগণিত মন্দির।

অসংখ্য অনাদৃত তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তবুও যা রয়ে গেছে সংখ্যায় তাও কম নয়।

প্রধান বৌদ্ধমন্দিরটির সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি এর অপরূপ কারুকলায়। বিকশিত শতদলের মাঝখানে কি প্রশান্ত মহিমার মূর্তি—

'বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধা হাস্য জ্যোতি।

মুগ্ধ মন এ অপূর্ব শিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার বলে—হে ভারত-শিল্পী, তোমার জয় হোক! চিরজয়ী হ'ক তোমার ভাস্কর্য!

উরুবিল্ব বুদ্ধের সাধনতীর্থ—এইখানেই তিনি ষড় বার্ষিক ব্রত পালন করেন—কিন্তু শান্তি লাভ তিনি করলেন অন্য উপায়ে।

ফল্গুধারায় স্নানস্নিগ্ধ-তনু সুজাতার পরমান্ন-পরিতৃপ্ত মন নিয়ে প্রাণপণ সাধনায় বোধিদ্রুমতলে মহাযোগাসনে বসলেন মহাযোগী। সম্বোধি লাভ করে হলেন দিব্যজ্ঞানী। মার এল তার নানা প্রলোভন ও চাতুর্যের ঝাঁপী নিয়ে—সহচর অনুচরদের নিয়ে। হেরে গেল সে দুরাত্মা তোমার যোগানন্দময় প্রসন্নহাস্যের কাছে—হলে তুমি দুর্জয়, মার-বিজয়ী মহাতাপস। 'তুমি যে সম্বোধি লাভ করলে তার সাক্ষী কই?' প্রশ্ন করল মার তার শেষ অস্ত্রে। প্রসন্ন আননে স্পর্শ করলে মেদিনী—তোমার মহাসাধনার সাক্ষী হয়ে ধন্য হলেন ধরিত্রী। হে সন্ন্যাসী! কিসে তোমায় তুলনা করব? তুমি কি সত্যদীপের উজ্জ্বলতম শিখা?

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্গের মতে সম্রাট অশোক বহু বিহার ও স্তম্ভের মধ্যে প্রথম বিহারটি এইখানেই করিয়ে ছিলেন। মধ্য প্রদেশের ভারহুত স্তূপের বেষ্টনী-স্তম্ভে এই বুদ্ধবিহারের খোদিত

নকল চিত্র দেখা যায়, তা থেকে মনে হয় মহাবোধিক্রমের চারপাশে স্তম্ভোপরি প্রস্তর নির্মিত দ্বিতল গৃহ ছিল, যদিও ধ্বংসের কবলে আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। উরুবিল্বের আর এক নাম মহাবোধি এবং তাই থেকে হয়েছে বুধগয়া। এই বুধগয়ার মন্দির কবে হয়েছিল জানা নেই। এই মন্দিরের তথাগতের সিংহাসনের খোদিত লিপি পাঠ করে জানা যায় ছিন্দবংশীয় কোনও রাজা মূর্তি ও সিংহাসনটি নির্মাণ করান। এরই পশ্চাতে আজও সেই মহাবোধি বৃক্ষের এক ক্ষয়িষ্ণু শাখা দেখা যায়—দেখা যায় সেই মহাবজ্রাসন, যেখানে এসে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন মার বিজয়ী। বৌদ্ধদের কাছে এর চেয়ে বড় পবিত্র স্থান আর নেই। মানবত্বের পূজারী সেই লোকশ্রেষ্ঠ গৌতমের এ সাধনস্থান সারা বিশ্ববাসীরই মহাতীর্থ!

আশপাশের জমি থেকে মন্দিরের জমি পঞ্চাশ হাত উঁচু। এই ঢিবি মহাবোধি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ বলেই মনে হয়। ভূমি খনন করে এখানে মহাবোধি মন্দিরের প্রাচীর ও নিম্নভাগ পাওয়া গেছে।

মন্দির প্রাঙ্গন খনন করতে গিয়ে দুই একটি ছোট পাথরের মন্দির আবিষ্কৃত হয়। তারই অনুকরণে এই নতুন মন্দির। এই প্রধান মন্দিরটি শিল্পকলায় তুলনাহীন। অপূর্ব এর কারুকলা। সফল হয়েছে বৌদ্ধ নৃপতিদের একে সুসজ্জিত করার চেষ্টা। সার্থক হয়েছে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের আকিঞ্চন!

বুদ্ধের পরে কবে এল এই বুদ্ধগয়া হিন্দুর অধিকারে, ঠিক মত সময়-কাল আজ বলা দুষ্কর। নির্মম হস্তে ধ্বংস হল এই মহামানবের পীঠস্থান। অজেয় এই ধর্ম বিতাড়িত হল ভারতবর্ষ থেকে। প্রাণময় বনস্পতির শাখা প্রশাখার মত আপন কাণ্ড ছাড়িয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল সুদূর তিব্বতে, চীনে—সিংহলের পথে পথে – দ্বীপময় ভারতে।

নেপাল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশ আজও এই অজেয় ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রদ্ধার দ্বারা। কিন্তু

সকলেই আপন আপন মনের রংয়ে রাঙিয়ে এর বহু রূপ গড়ে তুলেছে। এই সব দেশ থেকেই আধুনিক পণ্ডিতরা নথিপত্র আবিষ্কার করে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন, এই সব মহাসম্পদের রচয়িতা ভারতীয় পণ্ডিতগণই ছিলেন, যদিও আজ ভারতে তার চিহ্নমাত্র নেই।

ভগবান তথাগত দেবতা মানেননি। অমৃতস্য পুত্রাঃ মানবকেই তিনি চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমায়। যে সকল মহাপণ্ডিত এই ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তাঁরা এর মহান আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ অংশটুকু গ্রহণ করেই আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ভারতের নিজস্ব সম্পদ—ইহা ভারত আত্মার বিশেষত্ব। সেদিনের সে আদি বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে আমাদের আজকের দিনের নতুন বুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী এই কথাই বলে গেছেন এবং এই মন্ত্রই দান করে গেছেন সারা বিশ্বকে। তথাগতের ধর্মনিষ্ঠা ও আদর্শবাণী হিন্দু-ধর্মের পুষ্টি সাধনই করেছে—কোনও অনিষ্ট করেনি।

সেই পরম জ্ঞানী বলে গেছেন, "আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করলে সেই আঘাতের কোনও প্রতিকার হয় না, উহাতে জগতে একটি পাপেরই বৃদ্ধি হয় মাত্র।"

হিন্দুরা মূর্তি পুজা ও বেদ-বিরোধী এই ধর্মকে বিতাড়িত করল ভারতবর্ষ থেকে কিন্তু রাজহংসের মত সার অংশটুকু গ্রহণ করে আত্মস্থ করতে ভুললো না—বুদ্ধমূর্তিকে ঠাঁই দিল মন্দিরের এক অংশে বিষ্ণুর দশ অবতারের এক অবতার রূপে। মহামানবের আসন থেকে হিন্দুরা বুদ্ধকে উন্নীত করল দেবত্বে।

বৌদ্ধধর্মের এই নির্মম উচ্ছেদের জন্য সম্পূর্ণ হিন্দুরাই দায়ী নয়। এর জন্য পথভ্রষ্ট বুদ্ধশিষ্যরাও অপরাধী, যারা ধাপে ধাপে এই মহান ধর্মকে নামিয়ে এনেছিল ধুলায়।

বৌদ্ধেরা ক্রমে মহাযান ও হীনযান এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে দলাদলির চূড়ান্তে উপনীত হয়েছিল।

হীনযানরাই আদি বৌদ্ধ; এঁরা বুদ্ধকে মহামানব রূপেই পূজা করে এসেছেন—মহারাজা অশোক ছিলেন এই হীনযান সম্প্রদায়েরই লোক।

তারপর বুদ্ধ গত হওয়ার বহু বৎসর চলে গেল; হীনযানীরা দুর্বল ও মহাযানীরা প্রবল হয়ে গেল। হীনযানীরা গৌতমের মহামানবতার উপাসক এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথকে জীবাত্মার উদ্ধারের একমাত্র জ্যোর্তিময় উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, মহাযানী বৌদ্ধরা হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা মহামানব বুদ্ধকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করল। আরম্ভ হল বিহারে-বিহারে চৈত্যে মঠে সর্বত্র বুদ্ধের মূর্তি স্থাপনা—ভারত শিল্পীর হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে রূপ নিল এই মূর্তিগুলি। তাই এগুলি এমন মর্মস্পর্শী। মহাযান ধর্ম বড় কঠিন ও উঁচু ধর্ম। বহু ক্রিয়াকর্ম ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন এই ধর্মকে উপলব্ধি করতে। এঁদের দর্শন, এঁদের আদর্শ সাধারণে গ্রহণ করতে অক্ষম হল। আচার্যরা সহজ পন্থা আবিষ্কার করলেন এবং সেই মুহূর্তেই এত বড় ধর্মের পতনের প্রথম বীজ বপন করা হল।

বুদ্ধ শ্রমণ ও শ্রমণীদের বহু বিধিনিষেধের মধ্যে বেঁধে দিয়েছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সেই সকল মেনেই চলতে হত। অবহেলা করে বা এড়িয়ে গিয়ে নয়। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করত তার জন্য ছিল কঠোর শাস্তিবিধান। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা এক মঠে থাকতে পেত না। "প্রাণী বধ করিব না, চুরি করিব না, ব্যাভিচার করিব না, সুরাপান করিব না, মিথ্য কহিব না" —ইত্যাদি শীলগুলি শ্রমণদের মেনেই চলতে হত, আর এর পরিণাম ব্যক্তিগত জীবনেও হোত মঙ্গলময়। বৌদ্ধ অনুশাসনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাই দেখান হয়েছে

এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই নিম্নরূপ বিধিগুলি প্রচলিত করে গেছেন মহাতপা গৌতম। কোনও ভিক্ষু অপরের প্রতি ঈর্ষা বা ক্রোধবশে মিথ্যা চৌর্যবৃত্তির বা ব্যাভিচারের দোষারোপ করলে অপরাধী হবেন। কাহারও অনুপস্থিতিতে তার অসুবিধা করার অভিপ্রায়ে বাসস্থান অংশত অধিকার করলেও দোষী হবেন। এক ভিক্ষু অপর ভিক্ষুর প্রতি রুষ্ট হলেই তাড়াতে পারবেন না সংঘ থেকে। এমন কি ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়ে দিলেও হবেন অপরাধী। সংঘ-মধ্যে ভিক্ষু অপর ভিক্ষু দ্বারা যাহাতে উৎপীড়িত বা লাঞ্ছিত না হন তারই জন্য তার এই সুব্যবস্থা। এ দূরদৃষ্টির তুলনা মেলে না। সকল বিষয়েই সংঘের সমাধান চূড়ান্ত সমাধান ছিল—কোনও নবীন ভিক্ষুকে কোনও শক্তিশালী ভিক্ষুর কৃপাপাত্র হতে হয়নি। দীক্ষা গ্রহণ কার্যে নবীন ভিক্ষু সংঘকেই স্বীকার করে নিতেন। তাঁর কাছে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনই সত্য। বৌদ্ধ ধর্মে আধ্যাত্মিকতায় নরনারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও তিনি ভিক্ষুনীদের সংঘে প্রবেশের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি সামাজিক দিক থেকেই এই বিধি-নিষেধ রাখতে চেয়েছিলেন। বার বার মাতৃতুল্যা গৌতমী ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধে তিনি নারী সংঘের অনুমতি দেন। তিনি নারীর সংঘে প্রবেশের বিরোধী ছিলেন একথা সত্য কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় নয়। নারীরা যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, আত্মিক বলে বা আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনায় পুরুষাপেক্ষা হীনতরা, একথা বুদ্ধদেব কদাপি বলেননি। সেই পরমপুরুষ মাতৃজাতিকে একান্ত শ্রদ্ধাই নিবেদন করে গেছেন। তাঁদের পাণ্ডিত্বের উদ্দীপনাময় সৎচরিত্রের বারবার করেছেন ভূয়সী প্রশংসা—সুক্কা ও কজ্জঙ্গলায় তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। সেই মহান যুগে সর্ব্ব বিষয়ে নারীর গৌরব গরিমা প্রচারিত হয়েছিল, উড়েছিল স্ত্রী-শিক্ষার বিজয়-বৈজয়ন্তী পতাকা, কিন্তু মহাযানী আচার্যরা

মহাভুল করলেন। সাধারণের সুবিধার জন্য বল্লেন, 'ধারণী মুখস্থ কর, ধারণী জপ কর, ধারণীর পুঁথি পূজা কর'-- আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। এতেই তোমাদের সর্বফল লাভ হবে। "ওঁ ধুন্নু ধুন্নু ক্রীং ফট্ স্বাহা" প্রভৃতি অর্থহীন মন্ত্রের প্রচার হল। এই যে ভ্রান্তির ছিদ্র, এই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথেই বানের জল প্রবেশ করল—বিপথে ভাসিয়ে দিল এত বড় ধর্মটাকে। যে বুদ্ধ দেবতা মানেননি—যিনি বেদবিদ্রোহী বলে কথিত, সেই বুদ্ধই বসলেন দেবতার আসনে।

বুদ্ধ তাঁর মৃত্যুর চার পাঁচশ বৎসর পরেই বিহারে বিহারে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলেন—মানুষের কল্পনাপ্রসূত এক একটি ধ্যানী বুদ্ধ আসতে লাগলেন 'আমিতাভ', 'অক্ষোভ্য', 'বৈরচণ', আরও এলেন অমোঘসিদ্ধি ও রত্নসম্ভব। তারপর একে একে জুটলেন পঞ্চবুদ্ধের পঞ্চশক্তি 'লোচনা', 'মামকী,' 'তারা'. 'পান্তরা' ও আর্যতারিকা। তারও পর কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করলেন পাঁচজন বোধিসত্ত্ব পঞ্চ বুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে। মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর হলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্ত্তি—জীবের উদ্ধারে তিনি মগ্ন হলেন। সেরকের উৎসাহে ও কল্পনা প্রভাবে তাঁর হস্তপদ বাড়তে লাগল। শেষে বহু হস্ত, বহু পদ ও বহু মস্তক বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের পূজা এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হল।

বুদ্ধ দেবতা পর্যন্ত অস্বীকার করে গেলেন—কিন্তু কালান্তরে তাঁরই কিছু অযোগ্য শিষ্যেরা ভ্রান্ত ধর্মধরেরা শেষে ডাকিনী-যোগিনী ভূত-প্রেত—পূজা করে বুদ্ধকে বিড়ম্বিত করল। তারা অধঃপাতে দিল এত বড় ধর্মটাকে—তাই বলি হিন্দুরাই নয়, পথভ্রষ্ট, বুদ্ধশিষ্যেরাই তাঁর মহান ধর্মকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। তবুও যা সত্য, যা চিরন্তন তার মৃত্যু নেই—স্বামীজী (বিবেকানন্দ) এই হিন্দু ও বুদ্ধ ধর্মের যে সমাধান করে গেছেন তার বুঝি তুলনা মেলে না—তিনি বলেছেন,

"হে বৌদ্ধগণ! তোমাদের পরিত্যাগ করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারি না এবং আমাদের ছাড়িয়া তোমরাও উন্নত হইতে পার না। অতএব নিশ্চয় জানিও, আমাদের পরস্পরের অসম্মিলন ইহাই স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, তোমরা ব্রাহ্মণগণের ধীশক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া দৃঢ়তা লাভ করিতে পার না এবং আমরাও তোমাদের ন্যায় উচ্চহৃদয় না পাইলে উন্নত হইতে পারি না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এই হেতুই আজ ভারতবর্ষ ত্রিংশৎ-কোটি ভিক্ষুকের আবাসভূমি হইয়াছে এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজাতীয় নেতৃগণের দাসত্ব করিতেছে। অতএব আইস, আমরা ব্রাহ্মণের ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের উচ্চ হৃদয়, মহান আত্মা এবং অসাধারণ লোকহিতকারিতা শক্তির সম্মিলন করিয়া দিই।"

সর্বশেষে হে ভারতঐতিহ্যময় গয়া ও বুদ্ধগয়া, তোমার ধূলি স্পর্শে আমি ধন্য!

আনমনা চেয়ে আছি বাইরের পানে—গতির উদ্দামতায় ছুটে চলেছে যন্ত্রদানবটা—হঠাৎ যেন গতি মন্থর হয়ে এল। যাত্রীদের মধ্যে কলগুঞ্জন শোনা গেল, 'সোনব্রীজ আ গই। সোন নদী এসে গেছে!' মহাকাল পর্বত ছেড়ে এসেছে এ নদী বিশ্বরূপ দেখতে। গঙ্গায় মিলে মিশে বয়ে চলেছে মহাসাগরের পানে। ছোট ছেলে-মেয়েরা উৎসুক আগ্রহে জানালায় জানালায় এসে জুটল। একটা যন্ত্র-দানবের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে চললো আর একটা যন্ত্র-দানব। সংঘর্ষের আর্তনাদে কান বুঝি ফেটে যেতে চায়। বালক-বালিকাদের উচ্ছ্বসিত উল্লাসের কোলাহল তলিয়ে যায় সেই শব্দে। এ ব্রীজটির খ্যাতি আছে বৈকি! আপন স্বকীয়তায় এটি বিশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এই প্লাটফরমটি। দৈর্ঘ্য এর ২৪১৫ ফুট। সোন নদীর

কূলেই ডিহিরী—স্বাস্থ্যান্বেষীদের একটি ক্ষুদ্র পীঠস্থান। এখান থেকে ছোট রেল লাইন গেছে রোটাসের দিকে। হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ ত্রয়ীর স্মৃতি বিজড়িত পুরাতন রোটাসগড় দুর্গ আছে এখানেই কৈমূর পাহাড়ের ওপর। রাজা হরিশ্চন্দ্র-পুত্র রোহিতাশ্বের নামে এই স্থানের নামকরণ, ইহাই কিংবদন্তী এবং রোহিতগড়ই লোক-পরম্পরায় রোটাসগড়ে পরিণত হয়েছে। রোহিতাশ্ব সত্যই এখানে রাজত্ব করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু পুরাতন হিন্দু নৃপতি যে এ স্থান শাসন করেছিলেন, তার সন্দেহ মাত্র নেই। আর এর সাক্ষ্য দেয় এক বহু পুরাতন মন্দির, যার বিগ্রহ ভাঙ্গিয়ে চূর্ণ বচূর্ণ করান হিন্দু-বিদ্বেষী আওরঙজেব। হিন্দু রাজাদের পর হুমায়ুনকে রাজ্যচ্যুত করার সংকল্প নিয়ে এই রোটাসে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করান শের শাহ। আবার অবহেলার মালিন্যমুক্ত হয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে রোটাসগড়। বাংলার শাসক হয়ে মানসিংহ রাখেন আপন পরিবারবর্গ এইখানেই। পিতৃদ্রোহী হয়ে এই অভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ছায়ায় এসেছিলেন শাহজাদা খুরম। ইংরাজের তরফে ক্যাপ্টেন গডার্ড প্রথম অধিকার করেন এই দুর্গ। বাংলায় নবাব তখন মীর কাসেম। লর্ড কার্জন করে গেছেন এই বহু প্রাচীন-স্মৃতির সংরক্ষণের সুব্যবস্থা।

তারপরই আসে শাসারাম—এই খানেই আছে নয়নমনোহর ধাওয়াম কুণ্ড নদী আর হাজার বর্গফিট জলাশয়ের মাঝখানে শের শাহের অপূর্ব সমাধি।

ব্যাঘ্র-বিজয়া শের-শাহকে শেষ পাঠান সূর্য বলতে পারা যায়। তাঁর মৃত্যুতেই এক রকম সমাধিস্থ হল পাঠান আধিপত্য ভারতবর্ষ থেকে।

নগণ্য ফরিদ আপন বাহুবিক্রমে হয়েছিলেন শাহন-শাহ দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে। কি করছিলেন তখন মরুপ্রান্তচারী

ভ্রাম্যমান হুমায়ুন ?—এমনি এক দিনে বিমাতা দিলদারের ঘরে দেখতে পেলেন চঞ্চলা চতুর্দশী হামিদাবানুকে—প্রথম দৃষ্টিপাতেই মুগ্ধ হলেন, হৃদয় হারালেন সেই মরু-দুহিতার পায়। তাঁরই জন্য সর্বস্ব ত্যাগে হলেন প্রস্তুত। পতি লাভের জন্য শুধু কি মেয়েরাই তপস্যা করে ? বিরহী যক্ষের মত হৃদয়ের পুষ্পভার তুলে ধরলেন সে অসামান্যার সামনে—অসামান্যা কিন্তু সত্যই অসামান্যা। মোগল ইতিহাসে অনন্যা তিনি। ফিরিয়ে দিলেন এ রাজপ্রেমিককে। রাজার ঘরণী তিনি হতে চান না ; রাজমহিষীর কত সুখ, সে খোঁজ তাঁর জানা আছে। স্তম্ভিত ব্যথিত হুমায়ুন হলেন বিমাতার শরণাগত—দিলদারই হলেন শেষ পর্যন্ত অগতির গতি। বহু সাধ্য-সাধনায় মন ভিজল এ বিরূপা মানিনীর। ভবিষ্যৎ আকবরের জননী কি সামান্যা হতে পারেন ? মোগল মালঞ্চে একমেবা অদ্বিতীয়ম্ যে তিনি !

জীবনে শের শার বহু ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছিল, তবু সে দৃঢ়চেতা "নর শার্দুল" পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিপরীত ভাগ্যকে। জয় করেছিলেন বিজয় লক্ষ্মীর হৃদয় আপন পুরুষকারের বলে। মাতৃহীন পিতৃস্নেহবঞ্চিত বালক পথে পথে ফিরেছিলেন ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা-প্রার্থী হয়ে।

আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে অল্পকাল মধ্যে ফার্শী ভাষায় অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বিখ্যাত ইরাণী কবি সাদীর নীতিগ্রন্থ গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ এবং সিকন্দরনামা তাঁর ছিল কণ্ঠস্থ।

রুষ্ট পিতার হৃদয় তিনি জয় করতে পেরেছিলেন আপন গুণাবলীতে—লাভ করেছিলেন শাসারামের জায়গীরের শাসন ভার। সেই তাঁর ভাগ্যের প্রথম উন্মেষ।

আবার হলেন বিতাড়িত রুষ্ট পিতার দ্বারা—চলে গেলেন

আগ্রায় লোদী রাজাদের অধীনে চাকরী নিয়ে। পিতার মৃত্যুর আগে আর ফিরলেন না শাসারামে।

বিহারের স্বাধীনরাজা বহর খাঁর অধীনেও চাকুরী নিয়েছিলেন ভাগ্যের বিপর্যয়ে। ব্যাঘ্র শিকারে আপন শৌর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়ে পেলেন উপাধি 'শের খাঁ'। এই নতুন নামেই তিনি অমর হয়ে রইলেন।

শুধুই কি বীরত্ব? চাতুরীও করেছেন বৈ কি জীবনে—এমন কি ছলনাও। চাঁদেও আছে কলঙ্ক, উনি তো মানুষ।

দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি দেখলেন তাঁরই রাজ্যের পঁচিশ ক্রোশ দূরে মাড়বার রাজ মালদেবের স্বাধীনতার নিশান সদম্ভে উড়ছে। এ তাঁর সহ্য হল না! কিন্তু বীর মালদেবের রাজত্বে মাথা গলানো সে যে প্রায় দুঃস্বপ্ন! দুর্দান্ত দুঃসাহস।

চারিদিকেই প্রায় মজবুত কেল্লা সে রাজত্বের—যে দিকে ধূ ধূ মরুভূমি, দুঃসাহসী শের খাঁ চল্লেন সেই পথেই।

মনে তখন রাজ্যলাভের দারুণ পিপাসা। তপ্ত বালু ঠেলে হাজির হলেন গিয়ে মেরতায়। মেরতার পরই মালদেবের রাজ্যের প্রান্তসীমা—কিন্তু হায়রে! কি দেখলেন শের খাঁ। সারে সারে দুর্ধর্ষ রাজপুতবীরদের তাঁবু। দুর্দান্ত 'নর শার্দুলের'ও বুঝি হৃদকম্প সুরু হল—সামনে অজেয় শত্রু আর পেছনে ধূ ধূ মরু।

সুচতুর যুদ্ধরীতি ছেড়ে বেছে নিলেন ছলনার পথ—পথহারা পথিক আলোর সন্ধান পেল। চতুর চূড়ামণি মিথ্যার জাল বুনলেন। রাজপুত চরিত্র তাঁর নখদর্পণে। তারা সব সইতে পারে—পারে না বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ। রাজপুতের বীরত্ব রাজপুতের প্রভুভক্তি, সে যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ! এত বড় এই জাতটা—এরা কিন্তু জানতনা চতুরতা; 'শঠে শাঠ্যং' একথা তাদের অজানা। রাজপুত! তোমরা

সব হারিয়েও সবার প্রণম্য হয়ে রইলে—তোমাদের কথা সোণার অক্ষরে লেখা রইল ইতিহাসের পাতায়।

শের খাঁ কৌশলে এই রাজপুতবীরদের নামে দিলেন মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক। নিজেদের মিথ্যা কলঙ্ক মোচনের দায়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুপণ যুদ্ধানলে। বেঁচে গেল রাজপুতের অকলঙ্ক নাম। মৃত্যুতে তারা মৃত্যুহীন হয়ে গেল।

সম্মুখ যুদ্ধে নয়—ছলে কৌশলে হাতী দিয়ে তাদের দলকে পিষে বিজয়ী হলেন শের শাহ, কিন্তু একেই কি বলে জয়?

যে শিক্ষা হল তা চিরদিন গাঁথা রইল তার মনে:

হে ব্যাঘ্রজেতা বীর! তুমি ন্যায়বান বলে পরিচিত ছিলে, কিন্তু কিসের মোহে নিজেকে এমন করে ছোট করে গেলে জানতে মন চায়! তোমার ভাষাতেই বলি—সত্যই কি কয়েক মুঠি বাজরার জন্য?

শের খাঁ শুধুই কি বীর! তাঁর মত ন্যায় বিচারক শাসনদক্ষ রাজা ইতিহাসে বড় বিরল। কর্মচারীদের অন্যায়-অত্যাচার তিনি কঠোর হস্তে বন্ধ করেছিলেন। সুশাসনের জন্য রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ, সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করেছিলেন। কবুলিয়তনামা ও পাট্টা নেওয়ার নিয়ম তিনিই করান। সামান্য অদল-বদলে তাঁর অনুসৃত নীতিই আজও চলে আসছে—এ বড় কম কথা নয়! এই যে সুপ্রশস্ত গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড বা বাদশাহী সড়ক চলে গেছে বঙ্গদেশ থেকে সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত—এত তাঁরই সুমহান কীর্তি। শুধুই কি তাই, পথিকদের সুবিধার জন্য প্রস্তুত করলেন পান্থশালা—পথে পথে সরাইখানা। কোন্ রাজা তার প্রজাদের জন্য এতখানি সজাগ, তিনি ত শোষক মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রজাপালক—সত্যকার রাজধর্ম সমন্বিত মহান অশোকের তুল্য মহাপ্রাণ রাজা।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তবু কখনো করেননি হিন্দু দলন। ব্রহ্মজিৎ

গৌড়দেব তার সাক্ষ্য। তাঁর চিরশত্রু হুমায়ুন পুত্র, স্বনামধন্য আকবর পর্যন্ত তাঁরই রীতি অনুসরণ করে গেছেন। এ গৌরব বিরল।

এক কথায় "নর শার্দুল" শের খাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এ হেন শের খাঁর সমাধি সত্যই শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে সে সময়ের এমন স্থাপত্য আর নেই বললেই হয়। জগৎ-বিখ্যাত তাজের সঙ্গে এর স্থাপত্যের অদ্ভুত মিলন। এর প্রধান গম্বুজটি তাজের গম্বুজের চেয়ে তের ফিট পরিধিতে বড়। জল থেকে দেড়শো ফিট ও সমাধি মূল থেকে একশো ফিট উচ্চে এর গম্বুজ শীর্ষটি। সেকালের একটি অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ রক্ত প্রস্তরের এই শেরশাহ সমাধি ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

চিত্তে নাচে পথের নেশা মর্মে জাগে পথের সুর,
নিত্য মোরে পাগল করে কোন্ অজানা অনেক দূর।

সেই না জানা অনেক দূরের স্বপ্নে আনন্দ-বিহ্বল ভেসে চলেছি। পাথেয় যত পাই, যত দু'নয়ন ভরে ওঠে বিশ্ব প্রকৃতির রূপ রসে, মন তত বলে, আরো চাই, এ তৃষ্ণা কি মেটে না?

ভোরের হাল্কা হাওয়ায় বিশ্বপ্রকৃতি যেন সুন্দরতমের বন্দনায় ব্যাকুল....প্রভাতের এ আনন্দ লগ্নটিতে বিশ্ববীণায় যেন অমর্ত্য রাগিনী বেজে উঠেছে।

আমারও মনে আনন্দ প্লাবন এল—কিন্তু এ যে প্লাবনেরই মত আসে যায়, স্থিতি তার নেই। জরা মৃত্যু ব্যাধি—সকল মানবীয় চিন্তার অবসাদ থেকে মনে আনন্দের নাড়া দিয়ে কে আমায় জাগিয়ে দিয়ে যায়—মানব শিশু আবার যাত্রা সুরু করে তার শৈশব থেকে। পিছনে পড়ে রইলো বাঙ্গালাদেশ—তার ভাঙ্গা কুঁড়ে, কচুরীপানা, পদ্ম, শাপলার মেলা আর শোষিত অর্ধনগ্ন ও রোগজীর্ণ মানবগুলিকে

নিয়ে—আর নিয়ে তার অপরাজেয় প্রতিভা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাধনলীলাভূমি। বঙ্কিমের মাতৃভূমি, রামমোহন, অরবিন্দ, রবীন্দ্রের জননী জন্মভূমি। দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, অজেয় সুভাষের স্বর্গাদপি গরীয়সী।

আঘাতে অটল দুঃখে অজেয় এই বাংলাদেশ। বারবার কত নিদারুণ আঘাত সহ্য করে বেঁচে উঠেছে এ জাত। মানুষের দ্বারা মানুষের চরম অপমান ঘটেছে এর বুকে—বাংলার ইতিহাস কি ভুলতে পারে পঞ্চাশের মন্বন্তর? ভগবান কি ক্ষমা করেছেন বিজাতি শাসক ও দেশবাসী আড়তদারদের সে অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার। আজও যে চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই নিরীহ নির্দোষ কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের কঙ্কালসার মৃত্যু মিছিল। চোখের সামনে দোকানে দোকানে থরে থরে সাজানো থেকেছে লোভ্য সুখাদ্য খাদ্য সম্ভার। তারা লোলুপ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়েছে। ক্ষুধাপীড়িত নির্মম মৃত্যু বরণ করে নিয়েছে, তবু কেড়ে নেয়নি—ধৈর্য্য তারা মুহূর্তের জন্যও হারায়নি। এটা কি তাদের চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ, না পরাজিত জাতির চরম মেরুদণ্ডহীনতা? মন সান্ত্বনা মানে না; এ প্রশ্নের জবাব মন আজও পায়নি—ভবিষ্যতের সামনে রইল আমার এ একান্ত ব্যথার জিজ্ঞাসা।

প্রভাত সূর্য্য মধ্যাহ্নের তাপে প্রখর হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে গাড়ী এসে থামলো মোগলসরাই জংসনে। এখান থেকে কলকাতার দূরত্ব ৪৭০ মাইল। এই বৃহৎ ষ্টেসন থেকে কাশী যাওয়া যায়।

"ধর্মার্থীর চিরকাম্য ভক্তের আশ্রয়" এই কাশী বারাণসী হিন্দুর পরম তীর্থ। এখানের জলে, স্থলে, মন্দিরে মন্দিরে প্রাচীন ভারত আধ্যাত্ম মহিমায় ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে।

গঙ্গা উত্তরবাহিনী হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এই কাশীর নীচে দিয়ে বয়ে গেছে। গঙ্গার কোলে বসে এর দৃশ্য যেন একখানি মন্দির ও সোপানময় অপূর্ব চিত্রপট। বহু দূর থেকে দেখা যায় বেণীমাধবের

ধ্বজা, কত অগণিত মন্দির, কত অগণিত ঘাট। কি তার মনোহর শোভা! মন্দিরে সোপানে কাশী যেন তটহীন।

আপন ত্রিশূলে একে ধারণ করে রেখেছেন ভোলাশঙ্কর। এ ভূমি পরম পুণ্য ভূমি--এই আমাদের হিন্দু মনের বিশ্বাস।

শোনা যায় হিন্দুরা করেনি নারীর মর্যাদা—কে বলে?

আমি'ত বলি নারীর এতখানি মান আর কোনও ধর্মে বাড়িয়েছে বলে ত মনে হয় না।

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরে মান বাড়িয়ে গেছেন শ্রীরাধার। ঘর ভোলা যে বাঁশী একদিন সব ভুলিয়েছিল, সেই অনন্ত বাঁশরীর তান আজও কি মানবকে পাগল করে ফিরছে না? এখানে দেখি ভিক্ষাপাত্র হাতে অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন দেবাদিদেব ভিখারী মহেশ! অন্নপূর্ণার কি অপূর্ব গৌরবময়ী রূপ! বিশ্বের অন্নদাত্রীর কি মঙ্গলশ্রীমণ্ডিত ছবি!

আমাদের শাস্ত্রে দেখি পদে পদে পার্বতীর কাছে পরাজিত মহাযোগী এই আপন ভোলা শঙ্কর! ছাইভস্ম মাখা বাঘাম্বর পরিহিত মহারুদ্র বার বার সয়েছেন এই ভালবাসার লাঞ্ছনা পরম কৌতুকে! রিক্ত সর্বহারা সন্ন্যাসীর ঘরণী হলে কি হয়! তিনি যে বিশ্ব জননী। মহা ঐশ্বর্যময়ী অপরূপা তাপসী!

অগণিত ঘাট, অসংখ্য মন্দির—দশাশ্বমেধ ঘাট ও মণিকর্ণিকা তার মধ্যে প্রধান। আর আছে হরিশ্চন্দ্র ঘাট। এই মহাশ্মশানেই সত্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন ধর্মানুরাগী রাজা হরিশ্চন্দ্র হয়েছিলেন শ্মশান চণ্ডালের ক্রীতদাস এইখানেই; ধর্মের অগ্নি পরীক্ষায়।

আমাদের আছে শত বিফলতা, আছে দুঃখাতুর বিড়ম্বিত মুহূর্তগুলি কিন্তু যারা সেই অগ্নিময় ক্ষণগুলি, কণ্টকিত পথগুলি আপন মানস-শক্তিতে জয় করে অমৃতময় হয়ে গেছেন তাঁদের স্মরণেও মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে হর্ষে বেদনায় মানবীয় অলৌকিক গরিমায়।

যে পথ হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত, বেদনার কাঁটায় কাঁটায় কণ্টকিত, এঁরা সেই দুর্গম পথের পথিক—একটা ঐতিহ্যময় জাতির এঁরাই স্রষ্টা, এঁরাই পথ নির্দেশক।

কি কঠোর পরীক্ষা! একমাত্র মৃতপুত্র বুকে নিয়ে ক্রীতদাসী শৈব্যা এসেছেন প্রাণপুত্তলির সৎকারের ভিক্ষায়। পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একদা সসাগরা বসুন্ধরার রাজা, আঘাতে অকম্প ক্রীতদাস পিতা, অব্যক্ত বেদনায়!

যতই ভারতের পথে পথে ফিরি, দিকে দিকে দেখি ভারত আত্মার শাশ্বত রূপ।

নাগাল পাই না এঁদের, তবু গর্বে মন ভরে ওঠে এই পরম ভূমি-স্পর্শে! আমার স্পর্শ-কাতর হৃদয় উন্মনা হয় ব্যর্থ আতুরতায়……

দেবতা-মানুষের দ্বন্দ্বে যে পরম পুরুষ, যে মহামানবী দেবতাকেও করে গেছেন পরাজিত মানবীয় শৌর্যে দুস্তর ধৈর্যে, আমরা তাঁদেরই বংশধর। সেই গৌরব স্মরণ করে কেন আমরাও পথ চলতে পারি না, সব লাঞ্ছনা সব বিড়ম্বনাকে তুচ্ছ করে? এ অসহায় আতুর প্রশ্নের জবাব কই? কেন এমন হয়!

মানুষের বার বার চেষ্টা কেন বিফল হয়? কেন তাকে পথ ভ্রান্ত করে আতুর মুহূর্তগুলি চিত্তের দৌর্বল্যে? কে দেবে এর জবাব?

যে দুঃখের কোনও সাথী নেই, নেই কোনও সঙ্গী, যা শুধু হৃদয় রক্তে রঞ্জিত একার সম্পদ, বিশ্বের শ্রবণে যা অশ্রুত অগোচর—সেই বেদনাঘন মুহূর্তগুলিতে মানুষের মন চায় মর্মের দোসরকে, কিন্তু কোথায় সে মরমী?

আজ এই মহাশ্মশানের ধ্যানমৌনরূপে কেন আমি এমন চঞ্চল? কে এ জন্মবিরহী আমার মধ্যে এমন করে কেঁদে মরছে—গুমরে গুমরে উঠছে আজন্ম কাল?

আজ এই নিবেদনময় গোধূলিতে আমারও এই আত্মনিবেদন অক্ষয় হোক সেই অনির্বচনীয়ের পায়ে।

পরম মঙ্গলময় বিশ্বদেবতার মঙ্গল আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে; ভাবগম্ভীর ধ্যানমৌন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সমাবেশ মনকে মুগ্ধ করে। ভোলা ভিখারীকে আজ রাজবেশে রাজা সাজান হয়েছে—মানুষের শ্রদ্ধায় মানুষের ভক্তিতে তিনি হাসি মুখে পরছেন নিত্য নব বেশ। ধূপ ধূনায়, মালা-চন্দনে, আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা রবে রাজকীয় সমাবেশে বিশ্বরাজের পূজা হচ্ছে। কত দূর দূরান্তর থেকে ভক্তেরা এসেছে তাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে-ব্যর্থ জীবনের বিফলতার অব্যক্ত বেদনার বোঝা চোখের জলে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে পরম পিতার পায়। বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির পরধর্ম অসহিষ্ণু আওরঙজেব ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ করেন এবং সেই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরী করান আপন মসজিদ। মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ করা তাঁর চলিত প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মন্দির পার্শ্বস্থ জ্ঞানব্যাপী কূপে বিশ্বেশ্বরকে নিক্ষেপ করে রক্ষা করেন পুরোহিতরা। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি তিন দিক দিয়ে প্রবেশ পথ বিশিষ্ট মন্দিরটি অধিক দিনের নয়, মহারাণী ভবানীয় স্মরণীয় কীর্তি কাশী প্রদক্ষিণের পঞ্চক্রোশব্যাপী পথের সংস্কার ও দুর্গামন্দির, বহু মন্দির, বহু ঘাট—তার উল্লেখ অসম্ভব। দেখে দেখে যেন শেষ হতে চায় না।

কাশী দীর্ঘ দিনের—হিন্দু সংস্কৃতির মহাতীর্থ।

কাশীর ভৃগু জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্ব জনবিদিত—এমন জ্যোতিষ বুঝি আর কোথাও নেই। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র বা সৌরজগতের জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় গণনার জন্য কীর্তিমান রাজপুত রাজা রাজপুরাধীশ জয়সিংহ রচনা করিয়েছিলেন অপূর্ব মানমন্দির। বারানসীর এ একটি দর্শন-যোগ্য কীর্তি ইংরেজ স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক মেজর কীটের আদর্শে রচিত নয়ন-মনোহর কুইন্স কলেজ।

মিসেস বেসাণ্ট স্মরণ-ধন্য সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজই স্বনাম-ধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর যত্নে ও চেষ্টায় রূপান্তরিত হয়ে আজকের বিশ্ব বিশ্রুত হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়।

অধুনা কিছুদিন পূর্বে প্রস্তুত ভারতমাতার মন্দিরও একটি সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন। আর আছে এই কাশীতে বাঙ্গালীর বিশেষ জনপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

দেবালয়ে দেবালয়ে এ যেন দেবস্থান!

'যাদৃশি ভাবনা যস্য'। শুনেছি এখানে যেমন পণ্ডিত আছেন মহাপুরুষ আছেন, তেমনি আছে দুরাচারী দুর্জনেরা। পথে পথে বৃদ্ধাদেরই ভীড় বেশী—প্রায় প্রমীলার রাজত্ব। জীবনের সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেউলিয়া জীবন নিয়ে এঁরা ছুটে এসেছেন ভিখারী মহেশের পরমাশ্রয়ে পারলৌকিক চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে শিবলোক প্রাপ্তির দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে····হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ হে মহাদেবস্থান, তোমায় নমস্কার!

কাশীর অদূরবর্তী সারনাথ – বৌদ্ধসাহিত্য প্রসিদ্ধ ঋষিপত্তন বা মৃগদাব······এই মৃগদাবে পূর্বজন্মে মৃগরূপ ধারণ করে এক সন্তান-সম্ভবা হরিণীকে রক্ষা করেছিলেন মহাতপা গৌতম। মৃগজাতকে আছে এর সবিশেষ উপাখ্যান।

শাক্যমুনি সম্বোধি লাভ করে এইখানেই প্রথম মহা-অমৃতের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর পঞ্চ শিষ্যকে; সে পঞ্চ শিষ্য হতেই সঙ্ঘের পত্তন। তাই বৌদ্ধমাত্রের কাছেই এ ভূমি পরম পবিত্র।

সূত্রপিটকে সংযুক্ত নিকায়ে শাক্যমুনি বলছেন—

"গিরি পথে চলতে চলতে এক পান্থ একটি বহু প্রাচীন পথ দেখতে পেলেন। পুরাকালের বহু জনপদলাঞ্ছিত সে পথ। পথিক আরও দেখলেন প্রাসাদ, কানন, সুন্দর সরোবরময় একটি সুরম্য হৃদয়-রঞ্জন পুরী। মনোমুগ্ধকর সেই স্থান আবিষ্কার করে তিনি কি করবেন?

তিনি কি ফিরে এসে রাজা বা মন্ত্রীকে সেটির সংস্কার করতে অনুরোধ করবেন, না সেই পরিত্যক্ত রম্য পুরী যাতে আবার ধনে জনে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে তাই হবে তাঁর চেষ্টা ? ভিক্ষুগণ ! আমিও তেমনি এক অমৃতময় প্রাচীন পথ দেখতে পেয়েছি—মহাজনেরা পুরাকালে এই পথেই যাতায়াত করতেন। এই পথে চলতে চলতেই আমি জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করে ধন্য হয়েছি, আর তোমাদের দ্বারে এনেছি। সেই পথের সন্ধান।"

সেই মহা-পথ-পথিক পরম পথের সন্ধান পেয়ে স্থির থাকতে না পেরে এই পথেই ছুটে এসেছিলেন পঞ্চ শিষ্য সন্ধানে পথ নির্দেশের আশায়।

বুদ্ধের সময় এই সারনাথ কাশীর অঙ্গ স্বরূপ ছিল, আজ যদিও স্বতন্ত্র গ্রাম। এইখানেই মহাকারুণিক "ধর্মচক্র প্রবর্তন" করেন ধর্মচক্রের কারুকলা ভারত শিল্পীর হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি থেকে উত্থিত। তাই এর রূপ এমন ভাব-গম্ভীর। এই সারনাথে বহু অপূর্ব বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে—পদ্মাসন, রাজাসন, বীরাসন, বজ্রাসনে উপবিষ্ট শান্তশ্রী মণ্ডিত পবিত্রতায় জ্যোতিষ্মান এ মূর্তিগুলি ভারত শিল্পীর ধ্যানের ধন। যেখানে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ পঞ্চশিষ্যের কাছে তাঁর আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অনন্তকল্যাণ ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই স্থানটিকে স্মরণীয় করার জন্য প্রিয়দর্শী অশোক এক স্তম্ভ রচনা করেন। স্তম্ভোপরি খোদিত করান আপন অনুশাসন। সেই স্তম্ভ-শীর্ষে যে অপূর্ব সিংহ মূর্তি আছে সেটিকেই আজকের স্বাধীন ভারত জাতীয় প্রতীক রূপে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

আমাদের আত্ম-সচেতনতার ও আত্ম-উপলব্ধির বিশেষ মুহূর্ত এই দুঃখ দুর্দশাময় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগ-সন্ধিক্ষণ। আমরা কোন মহাধর্ম, মহাজাতির ঐতিহ্যকে বহন করার অধিকারী—আমরা কাদের বংশধর

এ যদি না ভুলি—সব দুঃখ, সব ঝঞ্ঝা জয় করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

আমাদের ঋষিরা আমাদের যুগাবতারেরা বারে বারে বলে গেছেন—তোমরা অমৃতের সন্তান, এ কথা বিস্মৃত হোয়ো না। 'আত্মানং বিদ্ধিং', নিজেকে জানো।

বৌদ্ধ স্তম্ভগুলি ভারত-শিল্পীর হৃদয়ের রূপময় স্বপ্ন প্রকাশ। স্তূপ বেষ্টনীর তিনটি স্তম্ভ বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম বোঝায়, স্তূপের চারটি প্রবেশ পথ গৌতমের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন ও মহাপরিনির্বাণের অলৌকিক সুষমাময় চিত্র দ্বারা সুশোভিত। স্তূপের তলদেশ থেকে যে পাঁচটি স্তম্ভ উত্থিত হয়েছে তা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ সূচনা করে। বুদ্ধের প্রতিটি স্তূপ প্রতিটি স্তম্ভ এমনই আধ্যাত্মিক ভাবময় গভীর ভাবার্থের দ্যোতক। সারনাথ স্তূপ আজ ভগ্নপ্রায়।

সারনাথের ধামেক স্তূপ বুদ্ধগয়ার স্তূপের মত—সম্রাট অশোক এটি নির্মাণ করান। বহু বর্ষ খননের ফলে আজ সারনাথের ভূগর্ভ থেকে এক অত্যাশ্চর্য জীবন্ত দৃশ্যবহুল সুরম্য নগর, বৃহত বুদ্ধমূর্তি, সুন্দর কারুকার্যময় প্রস্তর ফলক—গৃহ রচনার নানা আলঙ্কারিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে লুপ্তপ্রায় সে দিনের গৌরবময় দিনগুলির একটি সুন্দর আলেখ্য। নালন্দার ন্যায় এখানেও একটি যাদুঘর আছে। এইখানে ও নালন্দায় ১০।১২ আঙ্গুল দীর্ঘ ও ৭।৮ আঙ্গুল প্রস্থ মসৃণ পাথরে বুদ্ধের জন্ম থেকে পরিনির্বাণ পর্যন্ত যে জীবন-আলেখ্য খোদিত আছে—তা শিল্প-লোকের অপূর্ব গৌরব—কারুকলার একটি বিস্ময়!

ভগবান বুদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে প্রথম তাঁর পঞ্চ শিষ্যকে ধর্মোপদেশ দেন সেই মহাপুণ্য ভূমিকে স্মরণীয় করে রেখেছে 'চৌখণ্ডি' স্তূপ।

উত্তর প্রদেশের প্রধানতম সহর এলাহাবাদ—মন ভেসে যায় সেই ঐতিহাসিক যুগে যখন রাজা হর্ষবর্দ্ধন পাঁচ বছর অন্তর মহাযজ্ঞ করতেন আর সেই যজ্ঞান্তে সর্ব্বস্ব দান করে রিক্ত হয়ে যেতেন, সর্ব্বত্যাগিনী ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সামান্য চির গ্রহণ করতেন রাজবেশ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে—ভারতের গৌরবময় যুগের মানবমানবী তাঁরা, তাঁদের স্মরণেও পুণ্য! এখানের পাতালপুরী মন্দিরের যে অক্ষয় বট পূজা পেয়ে আসে তা আদি বৃক্ষ নয়। আদি বৃক্ষ ধ্বংস বা লুপ্ত হয় দুর্গ প্রস্তুতের সময়ে। এ দুর্গ রচনা করান আক্‌বর ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। অধুনা কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত দুর্গ মধ্যস্থ একটি শাখাকে আসল অক্ষয় বটের শাখা বলে মনে করা হয়; আদি মহাবৃক্ষের কথা হুয়েনসাং উল্লেখ করে যান। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহের ইচ্ছায় ভারতে পরিব্রাজকরূপে আসেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গেই প্রয়াগ সঙ্গমে তিনিও পুণ্যস্নানে এসেছিলেন।

গ্রীসিয়ান স্থাপত্য সমন্বিত এই দুর্গ দুয়ারটি—আর এই দুর্গ প্রবেশ পথে একটি ৩৫ ফিট উচ্চ অশোকস্তম্ভ আছে, যাতে ২৪২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এই স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-বার্ত্তা ও পরবর্ত্তী কালে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণ বিষয়ও উল্লিখিত আছে। এই পিলারটি সম্ভবত কৌশাম্বী থেকে আনা হয়েছে। এই এলাহাবাদ থেকে ৩৪ মাইল দূরে আছে কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ। যমুনা কিনারের অতি প্রাচীন এই বৌদ্ধনগর—গৌতমবুদ্ধের পরবর্তী বৎস রাজা উদয়ন খৃষ্ট পূর্ব ছয় শতাব্দীতে এইখানে রাজত্ব করেছিলেন। উদয়ন কথায় কত তার কাহিনী কত কথিকা—মন সচকিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে—না জানি কেমন ছিলো রূপকথার মত সেই সব গত যুগের মানবমানবী এই কৌশাম্বীর ঘোষিতারা সংঘরামে লোকপ্রিয় তথাগত বহুদিন বহুবার বাস করে গেছেন। কৌশাম্বীর মাইল দুয়েক দূরে পাভোসারক জৈনদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ।

এই এলাহাবাদেই আছে খুসরু বাগ—মহামান্য আক্‌বরের প্রিয়তম পৌত্র, মানসিংহের ভাগিনেয়, জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অম্বর দুহিতার নয়নানন্দ খুসরুর সমাধি কোলে নিয়ে রুষ্ট পিতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খুরমের নির্মমতার কাহিনী জাগিয়ে—রাজনীতির কুটচক্রের নিষ্ঠুর নিদর্শন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন তাঁরই কাছে মানসিংহ ভগিনী যোধীবাই খুসরু জননী।

কত যাত্রী আসে, কত যাত্রী নেমে যায়। সবারই দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে আসছে এক নবীনা যাত্রীর দিকে। বোধ হয় চলেছেন বৃন্দাবনের পথে এলাহাবাদের ত্রিবেণী-সঙ্গমে পুণ্য-স্নান্ সমাপনান্তে! সুশ্রী মুখে তিলকচর্চ্চা শোভা পাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন এক ধারে, বসবার ঠাঁই মেলেনি। সাধারণ ভদ্রতায় বসবার স্থান করে দিলুম, বিনীত হাস্যে কাছে এসে বসলেন, শুধালেন, কোন্ পথের পথিক? চলেছ কোথায় ভাই? অনাড়ম্বর নিঃসঙ্কোচ এ প্রশ্ন মনকে বিস্মিত করে বইকি! সকৌতুকে জবাব দিলুম, পথে বিপথে জনারণ্যের মাঝখানে বিশ্বদর্শনের আকাঙ্ক্ষায়।

—তাই নাকি? তুমি তো ভাই রসের রসিক! তা চল বন্ধু, ত্রিভুবনের সেরা বন বৃন্দাবনে। সে ধূলি যদি না মাখলে জন্ম বৃথা গেল যে! শুনতে কি পাও সেই সর্বনাশা বাঁশী হৃদয়-বৃন্দাবনে? সে সুরে যে শুধু আনন্দ! একতারায় বেজে উঠল:

দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই।
যে যুগযুগান্ত ফোটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই॥

সুকণ্ঠ বটে! এ তো শুধু গান নয়, এ যে দরদ-ভরা মনের আপন মরমীর কাছে একান্ত আত্মনিবেদন—আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে চলেছে চিরসুন্দরের অভিসার! মানব-আত্মা যাত্রা করেছে পরমাত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষায়। মর্ত্যের রাধিকা চলেছেন রাখাল কৃষ্ণের অভিসারে—সকল বন্ধন সব লাজ মান তুচ্ছ করে।

হাথ্‌রাস স্টেশন এসে পড়েছে। এক হাতে কমণ্ডলু আর এক হাতে একতারা। অনুনয় করে ডাক দিলেন, ওঠ, ওঠ বন্ধু! এখুনি যে গাড়ি ছেড়ে দেবে!

সঙ্কোচে লজ্জায় তাকাতে পারলুম না; হয়তো এতক্ষণে সবারই কৌতুকদৃষ্টি আমার দিকে পড়েছে।

—চলে এস! চলে এস বন্ধু! বিশ্ব দেখতে বেরিয়েছ, আর বিশ্বরূপকে দেখবে না? এ বৃন্দাবনের অণুতে অণুতে যে গিরিধারী গোপাল! প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে দেখবে না বৃন্দাবনের নওল-কিশোর-লীলা! ভাল না লাগে চলে যেয়ো। কিন্তু এমন করে আঙিনার ওপর দিয়ে চলে যেয়ো না—এ কথাটুকু রাখ। মনে হল বলি, কেন মিনতি? কে তুমি যে এমন করে ডাক দিচ্ছ? যাব না ঠিক করেই তার দিকে তাকাতে তার চোখে চোখ পড়ল। জানি না কি আহ্বান সেখানে পড়লুম। যেন মনে হল, এ বাণী আমার জন্ম-জন্মান্তর পার হয়ে বহু বিঘ্ন অতিক্রম করে আজ এই বিশেষ মুহূর্তটিতে আমার জীবনে এসে পৌঁছেছে। না, আর বলা হল না, ট্রেন নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে নেমে পড়লুম। গাড়ি স্টেশন ছেড়ে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। অজানা স্টেশনে অচেনা যাত্রীর পাশে সম্বিতহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। মন বার বার তর্জনী তুলতে লাগল—সাবধান, এঁদের বিশ্বাস ক'রো না। মানুষকে ভ্রান্ত করাই এঁদের কাজ। বন্ধনহীনা নারী সর্পবৎ চিরবর্জনীয়া। বেরিয়েছ দেশে দেশে যাযাবরীয় নেশায়। এ সব কি? আবার একতারায় সেই সর্বনাশা সুর বেজে উঠল:

ওরে নিঠুর গরজি!
তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে॥

এগিয়ে চলল বৈরাগিণী। ইশারায় যেন জানিয়ে গেল, এস বন্ধু, বৃন্দাবনের বনে বনে মানস-অভিসারে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ পেছনে

পেছনে চললুম। স্টেশনের একটি নির্জন প্রান্তে সে গুছিয়ে বসল একতারাটি নিয়ে, সহজ সুরে বলল, রাগ করেছ বন্ধু? কিছু মনে ক'রো না। বৃন্দাবনের নিমন্ত্রণে যে আমাদের জন্ম-অধিকার! পথের নেশায় বেরিয়েছ, পাথেয় কুড়াবে না তো ক্লান্তি ঘোচাবে কি দিয়ে?

সন্ধ্যার অন্ধকারে অনামিকার অনুগামী হয়ে বৃন্দাবনের পথের ধূলোয় পা বাড়ালুম, কে জানে কোন্ অজানার গোপন ইঙ্গিতে। মনে যে রহস্য জাগে নি তা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিছু সংশয়, কিছু দ্বিধা, কিছু কৌতুক নিয়ে এগিয়ে চললুম অচেনা বান্ধবীর আস্তানার দিকে।

পথে যেতে নতুন বান্ধবী বলল, ভাবনা কি ভাই, যত মানুষ তত রূপ, যত মত তত পথ। পথের ঝোলা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতায় ভরে নাও, তবে তো তোমার ঘর ছাড়া সফল হবে, কাঁদবে, যত কাঁদাবে তত তবে তো সুখ!

চাঁদের আলোয় চারিধার পরিপ্লাবিত। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস উৎসবমুখর। আনমনা হয়ে অচেনা পথের ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। সবে সন্ধ্যা, গোধূলি একেবারে শেষ তখনও হয় নি। জ্যোৎস্নায় সাদা পথের ধূলায় সঙ্গীতের দূরাগত গুঞ্জন মিলে মিশে আমার মনে এক স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছে। বার বার প্রশ্ন জাগে, কে আমি? কোথায় যাত্রা আমার? চলেছি কিসের সন্ধানে?

পথে চলতে চলতে কতদূর এসে পড়েছি জানি না, হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাই নতুন বান্ধবীর ডাকে: আমরা যে এসে পড়েছি বন্ধু, এবার থাম—এই আমাদের আখড়া। আজ ঝুলন-পূর্ণিমা, তাই একটু কীর্তনের সমারোহ হচ্ছে। আজ আমাদের ললিতাদি গাইবেন কিনা, তাই আজ ভক্তের এত ভিড়—অমন দরদ দিয়ে কি সবাই গাইতে পারে?

আধো-অন্ধকার আলোছায়ার আড়াল পেরিয়ে আমরা সেই ভাবেই একটি নাটমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। কীর্তন তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। ব'স, বসে পড় বন্ধু এইখানেই—বলে নতুন বান্ধবী উঠে গেল নাটমন্দিরের ওধারে। তাকিয়ে দেখি, তারই মত বৈরাগিণীদের সেখানে একটি জনতা। মাঝবয়সী এক সন্ন্যাসিনী একতারা হাতে তন্ময় হয়ে কীর্তন গাইছেন—চোখের সামনে তাঁর পাথরের যুগলবিগ্রহ দোলনায় দুলছেন। তাঁর সে গানের আকর্ষণে পাষাণ-দেবতার প্রাণ জাগল কি না জানি না, তাঁর সে কান্নায় তাঁর মনোহরণ ফিরে চাইলেন কি না জানি না ; তবে তাঁর গান উপস্থিত অনেকেরই মনোহরণ করতে পেরেছে তা বুঝতে পারলুম। নিঃশব্দ তন্ময় সভায় একমাত্র তাঁর গান ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বপানে উঠে চলেছে।

মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণ ভাগ।

গানে গানে ঝরে পড়ছে—ওগো আমার মরমী, এই তো আমি এসেছি তোমার কাছে সব বাধা অতিক্রম করে। আজ আর আমি অভিমানে মুখ ফেরাব না প্রিয়। চেয়ে দেখ, আমি তোমারই দ্বারে ভিখারিণী। আমার সকল মান সকল অহংকার—সে তো তোমারই দেওয়া। আমার হৃদয়-যমুনা দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে—এই জোয়ারে যে আমার সকল আমিত্ব ভেসে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সারা ব্রহ্মাণ্ড যে আজ তুমিময়! এস প্রভু, আর কতকাল দুয়ার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখবে ?

সবার নয়ন ছলছল হয়ে উঠেছে। খোল-করতালের রব নীরব হয়ে এল, সঙ্গীত গেল থেমে, তবু যেন আকাশে বাতাসে তার সুরধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তের পানে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে মনে প্রণাম করে হার স্বীকার

করলুম। তোমাদের বিচার করা আমার স্পর্ধা মাত্র। তোমাদের বুঝতে পারিনি—আজও ভাল করে চিনতে পারলুম না তোমাদের; তবু তোমাদের আর বিদ্রুপ করিনা, মন আর বিরূপ নয় তোমাদের প্রতি।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙল কাঁসর-ঘণ্টার রবে। মন্দিরে মন্দিরে আখড়ায় আখড়ায় মঙ্গল-আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে নামগান। কে যেন গুন গুন সুরে গান করছে ঃ

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন
মধুর মধুব বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন।

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। ভোরের রূপ তার অপূর্ব ঐশ্বর্য নিয়ে চোখ জুড়িয়ে দিল। যমুনা-কিনারে সোজা পথে এগিয়ে চলেছি। সূর্যোদয়ের মহিমায় পূর্ব্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত। গাছে গাছে কলকাকলি মুখর হয়ে উঠল। ছোট ছোট ঝোপের মত গাছে-ছাওয়া কুঞ্জবন—কোনটি নিধুবন, কোনটি শ্যামকুঞ্জ, কোনটি রাধাকুঞ্জ। মন কল্পনা-সায়রে ভেসে চলেছে। এই সব কুঞ্জে কি সত্যই কোনও দিন কৃষ্ণের অভিসারে শ্রীরাধা এসেছিলেন সব ভুলে? গোপীরা উন্মনা হয়ে ঘরের আগল ভেঙেছিল এরই বুকে? আজও যেন দেখি এখানের জীবন ধারণে বাঁধন-হারা আগল-ভাঙ্গা সুর। রীতিনীতি কিছুটা অসামাজিক। রাধাকৃষ্ণের বন্ধন ছিলনা, তাই তাঁদের মিলনও অসামাজিক—কিন্তু তাত কামনা কলুষ নয়, সে যে সব হারিয়ে পরস্পরের কাছে আত্মনিবেদনের মহিমায় মহিমান্বিত। এখানে আজও দেখি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাস করছে, কেউ বা নামে মাত্র কণ্ঠিবদল করে কেউ বা তাও নয়, অথচ তাদের ত ছোট বলতে পারি না, যে দরদ তাদের পরস্পরের মধ্যে দেখেছি সে যে অতুলনীয়—তারত তুলনা পাই না!

সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী বাউল বাউলানী ভিখারী ভিখারিণী সব পথে

বেরিয়ে পড়েছে মাধুকরী করতে। কুঞ্জে কুঞ্জে মঠে মন্দিরে শুধু—রাধেকৃষ্ণ! কেউ বিমুখ করবে না, কেউ ফেরাবে না নির্মম আঘাতে। এর আকাশে বাতাসে আজও যে ভালবাসার সুর অনুরণিত হয়ে চলেছে।

তুলসীর মালা গলে সুকণ্ঠ বাউল একতারায় গীতগোবিন্দ গেয়ে চলেছে ঃ

ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী

রাখাল কৃষ্ণদূত ব্রজের বালক আজও যায় বাঁশী বাজিয়ে গোধন চরাতে মাঠে মাঠে। 'ব্রজের বালা ঘরে ঘরে দুগ্ধ দোহন করে'—যত দেখি তত মুগ্ধ হই। একান্ত দারিদ্রের মধ্যে, একান্ত অনাড়ম্বরের মাঝখানে এ কি অপূর্ব ঐশ্বর্য্য! পথে পথে ভীড় করেছে বেশীর ভাগই তারা যারা জীবন যুদ্ধে দেউলে হয়ে গেছে। একাই পড়ে আছে কোনও একটা আশ্রমে। হয়ত সকলে ভাল করে খেতে পায় না, হয়ত আছে আরও কত অভাব অভিযোগ। কিন্তু দেখলে মনে হয় না তার জন্য বিশেষ ক্ষোভ আছে। অধিবাসীদের মধ্যে অধিবাসিনীরাই বেশী এবং তাও বাঙ্গালী বৃদ্ধাদেরই আসর বোধ হয় সংখ্যায় সবার অধিক। মনে প্রশ্ন জাগে—কেন? ক্ষোভ হয়! বাঙ্গালী কি সবার চেয়ে নিঃস্ব, সবার চেয়ে দরিদ্র? তাই তাদের মা বোনেরা এমন করে ঘর ছেড়ে ব্রজের পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে?

তারা কি স্বার্থ কলুষিত? যার জন্য তারা এই অক্ষমাদের ভরণ পোষণ করে না? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইনা—সান্ত্বনা খুঁজি তা নয়! বাঙ্গালী ভাব প্রবণ, শ্রীগৌরাঙ্গের দেশের মানুষ, তাই তারা বৃন্দাবনের মধুর লীলায় সহজে আকৃষ্ট, সহজে আত্মহারা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। অনেক দূর চলে এসেছি খেয়াল করি নি। হঠাৎ পথ চলায় বাধা পাই।

—আরে! আমাদের রাতের অতিথি না? এদিকে কোথায়? পথ ভুলে কি কষ্টটাই না পেতে বল দেখি? ভাগ্যে এদিকে আমার কাজ ছিল। আর তোমায়ও দেখেছি কাল নতুন রাধার সঙ্গে আখড়ায় ঢুকতে! আরে! চল চল, কাউকে বলে আসি নি তো? ওরা হয়তো এতক্ষণে ঘর-বার করছে।

মনে মনে বললুম, পথ হারালেও দুঃখ ছিল না, পথের মানুষ হারিয়ে যায় পথে সেইটেই তো স্বাভাবিক। এখানে তো আমি ঘর বাঁধতে আসি নি। পথে চলতে কথায় কথায় নতুন বান্ধবীর কথা উঠল।

—আরে! ওর কথা ব'লো না ভাই, ওই তো আখড়ার প্রাণ। ও যে ফুলের গন্ধের মত, গানের সুরের মত সারা আখড়ায় ছড়িয়ে আছে।

এতটা মুগ্ধ ভাব তো ভাল নয়। বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখলুম, চির-কৌতূহলী মন রহস্যে উৎসুক হয়ে উঠল। মনে হল শুধাই, আপনিই কি তা হলে নতুন বান্ধবীর—? সংকোচ মুখ বন্ধ করে রাখল।

বলে চলল বৈরাগী, কেমন করে একদিন নতুন রাধা আশ্রমে এসে উঠল—লাঞ্ছিতা বিতাড়িতা একান্ত সহায়-সম্বলহারা হয়ে; বাংলার এক দূর পল্লীতে তার জন্ম, বিয়েও হয়েছিল তেমনই এক পল্লীগ্রামে। গ্রামের মেয়ে গ্রামের আওতায় দিন কেটে যেত হয়তো আরও দশ জনের মত, কিন্তু তা তো হবার নয়। যার ওপর প্রভুর এত কৃপা হবার ছিল তাকে তো আসতেই হবে অনেক দুঃখ-সাগর পার হয়ে, অনেক বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে। পথের কুটো ঝড়ের হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে আখড়ায় এসে জুটল। ললিতাদি কি চোখেই যে দেখলেন, নিয়ে গেলেন বড় গোঁসাইয়ের শ্রীচরণে। সে কি আজকের কথা! বড় ঠাকুর দেহই রেখেছেন সে আজ কত কাল হয়ে গেল। কথক

স্তব্ধ হয়ে খানিক নীরব হয়ে রইল, মনে মনে যেন কোন স্মৃতির সাগরে ডুব দিয়েছে। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, প্রাণ আছে যার তার তো প্রকাশ হবেই, আগুন কি চিরদিন ছাই-চাপা থাকে? তাই তো আজ নতুন রাধা আশ্রমের জীয়নকাঠি—ও না থাকলে আশ্রম অন্ধকার হয়ে যায়। মনে হয় যেন বৃন্দাবনের শ্রী চলে গেছে। ওর আসল নাম আমরা আজও জানি না—কোন্ গাঁয়ে ওর জন্ম, কি তার জাত, তারও খোঁজ রাখি না। বড় গোঁসাইয়ের নাম রাখা এই নতুন রাধাকেই আমরা চিনি, তার বেশী কিছু জানতেও ইচ্ছে হয় না।

আখড়ায় এসে পৌঁছেছি ততক্ষণে। বৈরাগী হাঁক দিল, কই গো নতুন রাধা! তোমার পথের পাগল যে পথেই হারাচ্ছিল, দেখতে পেয়ে ধরে এনেছি। মানুষ ভাল নয়, কেমন যেন উড়ু উড়ু। এর পর একটু সাবধানে থেকো। এ রসিকতায় মন মোটেই সায় দিল না, ঝঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এল নতুন বান্ধবী। মাথায় উঁচু করে চুড়ো বাঁধা, কোমরে কাপড় জড়ানো, দুই হাতে কর্মব্যস্ততার চিহ্ন; বড় রসিক হয়েছ শ্রীদাম। একটু থামা দাও দেখি। আমার দিকে চেয়ে বলল, এমন পালাই পালাই ভাব কেন ভাই! ধরে আমরা রাখব না, ইচ্ছে হলেই যেয়ো। তবে এমন না বলে পালিয়ো না কিন্তু। কণ্ঠে যেন অভিযোগ। বলতে পারলুম না, পালাতে নয়, বেড়াতে গিয়েছিলুম নিছক মনের খেয়ালে। নীরবে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আবার বলে উঠল, আহা! মুখখানা শুকিয়ে গেছে। যাও গো শ্রীদাম, নতুন মানুষটিকে নিয়ে যাও। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দাও গে। ওই যে পূবের ঘরখানা, ওটাতেই আপাততঃ নতুন বন্ধুর আস্তানা হয়েছে। ওখানেই সব পাবে। আমার দিকে ফিরে বলল, কত কষ্টই না তোমার হচ্ছে! তবে উপায় কি বল, আমরা এমনি করেই সুখে দুঃখে দিন কাটাই গো বন্ধু। বলতে বলতে সে যে পথে এসেছিলো

সেই পথেই ফিরে গেল। শ্রীদাম আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমার নির্দিষ্ট ঘরে। বড় মাটির উঠান, তার একদিকে একটি ছোট বাগান। এক কোণে তুলসীমঞ্জরীর ঝাড়। অন্য দিকে সারি সারি ছোট ছোট মাটীর ঘর। সামনে লম্বা দালান। মাঝখানে মন্দির ও একটি ছোট নাটমন্দির শুধু পাকা ইঁটের। কিন্তু কি পরিচ্ছন্ন, যেন ছবির মত তকতক করছে। নিকানো পোঁছানো, ছুঁচটি পড়লে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রথম দৃষ্টিতেই মন প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। শ্রীদামের পিছু পিছু আমার ঘরে গিয়ে উঠলুম। এই নিরাভরণ পরিচ্ছন্ন ঘরখানিতে বসে মন জুড়িয়ে গেল। ঘরখানিকে একান্ত আপন ভাববার প্রলোভন মনে মনে সামলাতে পারলুম না। বসে পড়লুম মধুর আলস্যে তক্তার এক পাশে। শ্রীদাম ঠাকুর তাড়া দিয়ে উঠল, কর কি ঠাকুর! এই তো প্রথম দিন, তাই মধুই পেয়েছ, বিষের জ্বালা তো এখন ও পাওনি বাবা! এ হল গিয়ে ভীমরুলের কামড়, খেয়েছ কি মরেছ—সারা অঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেবে। বলে অপূর্ব মুখভঙ্গীমায় শ্রীদাম ঠাকুর নীরব হল। তার রসিকতায় না হেসে পারলুম না।

দিন যায়! বসে আছি গাছতলায় যমুনা-কিনারে। দূরের রাখাল বেণু বাজিয়ে একলা চলেছে মাঠের পথে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে কদম-গাছগুলি কি অপূর্ব শ্রী নিয়ে! তবু যেন চারিধারে কেমন নিঃসঙ্গতা···

কে উদাসী শ্রাবণের বেদনার্ত দিনে
হোমবহ্নি জ্বালি দিল হৃদয়ের বীণে!

কোন্ সে অলকার বিরহী যক্ষের মত সমস্ত পৃথিবী বিরহী হয়ে ওঠে এই শ্রাবণে। কার জন্য বিরহ সব সময় বলা যায় না, তবু যেন বুকের ভিতর গুরু গুরু করে কিসের আকিঞ্চন! মন উদাস হয়ে যায়। এ পৃথিবীর মাটি ছেড়ে সে যে ঊর্ধ্বে ভেসে যায় ওই

নীলাকাশের পানে, যেখানে মেঘের দল চঞ্চল হয়ে মেতুর হয়ে ওঠে, অজানা অনুরাগে। যেখানে দূরের পথিক শ্বেত বলাকার দল উড়ে যায় নিরুদ্দেশের পানে—বিনি-সুতোয় গাঁথা মালাখানি যেন ছুটে চলে কোন্ পরমতমের কণ্ঠলগ্ন হবার দুরাশায়। এমনি শ্রাবণের দুর্যোগময় নিশীথেই শ্রীরাধা নাকি চলেছিলেন কৃষ্ণের অভিসারে—পথে ঝড় ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ, তবু চলেছেন বিরহিণী প্রিয়-মিলনের আশায়। অল্পে যে পাওয়া, বিনা কৃচ্ছ্র সাধনে যে পাওয়া, তাতে তো পরিপূর্ণতা নেই! যা দুর্লভ তাতেই মানবের আকিঞ্চন! রাধা কি পেতে পারেন তাঁর দুর্লভতমকে বিনা বাধায়, বিনা কৃচ্ছ্রসাধনে? যত বিঘ্নই আসুক, যত দুর্যোগই হোক, তাঁকে যে পৌঁছতেই হবে আপন মরমীর কাছে প্রাণের আকিঞ্চনে, এর জন্য কি তিনি সাধনা করেন নি?

কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি'।
গাগরি বারি ঢারি' করি' পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি'॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি'।
দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি'॥

সমস্ত অঙ্গনকে কাঁটায় কাঁটায় কণ্টকিত করে, জল ঢেলে ঢেলে তাকে পিচ্ছিল করে, দিনের পর দিন সেই অঙ্গনে একা সবার অলক্ষ্যে তিনি গোপনে পথ চলার তপস্যা করে এসেছেন। এত সাধনা, এত আকিঞ্চন—এ কি ব্যর্থ হতে পারে!

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

কিন্তু তবু থামলে চলবে না। শ্রীরাধাকে যেতেই হবে প্রিয়মিলনের আশায়।

ঘনঘোর অন্ধকারে ঝড়ঝঞ্ঝাময় দুর্যোগের রাত্রে একাকিনী বিহ্বলা শ্রীরাধা চলেছেন

মন্দির তেজি যব পদ চার আওনু
নিশিথেরি কম্পিত অঙ্গ
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদ যুগ বেঢ়ল ভূজঙ্গ।

শ্রীরাধা বিভ্রান্ত হয়েছেন, পথ ভুলে যাচ্ছেন—কিন্তু তবু বলছেন—

'তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জানলু'

এমনি ধারা সবহারা একান্ত আত্মনিবেদন না হলেতো সেই পরম-তমের কাছে পৌঁছান যায় না!

দেখতে দেখতে কত দিনই কেটে গেছে। মন ব্যস্ত হয়ে উঠল : আর নয়। ঘর ছেড়ে কি নতুন ঘর বাঁধতে এসেছি? অসময়ে অকারণে কেন এ যাত্রাচ্ছেদ? আজই কথাটা নতুন রাধাকে বলবার সঙ্কল্প করে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। সারাটা দিন বৃন্দাবনের পথে পথে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে, গিরি-গোবর্ধন দর্শন করে, আখড়ায় যখন ফিরে এসেছি, তখন নিশুতি রাত হয়ে গেছে। এত রাতে কাউকে জাগাব না ভেবে নিঃশব্দে আখড়ার কাছে এগিয়ে আসতেই দেখি, পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন রাধা : এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে ঠাকুর? এমন করে কি ভাবাতে আছে? একটু বলে গেলেইতো হত। পথ চেয়ে চেয়ে আমার যে সময় কাটে না! কণ্ঠে ভরা গভীর উদ্বেগ। কি বলি, কি জবাব দিই, হঠাৎ বিব্রত হয়ে তার দিকে তাকালুম। গভীর দুটি কালো চোখের দৃষ্টি যেন আমার এই বাইরের আবরণটা ভেদ করে মনের ভেতর তন্ন তন্ন

করে খুঁজে বেড়াচ্ছে! তাকে অনুসরণ করে দাওয়া পেরিয়ে আপন ঘরে ঢুকলুম। স্তিমিত দীপের আলোয় চোখ জুড়িয়ে গেল রাতের এই স্তব্ধ প্রহরে এ মাটির ঘরে। সামান্য আয়োজন কে যেন প্রাণের দরদ ঢেলে স্বর্গ রচনা করে রেখেছে। মাথার কাছের খোলা জানালাটা দিয়ে জ্যোৎস্না তার অকৃপণ দানে আমার বিছানা ছেয়ে দিয়েছে। জানালাটার সামনে যে বেল-ফুলের গাছ তাতে ফুটে রয়েছে একরাশ বেলফুল, চাঁদের আলোয় তারা যেন মিলিয়ে যেতে চায়। কি জানি কেন, অকারণে মনের ভিতরটা হা-হা করে উঠল। মনে হল, জীবনে এমন দিনটি এর আগে আর আমার আসেনি। আজ বাইরে যেমন দুকুল-ছাওয়া জ্যোৎস্না, মনেও আমার তেমনি যেন কিসের জোয়ার এল। উদ্বেলিত মানস-সমুদ্র যেন চঞ্চল হয়ে আছাড়ি-বিছাড়ি করতে লাগল। মনে হল, যে চাপা সমুদ্র এতদিন মনের অতলে ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ সে আজ ঘুম ভেঙে গর্জে উঠেছে।

স্বপ্নজাল ছিন্ন করে ঘরে এল নতুন রাধা। এক হাতে একটি কুশাসন, অন্য হাতে এক গেলাস জল। সযত্নে মাটি নিকিয়ে ঠাঁই করে আমায় বসতে দিলে, প্রদীপ উস্‌কে দিল নীরবে। এতদিন এঁদের সেবা নিতে কেমন যেন কুণ্ঠা বোধ করতুম, আজ বড় ভাল লাগতে লাগল। মনে হল, এরই জন্য বুঝি মন আকুল হয়ে প্রতীক্ষিত ছিল। এ যেন আমার জন্মান্তরের গোপন কামনা, আজ স্বর্গের সুষমায় মণ্ডিত হয়ে অপূর্ব শ্রীসমন্বিত হয়ে উঠেছে।

খেতে বসে শুধালুম, নতুন রাধা! এত যত্ন শিখলে কোথায়? একবার তাকাল আমার দিকে, বলল, আমি যে বাংলার মেয়ে ছিলুম সে কথা কি ভুলতে পারি? বললুম, কিছু যদি মনে না কর তোমার কথা জানতে ইচ্ছে হয়। বলল, আমার আর কি কথা ঠাকুর! সামান্য গাঁয়ের মেয়ে ছিলুম, তার আর শুনবে কি! চেয়ে দেখি, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বললুম, ক্ষমা কর রাধা,

না জেনে ব্যথা দিয়েছি, এতে যদি দুঃখ পাও, নাই বললে। তোমার যেটুকু পরিচয় পেলুম তাইত যথেষ্ট! আজই আমি তাকে প্রথম 'রাধা' সম্বোধন করেছি। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে তাকাল সে আমার দিকে। সেই দৃষ্টির মধ্যে কি যে পড়লুম আমি, আমার সমস্ত সত্তা বিকশিত হয়ে উঠল।

কথায় কথায় দ্বিতীয় প্রহর গড়িয়ে গেছে বুঝতে পারি নি। হঠাৎ শিয়ালেরা ডেকে উঠল। তাড়াতাড়ি থালা ছেড়ে উঠে পড়লুম। গামছাটি এগিয়ে দিয়ে হাতে মসলার রেকাবটি গুঁজে নীরবে সে এঁটো থালাটি নিতে যাচ্ছিল, তার হাতখানি দুই হাতের মধ্যে ধরে বললুম. রাধা! চিরদিন মনে থাকবে, তুমি আমার জন্য পথ চেয়েছিল, আমায় কত যত্ন করেছিলে, এমন আমায় এর আগে কেউ করেনি। ম্লান হেসে বলল, এই আমার স্বর্গ! রাত অনেক হল যে, এবার ঘুমোও! মানুষের হৃদয় দেবার জন্য, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার জন্য সতত উন্মুখ।—এই সত্যটি আজ উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল হঠাৎ। মন যে অলক্ষ্যে বসে চিরদিন তার সেই অনুপমকে খুঁজে মরছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এ কথাটি তো অস্বীকারের উপায় নেই। নিরন্তর সেই চিরন্তনের সন্ধান চলছে মনে মনে, এরই হাহাকারে কি মানুষ ঘুরে মরে দেশে-দেশান্তরে? থেকে থেকে কেবলই মনে পড়ে মহাকবির সেই মনোহর সঙ্গীত:

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে!

শ্রীদামের ডাকাডাকিতে পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেলা বেশ হয়ে গেছে। হঠাৎ-ঘুম ভাঙ্গা চোখে কড়া রোদের আলো আর শ্রীদামের কণ্ঠস্বর দুয়ে মিলে আমার ভোরের স্বপ্ন মাটি করে দিয়ে

গেল। এ যেন কোমল বিছানা থেকে কঠিন মাটিতে কে আমায় আছাড় মেরে ফেলে দিল। সারা ঘরটায় শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম—কি যেন এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলুম, আজ আর তার রেশমাত্র নেই। রাতের কুহকিনী মায়া রাতের সঙ্গেই বুঝি বা শেষ হয়ে গেছে! শুধু নিবন্ত প্রদীপটি তখনও পড়ে আছে এক কোণায় দিনের আলোর অবহেলায়। তাড়াতাড়ি প্রদীপটি তুলে নিলুম দুই হাতে—সযত্নে মুছে দিলুম তার কালি। শ্রীদামঠাকুর পরম কৌতুকে শুধাল, কি ঠাকুর, হল কি? ওকে হঠাৎ অত যত্ন কেন? নাও, বেরিয়ে পড়, এখনও প্রাতঃকৃত্য সার নি! কাল ফিরলে কখন? গিয়েছিলে কোথায়? জবাব দিলুম, গিরিগোবর্ধন-দর্শনে।

—তা বললেই হত, অত লুকোচুরি কেন ভাই! আমরা কি এতই পথের বিঘ্ন?

সসংকোচে জবাব দিলুম, না ভাই শ্রীদাম, তা নয়, তবে যাব ঠিক করে তো বেরুই নি। পথ চলতে দল পেয়ে গেলুম। ভাবলুম, এসেছি যখন বৃন্দাবনে তখন দেখেই যাই।

—তা ঠাকুর বেশ করেছ। এসেছ কতদিন, এখনও কিছু দেখলেই না, রাজী থাক তো বল, আজ মথুরা ঘুরিয়ে আনি। বললুম, মন্দ হয় না ভাই, বসে বসে ভাল লাগছে না।

—তবে তাই চল। যাই একবার রাধাকে বলে আসি। বলে শ্রীদাম চলে গেল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। আমার কালকের চাওয়া-পাওয়ার সাক্ষী নেই তৃতীয়জন। সে শুধু একান্ত আমারই হয়ে রইল মহাকালের অক্ষয় ভাণ্ডারে।

জয় রাধে!—ঘর ছেড়ে উঠোনে পা দিতেই একমুখ হাসি নিয়ে

এগিয়ে এল শ্রীদামের মিতে শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর। পরমানন্দে পা বাড়ালুম আমরা মথুরার পথে।

রাধাকৃষ্ণ জ্ঞানে আধ্যাত্ম মহিমায় এ ব্রজধাম বৈষ্ণবের ধ্যানের ধন। মাঝে মাঝে মনে হয় কৃষ্ণ নামে এরা যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেও তুচ্ছ করেছে—হয়ত এখানেও আছে কত কলহ বিবাদ, মাটীর মানুষের বাসনা কামনা কলুষিত নগ্ন ইতিহাস—কিন্তু নাই বা আমি তা দেখলুম। ভোরের এই সোনার আলোয় যে ঐশ্বর্যে চোখ ভরে উঠেছে, থাক না তাই সঞ্চিত হয়ে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে!

পথে পথে দেখি বেশীর ভাগই বাঙ্গালী বৃদ্ধার ভীড়—হবে নাই বা কেন? এ নব বৃন্দাবন যে বাঙ্গালীরই দান। মহামান্য আক্‌বরের বদান্যতায় অম্বরপতি মানসিংহের অর্থানুকুল্যে শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছায় তাঁরই ভক্তগণ লুপ্তপ্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রজধামকে আবার জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন—

"অজব মুরলীয়াঁ ওয়ালা জী
সখি, সবকো যাদু ছা গয়া
বৃন্দাবনকে কুঞ্জ গলিন মেঁ
মোহন মুরলী বজা গয়া।
চিতচোর মনোহর আয়া থা
প্রেম কী বংশী বজায়া থা
রাধা! রাধা! রাধা! ফুকারে
অজ্‌ব্‌ কহানী শুনা গয়া।
ঘনশ্যাম বহ মুরলী শুনায়ে যা
আপনি মায়াতু য়চায়ে যা
মৈঁ দুখিয়া তুঝে ফুকার রহি
মনমোহন তু কহাঁ গয়া।"

সর্ব্বহারা বৈরাগিনীর এ একান্ত আত্ম-নিবেদন কি সেই পরমতমের পায়ে গিয়ে পৌঁছায় না? ত্রিলোকের কোনও খানে সত্যই যদি সে অন্তর্যামী কোথাও থাকেন, এ আহ্বান যে তাঁকে শুনতেই হবে। কি জানি কেন সেই একান্ত নিবেদনময় প্রভাত লগ্নে আমিও আমার প্রাণের প্রণাম নিবেদন করলুম সেই অনির্বচনীয়ের পায়ে, শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম বাহ্যজ্ঞানশূন্য সেই তপস্বিনীকে মনে মনে!

"জাগো!—জাগো! নন্দকিশোর।"

কুঞ্জদ্বারে বসে তদগত বাউল কার ঘুম ভাঙাচ্ছে? জনহীন এ নিদ্রিত কুঞ্জে কুঞ্জে কিসের কুহেলি আজও জেগে আছে ভক্ত জনের বিশ্বাসে ভক্ত জনের মনে?

হে অতীত! কথা কও! হে নীরব লতাগুল্ম! শোনাও তোমাদের স্মৃতির কাহিনী!

সন্ধ্যার পর দেখেছি এ সব কুঞ্জে কেউ থাকে না....কাউকে নাকি থাকতে নেই। কৃষ্ণরাধা আজও নাকি আসেন এ সব কুঞ্জে কুঞ্জ-বিহারে...তাঁদের সেই নিভৃত আলাপনে মর্ত্ত্যবাসীর স্থান নেই, নেই কোনও অধিকার অহেতুক কৌতুকের। কে নাকি কবে লঙ্ঘন করেছিল এ নিয়ম...গোপনে থেকে গিয়েছিলো কোনও একটি কুঞ্জে, মনের অনমনীয় কৌতূহল চরিতার্থ করতে....তারপর বিস্মিত ভীত ব্রজবাসীরা তাকে সকালে খুঁজে পেয়েছিলো বোবা ও অন্ধ অবস্থায়। এ হল কিংবদন্তী স্থানীয় ব্রজবাসীদের...আমাদের বুদ্ধিজীবি মন অবিশ্বাসে সচকিত হয়ে ওঠে, কিন্তু সাহসও ত হয় না এ নিয়ম লঙ্ঘনের। সকৌতুকে প্রশ্ন করি, এই যে পালে পালে বাঁদর, হনুমান আর ময়ূর-ময়ূরী নিত্য প্রেমানন্দে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে, দিনে রাতে কুঞ্জগুলির মধ্যে এদের ত কিছু হতে দেখি না? এদের কি সব অপরাধ মার্জনীয় সেই প্রেমিক যুগলের কাছে? জবাব পাই, এরা যে তাঁদের লীলাসহচর দাসানুদাস.......এরা কেউ

তর্ক করে না....যুক্তি বোঝে না ; এদের সবই 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' ; তার বাইরে এরা যেতে চায় না।

রাধাকুণ্ডের পাশেই শ্যামদাসবাবাজীর আখড়া। আশাবরীতে তান ধরেছেন শ্রীকণ্ঠ ঠাকুরের গুরুভাই মধুকণ্ঠ চরণদাসবাবাজী তানপুরার সঙ্গতে। আসর জমে উঠেছে.. গানে গানে সে নিবেদন করছে প্রাণের প্রণাম আপন মরমীয়ার স্মরণে। সৌম্য শান্ত শ্যামদাসবাবাজী বসে আছেন তদগত হয়ে। যেন কোন হারিয়ে যাওয়া ঋষির আশ্রমে এসে বসেছি আমি। সভা ধীরে ধীরে জমে উঠছে। একে একে জুটছেন একটি দুটি করে ভক্ত-ভক্তানী।

আত্মহারা হয়ে চেয়ে আছেন এ আশ্রমের সর্বময়ী কর্ত্রী মালতি-দিদি চরণদাসজীর পানে, কিন্তু মন তাঁর অন্যত্র।........ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে দু-চোখ ছাপিয়ে জল........কোন গোপন ব্যথায় কে জানে....এই সদা কর্মব্যস্ত মানুষটিকেও আজ কাজ ভুলিয়ে টেনে এনেছে তাঁর গান। হয়ত বা কোনও বহু দিনের চাপা পড়ে যাওয়া, প্রায়-ভুলে-যাওয়া ব্যথার তারে আজ আবার নতুন করে আঘাত জেগে উঠে তাঁকে ব্যাকুল বিহ্বল করে তুলেছে। পথে পথে যত ফিরি তত দেখি সুখ-দুঃখ বেদনা-ভাবনা বিরহ-মিলনের নিত্য দোলায় দোলায়মান মানুষের মনের অসহায় ছবি। যে কয়দিন এ আশ্রমে এসেছি হাসিটি ছাড়া আর কিছু ত চোখে পড়েনি মালতিদিদির। সেবায়, দয়ায়, হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে তিনি ত সবার আপন। সকলের সেবাই যেন তাঁর কৃষ্ণপূজা। সেই সদাহাস্যময়ী মালতিদিদির বুকেও লুকানো ছিলো এমন ব্যথার হাহাকার!...মনের কান্নার আতুরতা।

কৈশোরে এক কবির কবিতা পড়েছিলুম—

'জান কি বিশ্বভূপ
বাসনার মুখে দিয়েছি আগুন
জ্বালাতে তোমার ধূপ !'

সেদিন সে দুঃখহীন অনভিজ্ঞ জীবনে দুঃখের বিলাস বড় ভাল লাগত—তাই সেদিন সে অপরিণত মনে কথাগুলি বড় মধুর লেগেছিল। কিন্তু আজ বলি তা নয়! সে ত ভুল—সে ত শূন্যের বিলাস মাত্র। আজ তোমার ধূপ জ্বালাতে গিয়েই ত আমার বাসনার উৎস খুলে গেছে, সে যে কুল ছাপিয়ে জগৎ প্লাবিত করতে চায়। তাই ত আজ অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে বলতে পারছি মানুষের সুখ-দুঃখময় অমৃত জীবনই ত তুমি ; এ জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে ভগবান কোথায় ? ....সে যে অনন্ত অন্ধকারে হাতড়ে মরা। জীবনকে যে সহজ স্বীকৃতি দিল না সে ত অপূর্ণ বিকৃত, সে ত তুমিময় নয় প্রভু !

উপবাসী জঠরের জ্বালার চেয়ে উপবাসী হৃদয়ের জ্বালা বড় কম নয়···এ অস্বীকার করা যে হাস্যকর-বাতুলতা। মন তার আপন সহজ মহিমায় মানবীয় পথে সহজ সংস্কারে শাশ্বত দেবতার সন্ধান পাবে—সেই ত পরম সত্য।

"প্রিয়েরে আমার করেছি দেবতা—দেবতারে প্রিয় করি" এত শুধু কবির উচ্ছ্বাস মাত্র নয়···এ যে মানুষের একান্ত আপন অন্তরতম কথাটি....চিরদিনের চিরকালের শাশ্বত বাণী। এ বাণী যে যুগে যুগে কালে কালে চিরন্তনী হয়ে আছে! এই জনারণ্যে জনতার মাঝখানেই ত তুমি ওতপ্রোত হয়ে আছো। কঠোর বৈরাগ্য সাধনে যে মুক্তি সে ত escapist এর মুক্তি, সে ত সোজা পথ নয়, সে ত পলায়নপরতা—বিচিত্রমনা মানুষের মাঝখানে এই যে নিত্য নূতন রহস্য উদ্ঘাটন, এই যে নিত্য নূতন আবিষ্কার···এর কি শেষ আছে ?

এই বৃন্দাবনের পথের ধূলায় আর এক পরশমণির খোঁজ পেয়েছি। সে আমাদের বসন্তদা—মাঝে মধ্যে আসেন। দু চোখ ভরে দেখেছি সবার মন সদাই তাঁর জন্য স্বাগতম্ জানিয়ে রেখেছে। বসন্তদা কারো নয়—বসন্তদা সবার আপন। মাথায় গান্ধীটুপী বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক। হৃদয়ে তাঁর সমুদ্রের উদ্দামতা—সে যেন আনন্দের ঝোড়ো হাওয়া, সব জীর্ণতা সব আবর্জনা মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কোথায় কে কলেরায় মরে, ছুটল বসন্তদা। কোথায় কে মরে পড়ে আছে—দাহ করার লোক জোটে না, জোটে না পয়সা-কড়ি, ছুটল বসন্তদা—চেয়ে চিন্তে কাঁধে করে শেষ গতি করে এল। নাওয়া খাওয়ার তার থাকে না ঠিক-ঠিকানা। যেখানে যা জুটলো খেয়ে নিল গোগ্রাসে—না জুটলো কুছ পরোয়া নেই, ছোলা চিবিয়ে যমুনার জলে পেট ভরালো···আপন ভোলা মস্ত মানুষটা যেন রিক্ত হস্তে ব্রজের রাজা। কলির কৃষ্ণ, এমন মূর্তিমান বাউণ্ডুলেকে কি ভাল না বেসে পারা যায়?

তরুণ কিশোরদের সে জীবন্ত স্বপ্ন—সে আদর্শ। দূরদর্শী সংসার অভিজ্ঞ অভিভাবকদের সে দুঃস্বপ্ন—সে আতঙ্ক। আর নবীনাদের বুঝি বা সে গোপন কামনা!

তরুণদল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ব্রজের পথে পথে। কুচকাওয়াজ চলে—লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, আখড়ায় আখড়ায় কুস্তির মহড়া তারই ইঙ্গিতে। মাতামাতি ঝাঁপাঝাঁপি, বাজি রেখে যমুনায় সাঁতার চলছে···একখানা বলিষ্ঠ জীবন্ত প্রাণ সারা বৃন্দাবনকে প্রাণ-চঞ্চল করে রেখেছে। পথের পাশে কাতরে মরছে কুষ্ঠরোগী—বসে গেল বসন্তদা নিরুদ্বিগ্ন মনে তার পরিচর্যায়।—ও বসন্তদা! কর কি? মরবে নাকি এমনি করে? অট্টহাস্যে জবাব আসে—"আরে! ভয় নেইরে, তোদের বসন্তদাকে যমেও ভয় পায় তা জানিস!"

সত্যই তাই। সে যে সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন্ত পার্শ্বচর, নরদেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে পদে পদে মৃত্যুকে উপহাস করে।

এ হেন বসন্তদা হঠাৎ দারুণ জ্বরে পড়েছে। তীর্থে এসেছিলেন এক বাঙ্গালী মা দিল্লী থেকে। এই আপন ভোলা দুরন্ত শিশু তাঁর নজরে পড়েছিল। বসন্তদার প্রতি অপত্য স্নেহে যত্ন করে রেঁধে খাইয়েছেন। মাতৃহীন বসন্তদাকে ডেকে 'বাছা' বলেছেন। জ্বর শুনে তুলে নিয়ে গেছেন আপন পাণ্ডার আশ্রম-নিবাসে। মাথার কাছে বসে আছেন দিনরাত সে মমতাময়ী মা।

জ্বরের ঘোরে বসন্তদা বলে—মা-মাগো! তোমার মত আমার মাও যদি বেঁচে থাকতেন, আমার জীবনটা বুঝি এমন ছন্নছাড়া হত না। হায়রে দুর্বল মানুষ—কখন কোন মুহূর্তে হৃদয়ের কোন গোপন কপাট কার কাছে খুলে যায় সে কে জানে! শৈশবে মাতৃহারা এই দুর্দ্দান্ত মানুষটা আজ পরের মায়ের স্নেহ পেয়ে চিরশিশু হয়ে গেছে। তার বুভুক্ষিত তৃষিত হৃদয় মরুতে জলের মত শুষে নিচ্ছে মাতৃস্নেহসুধা। পাতানো মায়ের চোখে জল ঝরে পড়ে—আহা বাছারে! মা নেই, তাইত এমন ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছো, চল, বাবা আমার সঙ্গে, মা বেটায় থাকব।

পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলান—শিশুর মতই পরিতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে বসন্তদা।

বাল্যে মাতৃহীন বসন্তদা বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে মেতে ওঠে। পুলিশের লাঠি খায়, জেল খাটে—লেখা-পড়া ঘুচে যায়। ছিটকে পড়ে সহজ সরল জীবনের পথ থেকে জটিল দুঃখাবর্তের মাঝখানে। আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে যায়—দূরে চলে যায় জন্মভূমি। 'আমার মাঝারে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ'। বাংলায় প্রবেশ তার নিষেধ হয়ে যায়। আজ পুলিশের হুকুমে বন্দী এই বৃন্দাবনের

সীমানায়। এখান থেকে বিনা অনুমতিতে সে নড়তে পারে না। কোথাও যাবার তার হুকুম নেই।

সারা অঙ্গে তার চিহ্ন আছে কারাবাসের নির্দয় লাঞ্ছনার। পরিবর্তে সে কি পেয়েছে ?

কি পাবে ?

কিছুকে যে গ্রাহ্য করেনি কোনও দিন—এ হেন নির্ভীকমনা বসন্তদা আজ এক দুর্বল মুহূর্তে কবে হারিয়ে যাওয়া মাকে স্বপ্ন দেখছে—মা—মাগো।

শ্যামদাসবাবাজীর আখড়ায় এসে জুটলো আজ বসন্তদা—চরণদাসঠাকুর যে তীর্থযাত্রা করবে, চলে যাবে এ ব্রজধাম ছেড়ে না জানি কতদিনের জন্য—সেকি না এসে পারে। সদলবলে চললুম আমরা মথুরার পথে—কিন্তু মথুরা আর বৃন্দাবন যেন স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান। বড় বড় ধর্মশালা, অগণিত মন্দির, বিরাট বিশ্রামঘাট—ঘাটে ঘাটে সংখ্যাহীন কচ্ছপ নিয়ে মথুরা বৃন্দাবনের তুলনায় পার্থিব ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়ী, কিন্তু সে প্রাণ কই ?

বৃন্দাবন যে মানস ঐশ্বর্য্যে ভরপুর—আপন ভাবে মাতোয়ারা, এর অলিতে গলিতে অপার রহস্য, কুঞ্জে কুঞ্জে অনন্ত কুহক !

আর পাঁচটা তীর্থস্থানেরই মত মথুরায় পাণ্ডা ঠাকুরেরা খুলেছেন ধর্মের বেসাতী, আছে পাঁচ সেরি, সাত সেরি মিষ্টান্নভোজী চোবেজীরা, অর্থলোলুপ পূজারী ব্রাহ্মণ আর হনুমানের উৎপাত।

বৃন্দাবনের পথে পথে কেকাধ্বনি—দেখা যায় তাদের রূপময় অঙ্গের সৌরবময় নৃত্য ! নৃত্য পাগল পুরুষপাখী নেচে নেচে প্রিয়ার মন তোষণ করার প্রয়াস পায়। অকারণই মনে জাগে বহু কাহিনী কিংবদন্তীময় প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মথুরা নগরীর ইতিহাস। এ নগরী বৌদ্ধ যুগে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। মৃত্তিকা খননে সে দিনের সব ভগ্নাবশেষ বহন করেছে তার স্মৃতি।

মথুরার প্রসিদ্ধ কেশব মন্দির প্রস্তুত হয়েছিলো পুরাতন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের ওপর—সে মন্দির ভেঙ্গে প্রস্তুত করান রক্ত প্রস্তরের মসজিদ আওরংজীব—ধ্বংস-সৃষ্টির এই কালচক্রে মন বিহ্বল হয়।

কৃষ্ণ জন্ম-ধন্য অতি প্রাচীন এ নগরী যমুনার পশ্চিমে—আগ্রা থেকে এর দূরত্ব ৩৬ মাইল, ৯০ মাইল দিল্লি থেকে। ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা পাই—মৌর্য্যযুগে এ নগরী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। বারবার বহিরাগত শত্রুর অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে এ নগরী।

এ বিশ্বনগরী একে একে গ্রীক পারথিয়ান্ শক ও কুশানদের সভ্যতা সংস্কৃতির দানে পুষ্টি লাভ করেছে—বিভিন্ন জাতির জীবনধারা, ভাবধারা এর জীবন প্রবাহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কুশানরাজ কনিষ্কের আমলে এর গৌরব গরিমা বুঝিবা সর্বোচ্চ শিখরে। প্রথম দুই শতাব্দী মথুরাকে দক্ষিণের রাজধানী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই সময়কে মথুরা ভাস্কর্য্যের স্বর্ণ যুগ বলা যায়। উত্তর ভারতের মৃৎশিল্প ও মূর্ত্তিশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এ নগরী। কুশান রাজাদের আমলে—সাঁচি সারনাথ শ্রাবস্তি কুশিনগর প্রভৃতি স্থানে এই মথুরা থেকে বহু ভাস্কর্য্য শিল্প নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুশান রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। এ নগরে জৈন, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের একদা বিশেষ সমাদর হয়েছিলো। মথুরা শিল্পের বুদ্ধ মূর্তিগুলি শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন। ইহা গান্ধার-শিল্প নামেও প্রসিদ্ধ। কনিষ্কের রাজধানী যদিও পুরুষপুর বা পেশোয়ারে ছিল, তথাপি মথুরা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাজপরিবারের মূর্তির যে সকল অপূর্ব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলি তার জাজ্বল্য প্রমাণ। একমাত্র কনিষ্কের যে প্রমাণ মূর্তি মথুরায় আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও তার মস্তকটি আজও পাওয়া যায়নি,

তথাপি এই ভগ্ন মূর্তিটিই সে দিনের ভাস্কর্য্যের অত্যুচ্চ গৌরব বহনে তুলনাহীন। এই একটি মূর্তিই মথুরা-শিল্পকে চিরজয়ী করে রাখতে সক্ষম—শিল্পীর দক্ষতায় এর প্রতিটি অঙ্গ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কনিষ্কদের পর গুপ্তরাজাদের অধীনেও মথুরা তার ঐতিহ্য সম ভাবেই বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন যশোদত্ত কৃত বুদ্ধের এক অভিনব দণ্ডায়মান মূর্তি। মধ্যযুগ থেকে মথুরার সংস্কৃতি পতনোন্মুখ হতে আরম্ভ হয়—ক্রমে ক্রমে অবনতির নিম্নপ্রান্তে নেমে এসে এ শিল্প একান্তই স্থূল হয়ে দাঁড়ায়। আজকের মথুরায় আর কোনও গত গরিমা নেই। বহু জাতির সভ্যতায় পুষ্ট সে মথুরা আজ একেবারেই অবলুপ্ত।

এর কারণও বারবার ঘটেছে। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ গজনি নির্মম হস্তে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন এ নগর, আবার সে আঘাত থেকে কিছুটা মুক্ত হতে না হতেই ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদী দেবস্থান ও মন্দির মঠগুলি এমন ভাবে ধ্বংস করেন যে সেগুলি আর কোনও দিনই সংস্কার-সাধ্য হয়নি। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মহান আকবরের অধীনে এ ব্রজমণ্ডল আবার শ্রীময়ী হয়ে ওঠে।

অসংখ্য ঘাট এ নগরে—পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি বিশ্রামঘাটের দিকে—হিন্দুতীর্থ মাত্রেই পাণ্ডার রাজত্ব, তাদের উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠতে হয় যাত্রীকে—আবার নানা থাকা-খাওয়ার সুবিধাও তারা করে দেয় যজমানকে। এই পাণ্ডাকুলকে আমরা যতই গালাগাল দি না কেন, একটি বিশেষ বিষয়ে শত্রুকেও মুক্ত কণ্ঠে এদের প্রশংসা করতে হবে—সে এদের নামধাম রাখার খাতাগুলি। এর কাছে বুঝি চিত্রগুপ্তও হার মানে। শুধু একবার উচ্চারণ করুন আপনার পূর্বপুরুষের নাম—তারও প্রয়োজন হয় না—শুধু মাত্র গোত্র সম্বল করেই এঁরা মুহূর্তে পরিচয়-অর্ণব পারে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে সক্ষম—দেখে মনে হয় এ কি মায়া না যাদুবিদ্যা! বংশপরিচয়

দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে আপনাদের পাণ্ডা সে আপনার পূর্ব্বগামীদের হস্তাক্ষর সমন্বিত খাতা আপনার বিহ্বল দৃষ্টির সামনে তুলে ধরবে। হ'ক না বহুদিন আগের ঘটনা, হয়ত তিনি এসেছিলেন বিশ ত্রিশ বছর আগে—কি আসে যায় তাতে!

সঙ্গে সঙ্গে ভিজে উঠবে আপনার মন—আলোড়ন উঠবে নানা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির—মনে জেগে উঠবে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া হয় ত কোনও একান্ত প্রিয়জন!—নধরকান্তি বিশালবপু এক পাণ্ডাঠাকুর এগিয়ে এলেন—গলে তুলসী মালা, কপালে তিলক। মিষ্ট ভাষে পরিচয় দিলেন,—আমরা হলুম মথুরার শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা কানে লাড়ু সাড়ে সাত ভাই!—একটু অবাক হলুম বৈ কি—ভারতের তীর্থে তীর্থে কত পাণ্ডাই ত দেখলুম কিন্তু এমনটি তো কোনও দিন শুনিনি! সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বাউল বৈরাগীদের নানা সম্প্রদায়ের কথা শুনেছি ও দেখেছি, যেখানেই মানুষ সেইখানেই দলাদলি—এ থেকে ধর্ম্মের পথও মুক্তি পায়নি—এমন কি সময় সময় মনে হয়, এত সম্প্রদায় এত দলাদলি বুঝি গৃহস্থের মধ্যেও নেই—কিন্তু এ আবার কেমন পরিচয়? হাবে ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন ওঁরা হলেন পাণ্ডাকুলে কুলীন। অদম্য কৌতুক থামাতে না পেরে শুধাই—পাণ্ডাঠাকুর সে আবার কেমন? সাড়ে সাত মানে কি?

হো হো করে হেসে উঠলেন পাণ্ডাঠাকুর—এমন মূর্খ এমন অর্বাচীন বুঝি কখনও দেখেনি—হেলায় হেসে বললেন—জানো না? আমাদের এক ভাই যে বিয়ে করেন নি—পুত্র-কলত্র না হলে কি মানুষ পূর্ণ হয়—তবে আর শাস্ত্রে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলেছেন কেন ইস্ত্রীকে? তা ত বটে—এই অতি সাধারণ তত্ত্বটুকুও যার অজানা সে মূর্খ ছাড়া আর কি? কানে লাড়ুর অর্থ জানার আর সাহস হল না; কে জানে আবার কি বোকামি করে বসি—নিঃশব্দে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়াই ভাল।

অপরাহ্ণের কোলে বিশ্রামঘাটে এসে দাঁড়ালুম। সূর্যাস্তের অস্তরাগে দিগন্তে রংয়ের ছটা জেগে উঠেছে—রক্তিম এ আকাশ মনকে টেনে নিয়ে যায় দূরে সেই ভাবরাজ্যের মধ্যে যার তীরে রাধাকৃষ্ণের চির মধুমিলন। এমনি এক মোহ-মদির লগ্নে কি বর্ষাণের মেয়ে গোকুলের রাখালকে প্রথম দেখেছিলেন ? তাঁদের সে শুভ-দৃষ্টিতে বুঝি এমনি রক্তরাগ চিরন্তন হয়ে আছে।

হঠাৎ স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন করে শ্রীকণ্ঠের কঠিন কণ্ঠ জেগে উঠলো—নাও নাও ঠাকুর! দুটো ডুব দিয়ে নাও, বেলা যে গড়িয়ে এল—কিন্তু ঘাটের কিনারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে মন যে শিরশির করে ওঠে! শুধু কচ্ছপ আর কচ্ছপ, এ তমিস্রার রাজত্বে কোথায় ডুব দেব ? মনে পড়ে যায় সেই করাচির উষ্ণ প্রস্রবণের কথা—"মগর" অর্থাৎ কুমীর তার আবার পীর অর্থাৎ গুরু বা অবতার। কূর্ম অবতার পর্য্যন্তই আমরা এগিয়েছি—ওঁরা আবার আর এক কাঠি—মঙ্গা পীর বা কুমীরাবতার। সে এক অদ্ভুত স্থানই বটে, সামান্য একটা পুকুরের মত জায়গায় কি অসংখ্য কুমীর ঘাড়ে পিঠে হয়ে স্থাণুর মত পড়ে আছে—দেখে ভুল হয়ে যায় এরা জীবিত কি মৃত, কি বিসদৃশ অদ্ভুত সে দৃশ্য!

কচ্ছপের ভীড় ঠেলে তারই মধ্যে একটা জায়গা করে বৈষ্ণব-ঠাকুরের একান্ত আগ্রহে স্নান সেরে ঘাটে এসে দেখি এক ভক্তিমতী ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছেন—ব্রাহ্মণ ত নয় যেন বক রাক্ষস! প্রতি মুহূর্তে একটা অঘটন প্রত্যাশা করছি, এমন সময় অট্টহাস্যে চমক ভেঙ্গে দেখি শ্রীদামঠাকুর হেসে লুটোপুটি ; সকৌতুকে বললে, শুধু একবার উচ্চারণ কর কত সেরি, এনে হাজির করে দেব—ত্রস্তে বললুম, না ভাই! এতেই আমার যথেষ্ট হয়েছে।

ঘাটে কোথাও নামগান, কোথাও তিলক-চর্চ্চা—নানা জন আপন আপন চিন্তামগ্ন। এক জায়গায় মেয়েদের বড় ভীড় হয়েছে

একটি পাথরের স্তম্ভ ঘিরে—সেটি নাকি সতী-বুরুজ। কংসমহিষীরা বৈধব্যজ্বালা জুড়োতে এখানে নাকি আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—কেউ বলে রাজা বিহারীমলের কোনও মহিষী এখানে সতী হন—সত্য মিথ্যার সাক্ষী শুধু মহাকাল, আমরা দর্শক মাত্র। সন্ধ্যার প্রারম্ভে এখনি আরম্ভ হবে যমুনার আরতি। দূর দূরান্তর থেকে ভক্ত জন দেখতে আসেন এ আরতি। সুনীল আকাশের নীচে যমুনা কিনারের এ আরতি মানুষের মনে স্বপ্ন বাস্তবের এক মায়াজাল বিস্তার করে—জনতা স্তব্ধ হয়ে দর্শন করে যমুনার এ আরতি!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি ষ্টেশনের পথে। চরণদাস ঠাকুরের যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে....পথে চলতে ব্যাকুল হয়ে উঠলো শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর। হঠাৎ চরণদাসের দুহাত ধরে বলে উঠলো—যাবে একদিন, সে ত জানি ভাই! কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? কি পাবে তীর্থের পথে? আজকের মত চল আখড়ায় ফিরে যাই! তার স্পর্শ-কাতর মনে আঘাত দিতে চায় না চরণদাস—তবু যেতে হয়। ট্রেনের কামরায় উঠে বসেছে চরণদাস পথের সামান্য ঝোলাঝুলি নিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে শ্রীকণ্ঠঠাকুর, মুখে হাসি চোখে জল। বিদায় যে প্রিয়-জনকে হাসিমুখেই দিতে হয় নইলে যে অকল্যাণ আসে!

আজ শুক্লা-একাদশীর চন্দ্রকলা বিশ্বভুবনে মায়ার আবরণ ছড়িয়ে দিয়েছে। গুণ গুণ গুঞ্জন তুলেছেন শ্রীকণ্ঠঠাকুর। শ্রীকণ্ঠের সুকণ্ঠ বটে! হঠাৎ এ স্তব্ধ সন্ধ্যার মৌনমূর্চ্ছা ভেঙ্গে তার কণ্ঠঝঙ্কার অনুরণিত হয়ে উঠল—

"আজ পিয়াল ডালে—বাঁধ বাঁধ ঝুলনা
পর ঘন নীল শাড়ী—মেঘ রং ওড়না
শ্রান্ত মেঘে আজ বেদনা ঘনায়
কত কি বলিতে চায় মনের কথায়

শুধু আমার মনের কথা……বলা ত হল না
তাই মনের গহনে দোলে বিরহ-মিলন দোলনা।

কোন নীলবসনা সুন্দরীকে কি কথা বলতে চেয়েছিল শ্রীকণ্ঠঠাকুর সে কথা সেই জানে⋯তবে সঙ্গীতের এই আত্মহারা আত্মনিবেদন মনকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মনে মনে ভাবি, এ কথা কি সত্য ?⋯ সত্যই কি বিরহ-মিলনের নিত্যদোলায় সদাই দুলছে মানুষেব মন।

"দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। সত্যই কি মিলনের পরম লগ্নটিতে বিশ্বের প্রেমিক-যুগল বিরহ বাসনায় কেঁদে আকুল হয়েছিলেন ?

বিরহ কি তবে মৃত্যুজয়ী ?

মিলন মানেই ত সমাপ্তি। পূর্ণতা মানেই ত শেষ। বিরহ সে ত অনন্ত সমুদ্রের চিরন্তন ঢেউ, তার শেষ নেই, নেই কোনও সীমা। বিশ্বের বিরহী জন তাই কি চির অশান্ত চির বিধুর ?

ঘনায়মান সন্ধ্যায় ব্রজের ধুলি উড়িয়ে এগিয়ে চলি⋯কলকাকলি মুখরিত চরাচর স্তব্ধ হয়ে আসে দিন রাত্রির এই মিলন মুহূর্তটিতে। কুঞ্জে কুঞ্জে মঠে মন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়—শোনা যায় কীর্ত্তনের মনোহরণ সুর।

রাধিকার বিরহ কি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে বৃন্দাবনের অণু-পরমাণুতে ?

এ মাটি তাই বৈষ্ণবের জয়তিলক, ব্রজধাম তাই বৈষ্ণব জনের ধ্যানের ধন।

বৃন্দাবনের অলিতে গলিতে কত মঠ, কত মন্দির, কত ধর্ম্মশালা। কোনটি ছোট কোনটি বড়, ভাবনা কিন্তু সেই একই। এ বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস একই তারে বাঁধা। বিশ্বাসেই বৈষ্ণবের বীজ-মন্ত্র, ভক্তিতেই তার মুক্তি। এঁরা ত বুদ্ধির পূজারী নন, এঁরা যে হৃদয়ের পূজারী—হ্লাদিনী রাধাই এঁদের ইষ্ট দেবী !

ফিরতি পথে পথ চলা কি শেষ হয় না? মন যেন আজ সবার অলক্ষ্যে ঘরে ফেরাব জন্যে আকুলিবিকুলি করে উঠল—

"দোসর আমার দোসর ওগো কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।"

মন ঘুরে ফিরে কেবলই গুঞ্জন তুলতে লাগল, ওরে, সে যে তোর জন্য পথ চেয়ে আছে। এ যে কি মধুর—এ যে কি অভাবনীয় বলতে পারি না! জীবনের অনেক দিন কেটে গেছে কিন্তু ঘরে ফেরার এমন বেদনা-বিধূর আহ্বান তো কখনও আসেনি! একি আমারই মনের কল্পনা-বিলাস ভাব-রচনা? —না, কোনও অরূপের যাদুকরী মায়া? কিন্তু কই? আজ ত কারো সজল চোখের চাহনি দেখতে পেলুম না ঘরে ফিরে? চঞ্চল মন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কাকে খুঁজে মরতে লাগল সেই জানে, আনমনে নিজের ঘরে এসে বসলুম। ঘরে ফেরার হাওয়া বইছে ভুবনে। রূঢ় দিনের পরিশ্রমের পর বহু বাঞ্ছিত এ মূহূর্তটি। মন উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ফিরছে, কখন সে আসে! কিন্তু হায়! ব্যর্থ এ পদধ্বনির মরীচিকায় হৃদয় উতলা হয়, কবির সুরে গাইতে ইচ্ছে হয়, "এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

কিন্তু কোথায় ভাদর? এ যে আমার অজানিকার আশায় ব্যর্থ সন্ধ্যার সাধনা!

খোলা জানালাটা দিয়ে চেয়ে থাকি দূরের পানে—জীবনের স্বপ্ন যেখানে হাতছানি দেয়।

কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে সন্ধ্যা-আরতি শেষ হয়ে গেছে কিছু জানি না—মাটির প্রদীপটি কে কখন জ্বেলে দিয়ে গেছে, হয়তো নতুন রাধাই। মন ধিক্কার দিয়ে উঠল, ওরে মূর্খ, সে এসেছিল, আর বৃথা ঘুমে তুই তোর এ মহা মুহূর্ত্তটি নষ্ট করে দিলি! আবার ক্ষুব্ধ মনে অভিমান জাগল, সে আমার কে যে আমার জন্য তার এত দরদ!

না ডেকে চলে গিয়ে সে ভালই করেছে। সন্ধ্যাদীপ জ্বালা, দেবতার উপাসনা—এ ওদের নিত্যকর্ম। এর মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। আমি অতিথি, তাই আমার সেবা-যত্নও ওদের করণীয়, তার অধিক কিছু নয়। মন বিষিয়ে উঠল অকারণে। কিন্তু কেন? তারও তো কোনও সদুত্তর পাইনে। কাল চলে যাব ভোর হবার আগেই, ত্যাগ করব এ আশ্রম। ঢের হয়েছে, আর নয়।

শ্রীদাম ঠাকুরের ডাকাডাকিতে তিক্ত হয়ে বললুম, যাও ঠাকুর; আমার আজ শরীরটা ভাল নেই, আমি কিছু খাব না। একটু বিশ্রাম করতে পেলেই খুশী হব।

বল কি বন্ধু! এইটুকুতেই এত! মায়ের কোল ছেড়ে সংসারে পা বাড়ালে কেন গোঁসাই? নাও, এখন উঠে পড় দেখি।

বললুম, না শ্রীদাম, তুমি যাও। আজ আমার শরীর সত্যই ভাল নেই। হয়ত বা বলার ভঙ্গি রূঢ় হয়েছিল, অবাক চোখে চেয়ে শ্রীদাম ঠাকুর আস্তে আস্তে চলে গেল। বাইরে দূরে শুনলুম বলতে বলতে চলেছে, রাধে রাধে!

মনে কষ্ট হল, লজ্জা পেলুম নিজের এমন অভদ্র আচরণে। আমি ওর কে? তবু ওর যে ব্যবহার, যে যত্ন আমি প্রতি দিন পেয়েছি তা দুর্লভ। এমন হাসি-খুসী রসিক মানুষ সংসারে সত্যই বিরল। বিদেশে অপরিচিত পরিবেশে যাদের ওপর নির্ভর করা চলে, ওরা সেই দলেরই মানুষ। অভিমান-ক্ষুব্ধ মনে ঘুমের হাতে আত্মসমর্পণ করলুম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ কার অভাবনীয় কোমল করস্পর্শ কপালে অনুভব করলুম। চোখ মেলে দেখি এ যে নতুন রাধা! নিঃশব্দে চোখ বুঁজে পড়ে রইলুম। হয়তো সে শ্রীদামের কাছে আমার অসুস্থতার কথা শুনে দেখতে এসেছে—এ যে আমার আশাতীত। কি গভীর মমতায় সে আমার কপাল স্পর্শ করল, সযত্নে গায়ে একটি চাদর দিয়ে মাথার কাছের জানালাটি

ভেজিয়ে যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে চলে গেল। নিশ্বাস রোধ করে পড়ে রইলুম, পাছে সে টের পায় আমি জেগে আছি। সমস্ত মান-অভিমান শ্রান্তি ক্লান্ত কোথায় যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। প্রসন্ন মন বার বার উচ্চারণ করল :

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়,
তার বক্ষে বেদনা অপার।

নিঃশব্দে সে এল, নীরবে চলে গেল। তার জগতে এক অন্তর্যামী ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানল না। কিন্তু তার এই সামান্য দান আর এক জনের মনে যে অসামান্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, তার পৃথিবীর রূপ গেল বদলে, এ খবর তো কেউ রাখল না।

দিনের পর দিন যায়। শ্রীদামের সে হাসিখুশী মুখ আর দেখি না, কেমন যেন বিষণ্ণ ম্লান। শুধালে হেসে চলে যায়, কোনও জবাব দেয় না। কোথায় যেন ওর এক গোপন কাঁটা ফুটে রয়েছে। যন্ত্রচালিতের মত সব কাজই করে যাচ্ছে, কিন্তু তার সেই প্রাণপ্রবাহ কোথায় বাধা পেয়েছে। নিত্য কত অতিথি-অভ্যাগত ভিখারী-আতুরের যাতায়াত এ আশ্রমে। আশ্রমবাসিনীদের ও শ্রীদামের পরিশ্রমের অন্ত নেই, কলের মত এরা মিলেমিশে কাজ করে যায়। এদের এই কর্মব্যস্ততার মাঝখানে কুঁড়ের মত বসে বসে অন্ন ধ্বংসাতে মন চাইল না। কাজের অংশীদার হতে চাইলুম।

তুমি এই মালঞ্চের নব মালাকার—বলে শ্রীদাম ঠাকুর হাসতে লাগল। কিন্তু কেমন যেন আন্তরিকতাশূন্য সে হাসি ; শ্রুতিকটু শোনাল। নতুন রাধা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল নীরবে। সেই দিন থেকে আমিও বহাল হয়ে গেলুম কাজে। বাগানের মাটি কোপাই, কুয়ো থেকে জল তুলে ঢালি, সকাল-সন্ধ্যায় ফুল তুলতে সাহায্য

করি। সামান্য যা লাউটা শশাটা হয তুলে দিই। এক রকম আনন্দেই দিন কেটে চলে। আশ্রমের সবাইকে মাঝে মাঝে দেখি, দেখি না শুধু ললিতাদিকে। তিনি যে কোথায় থাকেন, কি করেন, কিছুই তাব জানি না। সেই প্রথম দিন তাঁকে দেখেছি কীর্তন করতে, মাঝে দেখেছিলুম আর একদিন নাটমন্দিরে। সেদিনও একটা কি উৎসব ছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আনমনে আপন ঘরের জানলাটার সামনে বসেছিলুম। খোলা জানলাটা দিয়ে বাগানের এক অংশ দেখা যায়। আকাশে সজল ঘনঘটা। অসময়ে সূর্যদেবকে ঢেকে দিয়ে সন্ধ্যাকে ডেকে এনেছে কিসের নিমন্ত্রণে, তা রহস্যময়ী প্রকৃতিই জানে। ঝড়ো হাওয়ায় দুলছে আশপাশের গাছপালা—কেমন এক সাঁই সাঁই শব্দ বিষণ্ণ করে তুলছে মন। তাকিয়ে দেখি, বাগানে রাধা। হাওয়ায় বসন উড়ছে, পিঠ-ছাওয়া চুল বিস্রস্ত। নতুন রাধা বড় একটা ফুল তোলে না, এ কাজটি করে আশ্রমের অন্য দুটি মেয়ে। আজ কি জানি, এমন অসময়ে তার ফুলের বিশেষ প্রয়োজন বুঝি, তাই সে নিজেই এসেছে সাজি নিয়ে। আমায় দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল। কাছে গিয়ে হাসিমুখে বললুম, "সন্ধ্যেবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ ওগো খেলার সাথী ?" চোখে কৌতুক-চ্ছটা ফুটিয়ে নতুন রাধা জবাব দিল, "হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ, রঙিন শিখার বাতি ?" আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, রাধা, এ তুমি কোথায় শিখলে ?

—কেন গো ? ঠাকুর-কবি কি তোমাদের একার ?

বললুম, তা নয়, তবে একটু অবাক হয়েছি বইকি। বৃন্দাবনের রাধার মুখে এ ঠিক প্রত্যাশা করি নি।

—তা সত্যই বলেছ ভাই, তবে কিনা ওই ঠাকুর-কবিই যে আমাদের গুরুর গুরু।

—কি রকম ?

—আমাদের বড় গোঁসাই দেবতার মত মানতেন যে ওঁকে। আজও যে তাঁর ঘরে ওঁর ছবি, ওঁর বই ভরা আছে।

—তাই নাকি ? আমায় দেখাবে রাধা ?

—সে ঘরে যে এখন ললিতাদিদি থাকেন, সেখানে যে যার-তার প্রবেশ নিষেধ।

কথাটায় হঠাৎ বড় আঘাত লাগল ; সত্যই তো আমি একজন বাইরের আগন্তুক ছাড়া আর কি ! এসেছি হাওয়ায় ভেসে, আবার উড়োপাতা উড়ে যাব। আমার নীরবতায় নতুন রাধার চমক ভাঙ্গল। হয়তো চেষ্টা সত্ত্বেও মুখে আমার মনের কথার ছায়া ফুটে উঠেছিল, তাই সে তাড়াতাড়ি বলল, কিছু মনে ক'রো না বন্ধু। কথায় কথায় বলে ফেলেছি। চল, আজই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। আজ সে ঘরে সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হবে কিনা—আজ যে বাইশে শ্রাবণ। বড় গোঁসাই বলতেন—জানিস রাধা, পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ, এই দুটি দিনে মহাকালও ক্ষণকাল স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে থামেন। ওরে, এত বড় বৈষ্ণব, এত বড় মানব-দরদী আর জন্মায় নি রে—উনি যে নরদেহে সাক্ষাৎ ভগবান !

বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে শুধালুম, রাধা, তোমাদের এই বড় গোঁসাই আর ললিতাদির কথা বড় জানতে ইচ্ছে হয়। এ কৌতুক আমার ক্ষমা কর।

—বলব ভাই, বলব, সবই বলব। বড় ঝড় এল যে ভাই, চল, তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে যাই। সে ঘর সাজানোর ভার যে আজ আমার।

রাধার পিছু-পিছু ঠাকুর-দালান পেরিয়ে মন্দিরের পূবে একখানি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। হঠাৎ এ ঘরটি চোখে পড়ে না, একটু যেন আত্মগোপনের ভাব ঘরখানির। দরজার

এক পাশে নমিতা ও মুক্তাধারা বসে বসে মালা গাঁথছে। রাধা তার ফুলের সাজিটি তাদের কাছে ধরে দিয়ে বললে, তোরা একটু হাত চালা বোন, আমি একটু ঘরটা গুছিয়ে আসি। আমার পানে চেয়ে বললে, এস গো ঠাকুর। ঘরে ঢুকেই রাধা ভক্তিনম্র প্রণতি নিবেদন করল সামনের দিকে চেয়ে। তাকিয়ে দেখলুম, কবিগুরুর দণ্ডায়মান সৌম্যমূর্তি। ঘরখানার চারিধারে কোথাও ঐশ্বর্যের কোনও চিহ্ন নেই, এমন কি নেই চিরা-চরিত দেবদেবীর মূর্তির বাহুল্য। সারা ঘরখানিতে একটি মার্জিত রুচির পরিচয় ওতপ্রোত হয়ে মিলিয়ে রয়েছে। পূবের জানালার এক পাশে মৃগচর্ম ও তার সামনে একটি কোশাকুশি, ক্ষুদ্র একটি জলকলস। তারই সামনের কুলুঙ্গিতে সামান্য কিছু পুস্তক ও মালা ইত্যাদি। বোঝা গেল, এইটিই এ ঘরে জপাসন বা পুজার স্থান। অন্য প্রান্তে এক কোণায় সামান্য একটি শতরঞ্জি জড়ানো ছোট একটি বিছানার মত, ওইটিই বোধ হয় সময়কালে শয্যারূপে ব্যবহার হয়। ঘরটির আর এক পাশে মাঝ বরাবর একটি ব্যাঘ্রচর্মের চারপাশে কয়েকটি পুস্তকের ছড়াছড়ি। কেউ যে কিছুক্ষণ আগেও সেখানে পাঠরত ছিলেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুগ্ধ মনে চারিধার দেখছি—এমন সময় নতুন রাধা বলল, এস ঠাকুর, আমাদের বড় গোসাঁইয়ের পুঁথিশালা দেখাই। ঘরখানির মন্দিরের দিকের যে দেয়ালটি তাতে কোনও দরজা জানালা নেই—এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি যে, সেটা একটা গেরুয়াবস্ত্রে আচ্ছাদিত। সেই পর্দাটি সরিয়ে দিতেই বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখি, একটি সুরুচিসম্পন্ন নাতিবৃহৎ পুঁথিশালা। মন্ত্রমুগ্ধের মত কাছে গিয়ে দাঁড়াই। প্রতিটি বই কে যেন সযত্নে বাছাই করে রেখেছে। এ দুর্লভ রত্ন যে এমন অস্থানে কোনও দিন খুঁজে পাব এ আশাতীত। বিস্মিতকণ্ঠে বললুম, নতুন রাধা, এ দুর্লভ রত্নের অংশীদার কি মাঝে মাঝে হতে পারব ?

রাধা বলল, পারবে, তবে এসব গ্রন্থ ললিতাদি যাকে তাকে দেন না। তিনি বলেন—জহুরী বিনা তো মানিকের আদর হয় না রে, অস্থানে অনাদরই পায়। তবে তোমার কথা আলাদা, তোমায় নিশ্চয়ই দেবেন।

সামান্য সাধারণ কথা একজনে বলে কিন্তু সেই কথাই যে আর একজনের কোথায় গিয়ে বাজে, তা ঠিক অনুমান করা যায় না। আজও আমি যে এদের অন্তরঙ্গ, আপনার জন বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা হয়ে উঠতে পারি নি—এ কথার উল্লেখ আমায় মর্মান্তিক পীড়া দেয়। নতুন রাধার এই সামান্য কথাই আজ আমার বুকের ভিতর গিয়ে বাজল। ক্ষুণ্ণ হয়ে বললুম, থাক্ না রাধা, নাই বা নিলুম এখান থেকে বই যদি এতে ললিতাদির অমত থাকে। চমকে সে লজ্জিত হয়ে আমার পানে তাকিয়ে বলল, তোমার কথায় কথায় বড় অভিমান ভাই, আজও তোমার অনেক দূর। বৈষ্ণব হতে এখনও তোমার অনেক দেরি। বড় গোসাঁই বলতেন—ওরে, আমিকে ভুলতে হবে রে, আমাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, তবেই তো ভগবান কাছে ডাকবেন। ওরে, তৃণাদপি সুনীচেন তরুরিব সহিষ্ণুণাং— সেই তো বৈষ্ণব। মালা-তিলক নিলেই কি বৈষ্ণব হওয়া যায় রে পাগলি, তা হয় না। আহা! কতদিন হয়ে গেল, সে কণ্ঠ আর আমরা শুনতে পাই না, তবু তাঁরই স্মৃতি মনে রেখে আমরা দিন কাটিয়ে চলি।

আমারও ভুল ভাঙল। রাধার সামান্য এই কথা কয়টি আমার মনে অসামান্য হয়ে গাঁথা রইল।

সময়স্রোত বয়ে গিয়ে কখন সূর্য অস্ত গেছে বুঝতে পারি নি। সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠল, আরতির শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। কিছু পরেই ঘরে এলেন ললিতাদি। সবাই সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, নীরবে তাঁকে জানাল সশ্রদ্ধ স্বাগতম্। আমার পানে

তিনি একবার তাকালেন। বোধ হয় আমি নবাগত এ গৃহে, তাই কিংবা আর কিছু জানি না। নতুন রাধা চুপে চুপে কি বললে, তিনি আপন আসনে গিয়ে বসলেন। ধ্যানমৌন শুভ্রশুচি এক সন্ন্যাসিনী, কেমন বার বার কৃষ্ণগতপ্রাণা মীরার কথা মনে পড়তে লাগল—এঁরা যেন একই সুরের, একই সাধনায় আত্মহারা। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত এলেন। ফুলের সৌরভে ধূপধূনার গন্ধে ঘরে যেন কোন সুদূর স্বর্গের আগমন হয়েছে। সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত মুখর হয়ে উঠল—

একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।

সবার নীরব মিনতি ললিতাদিকে গান করতে বাধ্য করল। একতারায় ভুবন-ভোলান সুর বেজে উঠল—

তোমারই অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই
কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ কোথা বিচ্ছেদ নাই।

সে সুরে যেন স্বর্গ-মর্ত এক হয়ে যায়, মৃত্যু-সাগর পার হয়ে মানব-আত্মা মহা-অমৃততীরে গিয়ে পৌঁছায়। মৃত্যুজয়ী সে সঙ্গীত বুঝি বা জরা-মরণকে জয় করে আনে।

দিনের পর দিন যায় প্রায় বছর ঘুরে এল। আবার বর্ষার সমাগমে আকাশ মেঘমেদুর হয়ে উঠলো। কি করি-কি করি ভাবছি, এমন সময় শ্রীদামের নিমন্ত্রণে শ্রীরাধার জন্মস্থান বর্ষাণের পথে পা বাড়ালুম। বর্ষাণ থেকে নন্দগ্রামের পথে পড়ল প্রেম সরোবর—তারও পর সংকেতবট। এই সেই পরম স্থান বিশ্বের প্রেমিক যুগল যেখানে পরস্পরকে দেখে সব ভুলে ব্যাকুল হয়েছিলেন, হয়েছিলেন আত্মহারা।

মন কল্পনা-সায়রে ভেসে চলে—এই কবি কল্পনার দেশে সত্যই

কি এমন একদিন ছিল যখন এর আকাশ বাতাস রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সেই পরমপুরুষের লীলায়! বিশ্ব-সাহিত্যে রাধা অতুলনীয়া,—বৈষ্ণব কথা সে যে অমৃত সমান! এই সংকেতবটের কাছেই এক কুণ্ড আছে নাম তার বিহ্বলকুণ্ড। ব্রজের পথে পথে কত লীলাস্থল, কত নব নব নামের সমারোহ: পাগলাঠাকুর পরিচিতি দিয়েই চলেছে তার সাথের বৃন্দাবনের। নন্দগ্রামের পথে চলতে চলতে আমরা এসে থামলুম পাবন সরোবরের তীরে। প্রিয়সখী বিশাখার পিতার নামোৎসর্গকৃত এ বিরাট কুণ্ডের চারধার বাঁধান। প্রসন্ন মনে ধূলিধূসর পায়ে এরই ঘাটে বসে পড়লুম। পান্নাগলানো গাঢ় সবুজ জল—এ জলকে মলিন করে হাত পা ধুতে ইচ্ছে হল না। এ বুঝি শুধু নয়নানন্দের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে—একে স্পর্শ করলে এর রূপশ্রী শ্রীহীন হয়ে যাবে। আনমনে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ অস্তমান সূর্যকে আচ্ছন্ন করে মেঘের ঘনঘটা জেগে উঠল। দূরে কাছে কেকাধ্বনিতে চারিধার শিহরিত করে নেমে এল বর্ষাধারা। অঝোর ধারায় ধারাবর্ষণে কে যেন চারিধার ধৌত করে দিয়ে গেল। বর্ষণক্লান্ত শান্ত ধরিত্রীর পানে চেয়ে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। মেঘহীন স্বচ্ছ নীলিমায় উঠল পূর্ণ চাঁদ। তারার ঝাঁক নিয়ে সুনীল আকাশ যেন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পান্নাগলানো কম্পমান জলের বুকে নেচে ওঠে তার ছায়া।

সম্বিতহারা আনমনা বসে আছি···মন অলক্ষ্যে ভেবে চলে—কে এই নির্ম্মম কংস মাতুল? মনে পড়ে যায় পুরাণ কথা—বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপুর-দ্বারী জয় বিজয় একদা অন্যমনা। এলেন সেই ফাঁকে কর্ম্মনাশা নারদমুনি। দ্বারীদের অন্যমনস্কতার সুযোগে প্রবেশ করিলেন বিষ্ণুপুরে অলক্ষ্যে। বিঘ্ন হল বিষ্ণুর লক্ষ্মীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে। জয় বিজয়কে মাথা পেতে নিতে হল এ কর্তব্যহানির অপরাধ—জন্ম নিতে হল পৃথিবীতে। আছড়ে পড়ল দুই সেবক

বিষ্ণু পাদ-পদ্মে—বলুন প্রভু, আমাদের অপরাধের মার্জ্জনা কিসে? মুক্তিরই বা পথ কি? বিষ্ণু জানলেন—যদি শত্রু ভাবে জন্ম নাও তবে তিন জন্মে, আর মিত্রভাবে সাত জন্মে তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা পাবে। জয় বিজয় বেছে নিলেন শত্রুভাব—অপরাধের সময় কাল কম শুনে—বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু!

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে তারা পর্য্যায়ক্রমে জন্ম নিল—হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল-কংস রূপে। ভক্ত প্রহ্লাদ রক্ষায় বিষ্ণু হলেন নৃসিংহ অবতার—ধ্বংস হল হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু। রাম অবতারে ধ্বংস হল রাবণ-কুম্ভকর্ণ আর কৃষ্ণ রূপে ধ্বংস করেছিলেন কংস-শিশুপালকে। মার্জ্জনা পেয়েছিল জয় বিজয় কৃত অপরাধের।

অভিনব এ পুরাণ কথায় মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! কংস রাজার কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকীর বিবাহ হয় বাসুদেবের সঙ্গে। মহোৎসবে মেতেছে রাজপুরী। কংস আনন্দমগ্ন। প্রসন্ন হৃদয়ে খুলে দিয়েছেন রাজভাণ্ডার। দানে দাক্ষিণ্যে আনন্দ-সমারোহে চারিদিক মুখরিত। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই নির্ম্মম দৈববাণী উৎসবসভা স্তব্ধ করে দিলো। কে যেন অলক্ষ্যে বললে, হে রাজা কংস, এই দেবকী গর্ভে জন্ম নেবে তোমার হন্তারক—স্নেহ মায়া মমতা দূরে সরে গেল—স্বার্থের উৎপীড়নে কংস দানবে পরিণত হলেন। নবদম্পতি বন্দী হলেন রাজরোষে। একে একে তাদের সাতটি সন্তান বধ করলেন কংস আপন নির্ম্মম হস্তে পাথরে আছড়ে আছড়ে। বিহ্বল মন শুধাতে চায়—হে রাজা! আপন সহোদরার প্রাণপুত্তলীদের বধ করতে তোমার কি প্রাণ কাঁপেনি? স্বার্থ কি এতই বড়? কিন্তু রাজা! ভবিতব্য কি এড়াতে পেরেছিলে? সেই দেবকীর অষ্টম সন্তান কৃষ্ণের হাতেই তোমার প্রাণ দিতে হয়েছিল—এ যে তোমার বিধিলিপি।

নানা অবান্তর চিন্তায় ছেদ টেনে সামনে এসে দাঁড়ালো শ্রীদাম—কি গোঁসাই, তুমি পাগল না ক্ষ্যাপা ? বসে বসে ভিজছো যে বড় ? বলি আমার কবি জয়দেব এলেন ; ওঠ বলছি তাড়াতাড়ি ! —এ স্নেহের তাড়না মাথা পেতে নিয়ে বললুম—দোষ হয়ে গেছে ঠাকুর, ক্ষমা চাইছি। ধর্ম্মশালায় এসে দেখি অতিথিপরায়ণ পাগলাঠাকুর ভোজনের কি আয়োজনই না করেছে। সকৌতুকে শুধালুম—এত সব পেলে কোথায় ঠাকুর ? ক্রুদ্ধ জবাব এল—তোমার মত বসে থাকলে কি আর হত, না আমি তোমার মত নতুন এ গাঁয়ে। এখানের ঘরে ঘরে আমার কত বান্ধব কত বান্ধবী—কেউ কি ছাড়তে চায়, তোমার জন্যই না আসতে হল। বললুম তখন চল আমার সঙ্গে, তা কার কথা কে শোনে—পেটে খেলে পিঠেও সয়, এ গঞ্জনাও তাই বেদনাহীন !

জ্যোৎস্নাস্নাত ঝিল্লিমুখর রাত্রে ভারশূন্য মনে দাওয়ায় এসে বসলুম। দর্দুরকুল আকুল হয়ে ঐক্যতান তুলেছে। স্তব্ধ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অদ্ভুত এ কলরোল নিদ্রার ব্যাঘাত করে··· সহযাত্রী আমার নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রামগ্ন, এ ঐক্যতানে তারও নাসিকা-ধ্বনি যোগ দিয়েছে। ঘুম নেই, শুধু একা আমারই এ ঘুমন্ত পুরীর মাঝখানে !

ভোরের আলো তখনও ভাল করে জাগেনি—আকাশে জ্বল জ্বল করছে শুকতারা ! শ্রীদাম বললেন, চল গোঁসাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। আজ অনেক পথ চলতে হবে। ঘুমন্ত পল্লীর মাঝ দিয়ে পথ হেঁটে চলেছি—শির শির করছে গাছের পাতারা ঠাণ্ডা ভোরের বাতাসে। টুপটাপ করে আশে-পাশে ঝরে পড়ছে দু'একটি শুকনো পাতা। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন কুহেলিকায়।

জনপদ পার হয়ে যেতে চোখে পড়ল কত ময়ুর-ময়ূরী হরিণ-হরিণী। বৃন্দাবনে একে চাষ-আবাদ কম চোখে পড়ে, তার ওপর কৃষকের এত বড় শত্রু বুঝি আর নেই—সোনার ফসলক্ষেতে মনোহরণ রূপ নিয়ে কি সর্ব্বনাশই না করে যায় এই হরিণ-হরিণীর দল। দ্রুত পায়ে পথ কেটে চলেছি—এক জায়গায় দূর থেকে শোনা গেল কেমন যেন কোলাহল। দূরে ঝোপের আড়ালে আড়ালে গাছে গাছে বানরদের ভীড়। মাথার ওপর উড়ন্ত কাকদের ডানা ঝটপটানি, ডাকাডাকি! কিসের উৎকণ্ঠায় এ বন্যেরা ব্যাকুল?

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল শ্রীদামঠাকুর—বানরেরা সহজাত সাবধানতায় পথ ছেড়ে দিল। আহা! এ যে রামদাস। ও ঠাকুর! এ বুঝি আর বাঁচবে না!

জ্ঞানহারার মত ছুটল শ্রীদামঠাকুর কি জানি কোনখানে—ক্ষণপরে দেখি ফিরে এসেছে তার কমণ্ডলুটি জলে ভরে—পরম মমতায় ঢেলে দিচ্ছে সে জল ঐ মৃত্যুপথযাত্রীটির শুষ্ক ওষ্ঠে। সে জল তার কণ্ঠ দিয়ে গলছে বলে মনে হল না, তবু কি মমতা; কি উদ্বেগ শ্রীদামঠাকুরের মুখে ফুটে উঠেছে। বিস্মিত হয়ে গেলুম সামান্য এক হনুমানের জন্য বৈষ্ণব ঠাকুরের এ মমতা, এ দরদ দেখে —তাকে দেখে মনে হতে লাগল সে যেন কত না প্রিয়জনের অন্তিম যাতনার শেষ দর্শক হয়েছে। হনুমানটি একবার চোখ মেলে চাইল—সারা শরীর তার কুঞ্চিত হয়ে উঠল একবার, তারপর সব শেষ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে ঘিরে আছে অন্য বানরেরা চারিধারে।

মৃত্যুর আগমন এমনই এক বেদনাময় উপস্থিতি যা মানুষ পশুপক্ষী সকলকেই ব্যাকুল করে তোলে দেখতে পাই—মৃত্যু সবারই জীবনের শেষ পরিণাম—তবু এই মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার কত না

সাধনা, কত না চেষ্টা। কিন্তু কেন ? অজানার রহস্য কুহকে নিজেকে চির আবৃত করে রেখেছে বলেই না এ এমন !

আজ যদি আমরা জানতে পারতুম কি আছে এই মহা অজানার ওপারে—একি সহজ হয়ে যেত না ? এই বনের বন্যেরা আজ আমায় অভিভূত করে দিয়েছে। একজন মানুষের জন্যও আমরা বোধহয় আজকাল এমন দরদ বোধ করি না—এমন সহানুভূতি দেখাই না।

কিছু পরে শ্রীদামকে বলি, চল ঠাকুর যাই—আর আমরা এখানে করব কি ? বল কি গোঁসাই ! রামদাস—তাকে ফেলে রেখে যাব ? গতি না করে কি যেতে পারি, তা হয় না ঠাকুর ! যমুনা ত ঢের দূর, চলো, গাঁয়ে যাই ; কোদালী না হলে ত সমাধি দিতে পারব না। বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে চললো শ্রীদাম গাঁয়ের দিকে—পিছনে পিছনে এগিয়ে চলি বিস্মিত আমি। সহরের মানুষ, এ সব ভাল বুঝিও না। কোথায় পথ পাশে এক জন্তু মরে পড়ে আছে, তার জন্য আমার কেন এ দুর্ভোগ। আসবে ময়লা-ফেলা গাড়ী, তুলে নিয়ে চলে যাবে। সহরে আমরা যে প্রতিবেশীর জন্যও এত মাথা ঘামাই না !

পথে চলতে সাথী আমার সুরু করলেন ব্রজকথা—কংস নিহত ; নিষ্কণ্টক মথুরার সিংহাসনে কৃষ্ণ রাজভোগে, তবু সুখ নেই। থেকে থেকে সেই বৃন্দাবনের রাখালিয়া জীবন হাতছানি দেয়। ঐশ্বর্য কণ্টকে কণ্টকিত বিষাদনিমগ্ন চিত্তে উদ্ধবকে বলেন....যাও তুমি ব্রজপুরে, মাতা পিতা সখীগণের জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল। তুমি তাঁদের গিয়ে আমার কথা বলে সান্ত্বনা দিও ; বল কৃষ্ণ তোমাদেরই আছে, শীঘ্র সে আসবে তোমাদেরই কাছে। কৃষ্ণ ইচ্ছায় চললেন উদ্ধব ব্রজপুরে। নন্দীশ্বরে পৌঁছে মুগ্ধ হলেন এর সৌন্দর্যে, চমৎকৃত হলেন এর প্রাকৃতিক সুষমায় ! নন্দরাজ ভবনে পৌঁছে নন্দ-যশোদার

চরণ-বন্দনা করে কৃষ্ণের কুশল বার্তা নিবেদন করলেন উদ্ধব। দশ মাস ব্রজপুরে বাস করে গোপী ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করলেন তিনি! আমরাও যখন নন্দীশ্বরে এসে পৌঁছলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা, গোধূলি তখনও শেষ হয়নি, ঘরের পানে ফিরছে তখনও গরুর পাল। ব্রজের ধূলি উড়ছে সন্ধ্যার বাতাসে।

একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর নন্দভবন। যাত্রীরা রামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এইখানে। নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-ভাবময় এ নন্দীশ্বর দেবদুর্লভ। বহু পুণ্যে এ স্থান দর্শন হয়, এই হল বৈষ্ণবজনের বিশ্বাস। এ পরম স্থানে জরা-মৃত্যু-দুঃখ নেই—নেই হিংসা-দ্বেষ-ব্যভিচার। তেত্রিশ কোটি দেবতা বাঞ্ছিত এ নন্দীশ্বর সদা আনন্দময়। এ নন্দীশ্বরবাসীরা নাকি আত্মসুখবর্জিত কৃষ্ণগতপ্রাণ।

নন্দগ্রামের কিছু দূরেই কিশোরীকুণ্ড—এই কুণ্ডে শ্রীরাধা সখি সমাহারে দোল খেলতেন। বৃন্দাবনে হোলি উৎসব বা দোল—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। আসে দোল পূর্ণিমা—অশোক কিংশুক রক্তবসনে নিজেদের আবৃত করে। পলাশের শাখায় শাখায় লাগে রংয়ের আগুন। শিমুল থরে থরে বুকের রক্তে রাঙ্গিয়ে দেয় তার শূন্য ডালপালা। সে এক রক্ত-রাঙ্গা ফুল-ফোটার-মাতনে-মাতা দিনে ব্রজের ধূলি আবীরে কুঙ্কুমে রাঙ্গা হয়ে ওঠে। সে ধূলি গিয়ে জমাট বাঁধে কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়! রাঙ্গা ধূলির তুফান তুলে সর্বনাশা ফাল্গুনে বাতাস মাতামাতি লাগিয়ে দেয়। সে মাতন গিয়ে জাগে ব্রজবাসীদের মনে, সুরু হয়ে যায় দিকে দিকে রংয়ের মাতামাতি যৌবনের জয়ধ্বনি।

বর্ষাণের মেয়েকে রং দিয়ে জ্বালাতন করে গোকুলের ছেলে··· এত বড় স্পর্দ্ধা! রাজনন্দিনীকে জ্বালাতন। বেরিয়ে আসে বর্ষাণের মেয়ে লাঠি হাতে 'যুদ্ধং দেহি' রবে—ব্রজের ধূলায় আজও চলে আসছে সেই প্রথা। ব্রজের মেয়েরা শ্বশুর ভাসুর ভুলে মাথায় ঘোমটা

টেনে এলোপাথাড়ি লাঠি চালায় আজও এই হোলি উৎসবে। হাসি মুখে এ লাঠি আজও খেয়ে আসছেন ব্রজের পুরুষ।

কিশোরীকুণ্ডের দেড় ক্রোশ ব্যবধানে "যাবট গ্রাম।" এই যাবটে শ্রীরাধার কালীভক্ত পতি আয়ান ঘোষ বাস করতেন। থাকতেন শ্রীরাধার শ্বশ্রূঠাকুরাণী জটীলা ও ননদিনী কুটিলা—বড় বড় অট্টালিকা আছে—আছে আয়ান ঘোষ ও জটীলা-কুটিলার প্রতিমূর্তি, আর আছে আয়ান ঘোষ অর্চিত কালীমূর্তি।

শ্রীরাধার নিন্দায় জটীলা-কুটিলার রসনা সদাই মুখর। ননদিনীর কূটচক্রে একদিন ছুটে এলেন আয়ান ঘোষ। শ্রীরাধাকে বধ করতে —রাধা নাকি ব্যভিচারিণী।

ছলনাময় মুহূর্তে ধরলেন কৃষ্ণকালী রূপ—মুগ্ধ ভাববিহ্বল আয়ান ঘোষ সে কৃষ্ণকালী অর্চনারত শ্রীরাধাকে দেখে!

ব্রজের ধূলায় কত বন কত উপবন—নন্দগ্রামের কিছু দূরেই 'কোকিল বন'—এই নাম কেন বোঝা দায়, হয়ত বা বিশেষ ভাবে কোকিলকুজিত ছিল এ কুঞ্জ কোনও সময়ে, তাই এই নামের সমারোহ। তারই পর 'চরণ পাহাড়ী'—রাখাল কৃষ্ণ একদিন দলবল নিয়ে উঠলেন এক পাহাড়ের মাথায়। প্রসন্ন মনে বন্ধুদের বললেন ফুল আন তুলে, সবাই মিলে মালা গেঁথে পরি। তারপর সাজলেন তাঁরা মনের মত ফুলের সাজে—আনন্দ বিহ্বল কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় এমন বাঁশী বাজালেন যে জীবজগৎ বিমোহিত হয়ে গেল—পাহাড় গেল গলে।

আজও নাকি সে পাহাড়ে কৃষ্ণ, সখাগণ ও ধেনুবৎস সকলের পায়ের চিহ্ন বিরাজমান। পাহাড়টীর নাম হয়েছে 'চরণ-পাহাড়ী'। এরই কাছে চরণ গঙ্গা, তারও পর বৈঠান গ্রাম। বৈঠান গ্রাম থেকে আমরা এলুম কোটবনে, এরও পর সূর্যকুণ্ড। জটিলার আদেশে সূর্য পূজা করেন শ্রীরাধিকা এই সূর্যকুণ্ডে—কৃষ্ণ স্বয়ং মধুমঙ্গলসহ

পৌরোহিত্যে ব্রতী হন সে পূজায়। সে দিনের মত আমরা সেইখানেই যাত্রা শেষ করলুম।

পরদিন আমাদের যাত্রা শেষশায়ীর দিকে। একদিন রাধাকৃষ্ণ সখি সমারোহে এ মনোরম সরোবর তীরে এসেছিলেন। এ বিজন বনের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা এখানে উপবেশন করেছিলেন। কেলিমত্ত হংসমরালদের দেখে মুগ্ধ মনে কৃষ্ণ বললেন—রাধা! এ বিজন সরোবরের শোভা আমায় অনন্ত শয্যাশায়ী ক্ষীরসমুদ্রে নারায়ণকে স্মরণ করাচ্ছে, সে নারায়ণের পদসেবারতা স্বয়ং লক্ষ্মী—

সকৌতুকে রাধা বললেন—হে কৃষ্ণ! সে অদ্ভুত লীলা দেখতে আমার একান্ত ইচ্ছা!

শ্রীরাধার আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে কৃষ্ণ অনন্তদেবকে স্মরণ করামাত্র তিনি তাঁর বহু ফণা বিস্তার করে এলেন সে সরোবরে। ফণায় ফণায় তাঁর ঝলমল করতে লাগল মণি। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে তাঁর মূল ফণাটিতে শয়ন করলেন। সে অদ্ভুত লীলার স্মরণে এ সরোবর আজও শেষশায়ী বলে পরিচিত।

মধুবন, তালবন, বেলবন, বৃন্দাবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ভদ্রকবন, ভাণ্ডিরবন, লৌহবন ও মহাবন—এই দ্বাদশ বন ও দ্বাদশ উপবন নিয়ে এই ব্রজধাম—এর পথে পথে কত তীর্থ কত কৃষ্ণলীলা। এই বন উপবনের মধ্যে আবার মহাবন হল গোকুল। সেই গোকুলের পথে অলিগলি ঘুরিয়ে শ্রীদামঠাকুর এনে দাঁড় করালো একটি গাছতলায়। গাছটির পাতাগুলি ঠোঙ্গার আকারের, শুনলুম এতে করে রাখালরাজ ননী খেয়েছিলেন। সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে গাছটি আজও তার প্রত্যেকটি পাতার ঠোঙার রূপ দিয়ে চলেছে। গাছের কৃতজ্ঞতা যে অসীম তা না মেনে পারলুম না এবং

কিছুটা বিস্মিত হয়ে সত্যই কয়েকটি পাতা নেড়ে চেড়ে দেখলুম। রহস্যময়ী পৃথিবীতে সবই সম্ভব, এর বৈচিত্রের ডালি সদাই পূর্ণ।

যাত্রীরা বলদেব থেকে গোকুলে যেতে দর্শন করবেন ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট। এই ব্রহ্মাণ্ড-ঘাটে মাটী খেয়ে লীলাচ্ছলে আপন মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন মা যশোদাকে বালগোপাল। ভক্ত জনে আজও সে মাটী মুখে দিয়ে তৃপ্ত হন। বালগোপালের লীলাময় এ গোকুল বৈষ্ণবের কাছে বৈকুণ্ঠ সমান। কংস বালঘাতিনী পুতনা ও তৃণাবর্ত্তাসুরকে পাঠালেন শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করতে—প্রথমে এল পুতনা। মায়াবিনী একান্ত শ্রীময়ী রূপ ধরে নন্দভবনে প্রবেশ করে শিশু কৃষ্ণকে বিষ মাখানো বুকের দুধ পান করাতে গেল—তার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে কেউই তাকে নন্দগৃহে প্রবেশে বাধা বা কৃষ্ণকে কোলে নিতে আপত্তি করলো না। মহাশিশু কৃষ্ণের কাছে সবই গোচর—এমন দারুণ আকর্ষণে দুধ পান করলেন তিনি যে রাক্ষসী 'ছাড় ছাড়' চিৎকারে দিকবিদিক কাঁপিয়ে বিকট মূর্তি ধরে পড়ে মরে গেলো—তার পতনে এক খাল তৈরী হয়েছিলো—সেই খাল আজও পুতনা-খাল বলে দর্শকজনের কৌতুক জাগায়। এরপর এসেছিল তৃণাবর্তাসুর—ধুলোর তুফান তুলে ঝড়ঝঞ্ঝায় দিকবিদিক অন্ধকার করে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে আকাশে উঠলো সে দানব—কৃষ্ণ মায়ায় কৃষ্ণভার সহ্য করতে পারল না সে—বালক দুই হাতে কণ্ঠ রোধ করলেন তার—শিশুসহ আছড়ে পড়ল মাটীতে সে দুরাত্মা—স্তম্ভিত বিস্মিত ব্রজবাসীকে সচকিত করে। কংস মানস-নয়নে দেখলেন ধূলায় লুণ্ঠিত হতে চলেছে তাঁর রাজমুকুট।

এরপর আমরা এলুম শকট ভঞ্জনে। কৃষ্ণের জন্মোৎসবে মেতে উঠেছে সমস্ত গোকুল নন্দ-যশোদা হর্ষান্তকরণে খুলে দিয়েছেন রাজভাণ্ডার। শিশু কৃষ্ণকে এক শকট ছায়ায় শুইয়ে কর্মান্তরে গেছেন মা যশোদা—কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর শিশুসুলভ

অস্থিরতায় চিৎকার করতে লাগলেন কৃষ্ণ—কর্মবাড়ীর কোলাহলে সে কান্না কেউ শুনতে পেল না—ক্রুদ্ধ শিশু এমন লাথি ছুঁড়লেন যে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল সে গো-শকট—অদ্ভুত এ শিশুর সবই অদ্ভুত—ছুটে এলেন মা যশোদা। বিস্মিত হল গোপবাসীদের মন এ অকারণ অঘটনে। গোকুলের পথে পথে কত না ব্রজমাধুরী, কত না লীলা—বক্তার অন্ত নেই তার পরিচিতি দানে—একে একে দর্শন করে ফিরি নীরব শ্রোতা ও ভক্তিবিহ্বল তদ্গত বক্তা। একদিন মা যশোদা দধি-মন্থনে ব্যস্ত, মনে পড়ছে গোপালের শৈশব কথা। গুণ গুণ গান করছেন কাজের মাঝে। অপত্যস্নেহে উদ্বেলিত তাঁর হৃদয়। ছুটে আসেন শিশু কৃষ্ণ কাছে! রাণী মন্থন দণ্ড ছেড়ে পুত্রকে বুকে তুলে নিলেন। এমন সময় দেখেন দুধ উথলে পড়ছে চুল্লীতে। গৃহিনীসুলভ ব্যস্ততায় দুধ বাঁচাতে ছুটলেন তিনি। আনন্দে বাধা পেয়ে কৃষ্ণ গেলেন রেগে—মারলেন এক টুকরো পাথর দধিমন্থন ভাণ্ডে। বালসুলভ চপলতায় সে পাত্র ভেঙ্গে উদূখলের উপর চড়ে শিকের ননী পেড়ে কিছু খেলেন, কিছু ছড়ালেন। ওদিকে দুধ সামলে মা যশোদা এসে কৃষ্ণের কাণ্ডে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটলেন তাকে মারতে। জননীর এ রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে কৃষ্ণ দিলেন ছুট। কিছুক্ষণ ছুটোছুটির পর ধরা পড়লেন। মারের ভয়ে দু-চোখ কচলে জুড়ে দিলেন কান্না। সেদিন কিন্তু আর সহজে নিষ্কৃতি পেলেন না। ক্রুদ্ধা জননী বললেন পরিচারিকাদের দড়ি আনতে। পাছে নরম হাতে ব্যথা লাগে তাই বাঁধলেন কোমরে! কৃষ্ণ-মায়ায় বারবার দড়ি ছোট হয়ে যায়—কিন্তু নন্দ-যশোদা বা ব্রজবাসীরা বাৎসল্য ভাবে এতই তন্ময় যে তারা স্বপ্নেও কখনও কৃষ্ণকে অবতার ভাবে নি—ব্রজমহিমা এইখানেই! বলে চলেন আমার ভক্তিবিহ্বল কথক ঠাকুর।

পাছে কৃষ্ণ পালায়, তাই মা যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলের সঙ্গে

বেঁধে গেলেন চলে নিজের কাজে। একসময় কুবর তনয়দ্বয় 'নলকুবর' ও 'মণিগ্রীব' ধনগর্বে মত্ত হয়ে কর্মাকর্মজ্ঞান হারায়। নারদমুনি তাদের এ হেন মতিভ্রম দেখে দয়া করে শাপ দিলেন—যাও তোমরা গাছ হয়ে জন্ম নাও—শ্রীকৃষ্ণের পূণ্য পরশে আবার মুক্তি পাবে। যমলার্জ্জুন নামে তারা জন্ম নিয়েছিল গোকুলে নন্দরাজের বাড়ীর পশ্চিম দ্বারে। ঘুরতে ঘুরতে উদূখলবদ্ধ কৃষ্ণ যমলার্জ্জুনের কাছে গেলেন—অর্জুনগাছ-রূপী অভিশপ্ত কুবের তনয়দ্বয় কৃষ্ণদর্শনে মুক্তির আশায় অধীর। উদূখলবদ্ধ অবস্থায় দুই গাছের মধ্যবর্ত্তী সরু পথে গমন করায় উদূখল গেল দুই গাছের মধ্যে আটকিয়ে—কৃষ্ণ তখন দৃঢ় আকর্ষণে দিলেন দুই মহাবৃক্ষ মূল থেকে উৎপাটিত করে। সঙ্গে সঙ্গে শাপমুক্তি ধন্য দুই সিদ্ধপুরুষ বেরিয়ে এসে কৃষ্ণচরণ বন্দনা করে নিবেদন করলেন—হে কৃষ্ণ! বর দাও আমরা যেন বাক্যে শ্রবণে চিন্তায় ও কর্মে কখনও তোমায় বিস্মৃত না হই!

কৃষ্ণ বললেন—তথাস্তু!

উদূখলবদ্ধ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে আনন্দিত মনে চলে গেলেন শাপমুক্ত দিব্যদ্বয়।

এদিকে ব্রজে মহা হুলুস্থূল—পর পর নানা ভয়ঙ্করী উৎপাতে ব্রজবাসী ভীত সন্ত্রস্ত···

কৃষ্ণের পিতামহ 'পর্জন্য গোপ' বাস করতেন নন্দীশ্বরে। তিনি ছিলেন দেবর্ষি নারদের প্রিয় শিষ্য। 'কেশী' দৈত্যের উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে নন্দীশ্বর ত্যাগ করে তিনি আত্মীয়-বান্ধব নিয়ে গোকুলে অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাবনে চলে আসেন।

কৃষ্ণ জন্মের পর থেকে নানা উৎপাতে বিড়ম্বিত নন্দরাজ পরামর্শ করেন গোপদের সঙ্গে। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপানন্দ সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে সর্বজন সম্মানিত ছিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় আবার তাঁরা

ফিরে গেলেন নন্দীশ্বরে—মহাবনে কৃষ্ণ মাত্র দুই বৎসর সাত মাস ছিলেন।

স্থানত্যাগ করলে কি হয়—যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই উৎপাত পশ্চাতে পশ্চাতে ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করেছে। সে কথা বলতে গেলে এসে যায় সারা ভাগবত কথা—সেদিনের মত আমরা গোকুলেই বিশ্রাম করলুম।

গোকুলের কাছেই 'কোলগ্রাম'। মহাপূণ্যলগ্নে পরমপুরুষ মথুরার কংস-কারাগারে দেবকীক্রোড়ে জন্ম নিলেন। তাঁর অপরূপ রূপ দীপ্তিতে ঘুচে গেল কারাগৃহের অন্ধকার। চারিদিক মায়ায় হল আচ্ছন্ন। লৌহকবাট গেল খুলে না-জানা কোন অলৌকিক প্রভাবে। দ্বারে দ্বারে দ্বারীরা মহানিদ্রায় নিদ্রিত—চারিধারে ঘনঘটা। কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে চলেছেন বাসুদেব নন্দভবনেব পথে। নবজাতককে রক্ষার চিন্তায় মন তাঁর একান্ত ব্যাকুল। ব্যথিত বিচলিত বাসুদেবকে পথ দেখিয়ে বিদ্যুৎ আলোকে-যমুনা পার করে নিয়ে চললো এক শৃগাল। দিশাহারা বিহ্বল পথিক দেখতে পেলেন আশার আলো—বিশ্বের দিশারী যাঁর কোলে তাঁর দিশা দেখালো এক শৃগালে। ফণা বিস্তারে বারিবর্ষণ থেকে বাঁচিয়ে পশ্চাতে পশ্চাতে চলেছেন শেষ নাগ অনন্তদেব।

ভয়চকিত বাসুদেবকে বিহ্বল করে কিছুদূর যেতে না যেতেই কৃষ্ণযমুনারজলে পড়ে গেলেন····যমুনার বহু কালের আকিঞ্চন কৃষ্ণকে কোল দেবেন, তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হল। আবার ক্ষণপরে কৃষ্ণ ফিরে এলেন বাসুদেবের কাছে···হারানিধি কুড়িয়ে নিয়ে চললেন বাসুদেব নন্দালয়ের পথে। পৌঁছে দেখেন সেখানেও কক্ষে কক্ষে পৌরজন মহানিদ্রায় নিদ্রিত। মা যশোদার কোলে কৃষ্ণকে রেখে তাঁর সদ্যোজাতা কন্যাটিকে নিয়ে ফিরে এলেন কারাগারে। যোগমায়ার

অলৌকিক মায়ায় কোথাও ঘটল না বিঘ্ন। কৃষ্ণ যেখানে যমুনাকে কোল দিয়েছিলেন. কালে যমুনার ঐ স্থানে চড়া পড়ে গ্রামের বসতি হয়। সেই গ্রামেরই নাম 'কোলগ্রাম'। গোকুল থেকে মথুরা যেতে দূরে শ্রীরাধার জন্মস্থান 'রাবল' গ্রাম দেখা যায়। অন্তহীন এ ব্রজের ধূলায় কৃষ্ণমহিমা—শোনা যায় আড়াই হাজার তীর্থ স্বয়ং কৃষ্ণ রচনা করেন এই ব্রজের ধূলায়। ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ এ ব্রজধাম—তর্কে এর হয় না সমাধান। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।'

ব্রজের ধূলি সর্ব অঙ্গে মেখে এগিয়ে চলেছি এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে—লীলাময় ব্রজদুলালের এক রঙ্গস্থল ছেড়ে অন্য রঙ্গ-ভূমিতে। পথে পড়ল শেরগড়—সেখান থেকে রামঘাট, রামঘাট ছাড়িয়ে অক্ষয়বট—তারও পর চীরঘাট অর্থাৎ বস্ত্রহরণঘাট। মন থমকে যায়—বস্ত্রহরণ?—এর মানে কি? সত্যই কি এমন এক স্থূল লীলার কথা ভাগবৎকাররা বলে গেছেন?

তা নয়। সর্বস্ব ত্যাগ করেই না সেই পরমতমের কাছে যাওয়া যায়। বস্ত্র এখানে রূপকমাত্র, চাই সর্বসংশয় সর্বভার সর্বসংস্কার-মুক্ত মন। মানুষ এল বিবস্ত্র হয়ে, যাবেও তাই, বস্ত্র তার মাঝের মায়াবাদ—পরমপুরুষ কৃষ্ণ তাই মুক্ত করলেন তাঁর প্রিয় গোপিনীদের সেই মায়া থেকে, সেই সংস্কার থেকে সহজ মহিমায় লীলাচ্ছলে। লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়—বলে গেছেন মহাজনগণ।

বৈষ্ণব কথা এ যে অমৃত সমান—আজও ভাল করে বুঝতে পারি না। ছোঁয়া পাই অতি নিভৃতে বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে, কিন্তু আবার ফেলি হারিয়ে। পার্থিব কামনায় ধরার অমৃতে ভরে ওঠে মন নানা রঙে—আকণ্ঠ তা পান করতে মন চায়। হয়ত সব

মিথ্যা সব মায়া, তবুও ত অলীক নয়। জীবনকে আমি যে স্বীকার করতেই চাই, একে ত অস্বীকার করি না—তবু মনে হয় এই সব নয়, আরও কিছু আছে—অব্যক্ত বেদনায় মন বলে কোথায়? কোথায় তার সন্ধান? বস্ত্রহরণ কি হবে? সে দিন সে মায়ামুক্ত সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ সত্য দৃষ্টিতে কি দেখব? কেমনই বা হবে সে দিন এ বিশ্ব-সংসারের রূপ? শুধু এক বোবা প্রশ্ন বিধুর করে তুলছে আজ মন।

দিন কেটে যায়। বর্ষার পর আসে শরৎ, শরতের পর হেমন্ত। মহাকালের মন্দিরে অনন্ত মন্দিরা বেজেই চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতি তার বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে ধরে সে পূজায়। যাকে বলে কাক-জ্যোৎস্না, স্বপ্নস্নাত নীরব নিশীথিনীকে কে এক বিরহী আপন ভুলে বাঁশী বাজিয়ে উতলা করে তুলছে। বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝরে পড়ছে বিশ্বের যত কান্না, যত বিরহ—সব যেন এক হয়ে। কে এ বিরহী, যার বিরহ বাঁধন মানে না? কুলহারা দু-কূল-ছাওয়া এ কান্নাও কি ভেসে চলেছে মহাকালের মন্দিরে কে জানে? ঘরে স্থির থাকতে পারলুম না, দুয়ার খুলে দেওয়ার এ উতলা ডাক স্বস্তি দেয় না, দেয় না সান্ত্বনা। বাঁশির সুর ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। আরে, এ যে আমাদেরই পাগলাঠাকুর! বকুলতলায় বসে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত সে আমার আগমন বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে আজ নতুন চোখে এই একান্ত চেনা হাসিখুশী মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। আপন-ভোলা এই মানুষটির অন্তরেও যে এমন ব্যথার সমুদ্র আছড়ে মরছে সে কে জানত!

কতক্ষণ কেটে গেল। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখি, তার বুকের চাপা কান্না ফোঁটায় ফোঁটায় গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে—সে সম্বিতহারা। আমার উপস্থিতি জানিয়ে আর লজ্জা দিতে মন সরল না, মুখর হয়ে চাপল্য করব এই বিহ্বল বিরহাচ্ছন্ন দুর্লভ মুহূর্তটিতে? যেমন নিঃশব্দে এসেছিলুম, তেমনি নীরবে ফিরে গেলুম নিজের ঘরে। রাত

আর তখন বেশী নেই, প্রায় তিন প্রহর গড়িয়ে এসেছে। রহস্যময়ী পৃথিবীতে মানব-মনের নিত্য-নূতন রহস্যের উদ্ঘাটনে মন সচকিত হয়ে ওঠে। বার বার প্রশ্ন জাগে, হে বিচিত্ররূপিণী বসুন্ধরা, আমাদের শেষ কোথায় ? সুখই বা কিসে ?

আজ প্রায় একটি বছর ধরে বৃন্দাবনের ধূলিতে কত না উৎসব, কত না সমারোহ দেখলুম। দেখলুম কত নিত্য-নূতন তীর্থযাত্রী পুণ্যকামী মানব-মানবী। দেখলুম দেশ ভ্রমণকারী তরুণ-তরুণী, নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা। দেখলুম সর্বহারা ছন্নছাড়া ভবঘুরে। দেখলুম এ সৃষ্টির বৈচিত্র্য। এল ঝুলন। ফুলের দোলনায় ঝুলনে উঠলেন রাধাকৃষ্ণ—মঠে মঠে মন্দিরে মন্দিরে। বৃন্দাবনের ডালে ডালে দোলনা দোলাল ব্রজের কিশোর-কিশোরী বালক-বালিকা—"নীপশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।" এল রাসপূর্ণিমা। যত উৎসব মন্দিরে মন্দিরে, তত মানুষের মনে। এল দোলপূর্ণিমা। পৃথিবীতে বুঝি জরা-মৃত্যু-দুঃখ কিছু নেই। শুধু আনন্দ, শুধু মাতামাতি. শুধু দিকে দিকে যৌবনের জয়ধ্বনি! তারও শেষ হল। পাতা-ঝরানোর কান্না বুকে নিয়ে এল বিধুর বৈশাখ বিশ্বের বৈরাগ্য-কুড়নো তার গৈরিক বসন জড়িয়ে। এল ঝড়ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কালবৈশাখী। জটা নাড়া দিয়ে ধ্যান ভঙ্গ করলেন বুঝি ভোলা মহেশ কৈলাসে—তাঁর নিভৃত নিবাসে। হিমালয়ের বুক ছাপিয়ে নেমে এল সে কম্পন ধরিত্রীর বুকে। তপস্বিনী উমা চমকে উঠলেন তাঁর যোগাসনে। পাগল বুঝি আবার নাচে সর্বনাশা মৃত্যুতাণ্ডবে—যায় বুঝি তার জটার বাঁধন খুলে। দেয় বুঝি সারা সৃষ্টিকে সংহারের রুদ্র তাণ্ডবে ডুবিয়ে। তপস্বিনী বশ করলেন সে মহারুদ্রকে আপন তপস্যার মহিমায়। শান্ত হলেন মহারুদ্র। শ্রান্ত হাসি হাসলেন রুদ্রানী। নয়নে বইল আনন্দাশ্রু, তাপদগ্ধ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে নামল বর্ষার শীতল জলধারা—শ্রাবণ-সন্ন্যাসী চারিদিক শ্যামল করে দিল।

ধারাধৌত পৃথিবীর পানে যেন সুন্দর-দেবতা প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চাইলেন।

দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে মানুষ। আজ যে পর, নৈকট্যে সেই আবার পরম আপন হয়। দূরত্ব পরম প্রিয়কেও যেন কিছুটা সরিয়ে দেয়।

কতদিনই তো এদের মধ্যে কাটালুম, কিন্তু এই ললিতাদি আজও আমার কাছে এক পরম বিস্ময় হয়ে রইলেন। যত তাঁর নিকটে এসেছি ততই বার বার মনে হয়েছে, আমরা সাধারণ শিক্ষিতা বলতে যা বুঝি, তিনি শুধু তাই নন, তিনি অসামান্যা পণ্ডিতা। কিন্তু কি গভীর আত্মগোপন! নিজেকে ঘিরে কি এক দুর্ভেদ্য বর্ম রচনা করে রেখেছেন—যা সহজে ভেদ করা যায় না। তবু যে ধরা ছোঁয়া দিতে চায় না, মনে জাগে তাকেই আবিষ্কারের অদম্য স্পৃহা।

ওঠ বাবা! বেলা যায়, বাসনা জ্বালাই—কার বাসনায় কে আগুন জ্বালায়!—ধোপার মেয়ে আধো আঁধারে ঘুম ভাঙ্গায় তার বাবাকে—বাসনা অর্থাৎ শুকনো কলাগাছের ছাল জ্বেলে যে ভাঁটি জ্বালতে হবে। সেই পথেই হেঁটে চলেন ধনীর দুলাল বৈষয়িক মানুষ লালাবাবু—কিন্তু এ ডাক তাঁর হৃদয়ের কোন তারে গিয়ে ঘা দিল কে জানে! তিনি তাঁর পার্থিব বাসনা কামনায় আগুন জ্বালিয়ে ব্রজের পথে বেরিয়ে পড়লেন মাধুকরি করতে। তাঁর প্রাণে এসে পৌঁছে গেল সে মহা আহ্বান। এই ব্রজের ধুলায় গোবিন্দ মন্দিরের কাছে আজও আছে তাঁর কুঞ্জ। পথিকজন দুদণ্ড প্রাণ জুড়োয় সে পুণ্যস্থানে বসে। পথ চলতে শ্রীকণ্ঠঠাকুর বলেন, এই দেখ গোঁসাই ষষ্ঠগুরু রঘুনাথ গোস্বামীর সমাজ। এই রাধাকুণ্ড তীরে ভজনানন্দে মগ্ন হয়েই তিনি দেহত্যাগ করেন। হুগলী

জেলার সপ্তগ্রামের জমীদার বংশসম্ভূত মহাভক্ত ছিলেন এ কায়স্থ সন্তান। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রদক্ষিণের পথে আসে কত কুঞ্জ—কুঞ্জে কুঞ্জে কত মঠ কত মন্দির। দেবালয়ে দেবালয়ে এ মহা দেবস্থান। তার মধ্যে গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহনই প্রধান। আরও আছেন রাধা, দামোদর, শ্যামসুন্দর, রাধারমণ প্রভৃতি। বৃন্দাবনের এই রাধা দামোদর মন্দিরে আজও রাখা আছে ভক্ত কৃষ্ণদাস মহারাজের স্বহস্তে রচিত চৈতন্য-চরিতামৃতের দুর্লভ পুঁথিখানি। বহু ভক্তের পদরজরঞ্জিত রাধাকুণ্ড পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি কুসুম সরোবরের পথে—এই কাননে কুসুম চয়ন করে শ্রীরাধা যেতেন সূর্যকুণ্ডে সূর্যপূজায়। দুইটি কুণ্ডের মাঝখানে এক মাইল ব্যবধান। আরও এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হয়ে আমরা গিরি-গোবর্দ্ধনের পাদমূলে গিয়ে পৌঁছলুম। এই গিরিকে নাকি বালক কৃষ্ণ সাতদিন সাতরাত্রি বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলায় ধারণ করে হয়েছিলেন গিরিধারী। এগিয়ে এলেন কথকঠাকুর তাঁর ব্রজমহিমা কৃষ্ণকথার ঝাঁপী নিয়ে। সে আজ কতদিনের কথা। প্রায় পাঁচশ বছর আগে এই গিরির পাদমূলে এসেছিলেন বাংলার গৌরাঙ্গ। এই পবিত্র গিরিতে পদার্পণে মন তাঁর বিরূপ হয়েছিল সম্ভ্রমে, অথচ তিনি ব্যাকুল এ গিরি-অধিশ্বর গোপালকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। রাজপুত গ্রামে অন্নকূটে রয়েছেন তখন গোপাল। গোপাল ইচ্ছায় অন্নকূট গ্রামের মোড়লকে কে রাত্রে এসে বলে গেল যে তুর্কী সৈন্য আসছে এই গ্রাম লুণ্ঠনে। গোপালকে নিয়ে পালিয়ে এল গ্রামবাসী গাথোলি গাঁয়ে। গোপালের সন্ধান পেয়ে ছুটলেন কৃষ্ণচৈতন্য সেই পথে। তিন রাত্রি অতিবাহিত করলেন দেউল-দুয়ারে দর্শনে ও নামগানে। চতুর্থ দিন চৈতন্য যখন ফিরছিলেন কীর্ত্তনানন্দে ব্রজের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে—পেছু নিলেন গোপাল। গোবর্দ্ধন-চূড়ায় আপন মন্দিরে গিয়ে উঠলেন বিস্মিত ভক্তজনের

হরিধ্বনির মাঝখানে—এমনি করেই নাকি তিনি বারে বারে ভক্তদের দেখা দিয়েছেন তাদের আকুল আহ্বানে যারা এ পবিত্র গিরিতে পদার্পণ করতে চান না। এমনি প্রেমেই তিনি দেখা দিয়েছিলেন রূপ ও সনাতন গোস্বামীদের। বৃদ্ধ স্থবির রূপগোস্বামী গোপাল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হয়েছিলেন অধীর—মথুরার বিঠ্ঠলেশ্বর মন্দিরে গোপাল গিয়েছিলেন ছলনার আবরণে, মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অজুহাতে, সে আকুল আকুতি উপেক্ষা করতে না পেরে। নিয়েছিলেন রূপগোস্বামীর সেবা একটি মাস। মথুরার পশ্চিমে দুই যোজন ব্যবধানে এই গিরি-এই মহাগিরিপ্রদক্ষিণে জন্মজন্মান্তরের পাপ ক্ষয় হয়ে যায়, আর তার পুনর্জন্ম হয় না—ইহাই বিষ্ণুভক্তের বিশ্বাস।

সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা—বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রের পূজা করেন গোপরাজ সপার্ষদ ষোড়শোপচারে। ইন্দ্র জলদান করবেন তুষ্ট হয়ে এই আশায়। শ্যামল তৃণে ভরে উঠবে গিরি। ঢেকে যাবে নব দুর্ব্বাদলে চারণ-ভূমি। বন্ধ করালেন কৃষ্ণ সেই পূজা। আমিই শৈল, এই বলে বিস্মিত গোয়ালাদের দিয়ে করালেন গিরি-গোবর্দ্ধনের অর্চনা। সমস্ত উপাচার বিলিয়ে দেওয়ালেন পতিত গরীবদের শিবজ্ঞানে সর্বজীবে। সকলই কর্মের অধীন, এই কথা বোঝালেন বিস্মিত পিতাকে। মানুষের কর্মই মানুষকে কল্যাণ অকল্যাণ দান করে। আমিই শৈল, বলে বোঝালেন—তিনি যেমন চৈতন্যময় চেতনসত্ত্বা, তেমনই জড় সত্ত্বাও বটে। মাটীর বুকের কান্নাকে, এই জড়ের ব্যথাকে তিনি মানবীয় মমতায় স্বীকার করে গেলেন। রুষ্ট দেবতা ভাসিয়ে দিতে চাইলেন বৃন্দাবনের অণু-পরমাণু নির্মম বজ্রপাতে, ঝঞ্ঝাঝড়ে, ধারাবর্ষণে। 'মাভৈ' বলে ডাক দিলেন কৃষ্ণ ভীত ভয়ত্রস্ত ব্রজবাসীদের—তুলে ধরলেন গোবর্দ্ধন-গিরি। আশ্রয় পেল যত ব্রজের জীব তারই

ছত্রচ্ছায়ায়। রুষ্ট ইন্দ্র হার স্বীকার করলেন। স্তবগানে নতি স্বীকার করলেন এই লোকেশ্বরের পায়ে—সেই থেকে কৃষ্ণ হলেন গিরিধারী। এই মানস গঙ্গার উত্তর তীরে আছেন চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব। এই ব্রজমণ্ডলে চার রূপে বিরাজমান সেই দেবাদিদেব। বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, কাম্যবনে কামেশ্বর, আর এই গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বররূপী হয়ে। সনাতন গোস্বামী ভজনে তুষ্ট করেছিলেন সেই আত্মভোলা দেবতাকে এইখানে—তাই তাঁর ভজন স্থান এই বনভূমি আজও মুখরিত হয়ে ওঠে অধ্যাত্ম মহিমায়—আজও এই পুণ্যভূমিতে বহু বৈরাগীর বাস।

একে একে আমরা আনর গ্রাম, পাপ-বিমোচন, ঋণ-বিমোচন, ব্রজকুণ্ড ইত্যাদি পেছনে রেখে গোবিন্দকুণ্ডে এসে পৌঁছলুম। কৃষ্ণ পূজায় এই সরোবর করান ইন্দ্র। এই কুণ্ডতীরে দুগ্ধদানচ্ছলে মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন দিয়েছিলেন গোপাল। এই সরোবরের উত্তরে মৃত্তিকায় ঢাকা ছিলেন শ্রীগোপাল—পুরী গোঁসাঁঞি স্বপ্নে তা জানতে পেরে তাঁকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করেন আর অভিষেক উৎসবে অন্নকূট করেন। সেই উৎসবে স্বয়ং কৃষ্ণ রাখাল বেশে এসে অন্নগ্রহণ করেন—ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। বাংলার প্রাণের দুলাল শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। এরই কিছু দূরে নবম অপ্সরাকুণ্ড। অভিশপ্ত অপ্সরাগণ এখানে তপস্যা করেন। তারই পর পুছরীগ্রাম—অর্থাৎ পুচ্ছগ্রাম। ঋষিরা গোবর্দ্ধনকে গাভীর আকারে কল্পনা করেছেন। এরই পর সুরভিকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, হরিদকুণ্ড, জ্যোতিপুরা। এই জায়গাটিকে গিরির মুখ মনে করা হয়, তীর্থযাত্রীরা এখানে ভোজন সামগ্রী ভোগ দেন। জ্যোতিপুরা থেকে দানঘাটি। এই সেই পরম স্থান যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় গোপীদের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়ে "নয় আনা" কড়ি দান নিয়ে নৌকা পারে লাগিয়েছিলেন—অসময়ে অকস্মাৎ

ছেয়ে এসেছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফান শান্ত যমুনার মাঝখানে। ভয়ত্রস্ত গোপীদের সর্বস্ব ত্যাগেই নৌকা ডোবা বন্ধ হয়ে তরী তীর পেয়েছিল। আজ কিন্তু সে দানঘাটি জলশূন্য। এর একমাত্র কারণ স্রোতস্বিনী মানসগঙ্গা আজ জলহীন—একটি সামান্য পুষ্করিণীতে রূপান্তরিত। হয়ত এক সময় চঞ্চলা নদী দু-কূল ছাপিয়ে ছুটে যেত এই পরম স্থানে।

কত গ্রাম, কত জনপদ পেছনে ফেলে লাঠাবন পেরিয়ে আমরা পরের দিন অপরাহ্নে কাম্যবনে এসে উপস্থিত হলুম। পথে পড়ল সুদামাকুণ্ড, বদ্রিকুণ্ড, অলকানন্দা। অলকানন্দার কাছেই অদিবদ্রি অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপী বদ্রিনারায়ণ।

ফিরতি পথে প্রথমে এলুম সাহজীর মন্দিরে। শ্বেতমর্মরের এই মন্দিরে কি অপূর্ব কমনীয়তা—কি শান্তশ্রী! এর সর্ব অঙ্গে যেন স্বর্গীয় পবিত্রতা জড়িয়ে রয়েছে—দর্শনে মন জুড়িয়ে যায়, ইচ্ছে হয় না এই মন্দির ছেড়ে চলে যাই। মন্দিরের দালানে মন্দির-নির্মাতার ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের পাথরে খোদিত প্রতিমূর্তি। ভীড় হলেই সে মূর্তিগুলির পদদলিত হওয়া ছাড়া পথ নেই—বিব্রত মনে স্থানীয় পুরোহিতকে প্রশ্ন করে জানলুম ভক্তের পদরেণুলাঞ্ছিত হওয়াই এঁদের বাসনা। মন স্তব্ধ হয়ে গেল এই বৈষ্ণবীয় দীনতায়! একেই বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন'—সত্যই বুঝি ব্রজমহিমা অমৃত সমান, এ সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না···

সাহজীর মন্দির ছেড়ে আমরা এলুম বিখ্যাত শেঠজীদের মন্দিরে —একি মন্দির না দুর্গ?—কি সমারোহ, কি জাঁকজমক। এইটিই বৃন্দাবনের স্বর্ণগরুড় স্তম্ভশোভিত মন্দির। এর উচ্চ চূড়া দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি স্মরণ করায়। চারিদিকে প্রহরী পুরোহিত আগন্তুক,—যাত্রী ও ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন নিয়ে হৈ-চৈ মহাসমারোহে এ মন্দির শান্তিহারা—পূজারী প্রায় সবই মাদ্রাজী—এ মন্দির

মাদ্রাজী ধনপতিরই দান। গুর্খা নেপালী দারোয়ান দুয়ারে দুয়ারে দেউড়ি আগলে—এই কি মন্দির? প্রাণ যে ত্রাহি ত্রাহি করে—হাঁপিয়ে ওঠে ঐশ্বর্যের এই সমারোহে!

বৃন্দাবনে বহু মঠ, বহু মন্দির, বহু কুঞ্জ—তার মধ্যে গোপীনাথ, গোবিন্দজী ও মদনমোহনই প্রধান। মদনমোহনের মন্দির যমুনার কূলে একটি টীলার ওপর—এটিও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের অনুকরণে রচিত। এ মদনমোহন মন্দিরও আজ পরিত্যক্ত। কথায় কথায় একটি বহু পুরাতন রক্তপ্রস্তর নির্মিত বৃহৎ ভগ্ন মন্দিরে এসে দাঁড়ালুম। একমাত্র গোবর্দ্ধনের হরদেওজী মন্দির ছাড়া এমন খিলান সমন্বিত দ্বিতীয় মন্দির আর সমগ্র পশ্চিম ভারতে নেই—এইটিই গোবিন্দজীর প্রসিদ্ধ মন্দির। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছায় শ্রীরূপ গোস্বামী "গোমা" নামক স্তূপ থেকে গোবিন্দের মূর্ত্তি উদ্ধার করেন ও ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা-একাদশী তিথিতে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই ভগ্ন মন্দির পেরিয়ে-আধো অন্ধকারে নূতন যুগল বিগ্রহ শোভা পাচ্ছেন নূতন ছোট মন্দিরে। পরিত্যক্ত মন্দির ছেড়ে নূতন মদনমোহনও ঠাঁই পেয়েছেন এইখানেই। আসল গোবিন্দ বিগ্রহ আছেন জয়পুর রাজবাড়ীতে, আর মদনমোহন আছেন জয়পুরের জামাই বাড়ীতে। মহামান্য আকবরের প্রপৌত্র হিন্দুবিদ্বেষী আওরঙজীবের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় স্বরূপ এই পন্থা অবলম্বন করা হয়। আগ্রহ সহকারে কাছে গিয়ে দেখতে হয় বিগ্রহ। এই মন্দিরে সত্যই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়! কতকাল ধরে কত ভক্ত এসেছেন এ পূণ্য স্থানে। সকল ঐশ্বর্য ছেড়ে পার্থিব ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে কৃষ্ণ-প্রেমবিধুরা মীরাবাঈ এসেছিলেন এরই দরজায় প্রাণপ্রিয় গিরিধারী গোপালের সন্ধানে। তাঁর চোখে ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ ছিল না,—অত বড় যে পণ্ডিত রূপগোস্বামী, মীরাই ঘুচিয়েছিলেন তাঁর পুরুষ প্রকৃতি ভেদ।

মীরার নিষ্ঠার কাছে তিনিও হার স্বীকার করেছিলেন। মীরার যে ছিল সকল আমিত্ব ভোলা একান্ত আত্মনিবেদন। সে যে আগুনে-পোড়া প্রেম, সে যে নিখাদ সোনা—মীরার জপমালায় যে এক গিরিধারী গোপাল দুসরা ন' কোই....

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এ মন্দির রচনা করিয়েছিলেন অম্বরপতি মানসিংহ—সে আজ কত কালের কথা। মহামান্য সম্রাট আক্‌বর কামনা করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের একত্ব। তিনি ছিলেন পাকা ডিপ্লোম্যাট—ভারতীয় রাজনীতি বুঝি তাঁর চেয়ে কেউ বেশী বোঝেনি। সমগ্র দেশটার প্রাণকেন্দ্র কোথায়, তা দেখার মত প্রখর দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাইত তিনি অসামান্য প্রতিভায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভোগ করে গিয়েছিলেন দীর্ঘ দিন। মোগল-মহিমা সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল তাঁরই রাজত্বকালে। অম্বররাজ দুহিতা বিহারমল কন্যা যোধবাঈ ছিলেন তাঁর প্রধানা মহিষী—মানসিংহের পিতৃস্বসা যুবরাজ সেলিমের জননী। মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় অহোরাত্র ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলত। সে প্রদীপের আলো দেখতেন মানসিংহ দিল্লী থেকে—সে দীপের জ্যোতি দর্শন করতেন অম্বরকুমারী ফতেপুর সিক্রির হাওয়ামহলে উঠে—নিবেদন করতেন প্রাণের প্রণাম মোগল হারেমে বসে। মহান আক্‌বর কোনও দিনই মহিষীর ধর্মাচরণে বাধা দেন নাই। মোগল হারেমে তাঁর জন্য ছিল শিবলিঙ্গ, ছিল তুলসী-মঞ্চ। তাঁর রন্ধন করতেন ব্রাহ্মণ পাচক।

আকবরেরই বংশধর পরধর্ম অসহিষ্ণু আওরঙজীব অন্য একদিন লালকেল্লা থেকে দেখতে পেলেন এই প্রদীপের অনির্বাণ শিখা, সরোষে হাঁকলেন—"আমার রাজত্বে ও কিসের জ্যোতি?" উত্তর পেলেন হিন্দুর মন্দির থেকে আসছে ঐ আলো। রাজরোষ গর্জ্জে উঠল—"ভেঙ্গে ফেল ও মন্দির, ধূলিসাৎ কর হিন্দুধর্ম্মের ঐ

জয়ধ্বজা। আমার রাজত্বে আমারই চোখের ওপর জ্বলে হিন্দু ধর্মের ঐ অনির্বাণ শিখা—এত বড় স্পর্দ্ধা!"

মন্দির ভেঙ্গে তচনচ করে দিল রাজ-আজ্ঞায়—নিভে গেল মহান আক্‌বরের হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনে প্রজ্জ্বলিত সাম্রাজ্যের শক্তি শিখা....

হায়! ধর্মোন্মাদ রাজা—হিন্দুধর্মের অজেয় ধ্বজা নামাবে তুমি কোন শক্তিতে? এ ধর্ম যে যুগে যুগে জগতের সকল সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করেছে—ভবিষ্যতেও করবে, কিন্তু সকল দানকেই সে আপন স্বকীয়তার রঙে রাঙ্গিয়ে রূপান্তরিত করে চিরন্তন শাশ্বত্ আদর্শকেই সমৃদ্ধ ও প্রাণময়ী করেছে—

নাট-মন্দির জুড়ে অগণিত ভক্ত পূজারিণীর অখণ্ড কীর্তন হচ্ছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে—
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

বেশীর ভাগই বৃদ্ধা বাঙ্গালী বিধবা—নিরবচ্ছিন্ন ভোর চারটে থেকে বারো ঘণ্টা একটানা নামগান করে চলেছেন ক্লান্তিহীন বিরামহীন। এ প্রেরণা কিসের? এ ভক্তি তাঁরা পান কোথায়! অসন্তোষ নেই, অনিচ্ছা নেই, ক্লান্তিও বুঝিবা তাঁদের নেই। বিদায় বেলায় পাবেন এক পোয়া চাল্—এক আনা পয়সা। তাই তাঁদের অনেক সে দিনের মত্। কি সামান্য এঁদের প্রয়োজন। ভগবান! অপার তোমার মহিমা! এরা যে তোমাতেই অর্পিতপ্রাণা হয়ে গেছেন। জীবনের দেনা-পাওনাত এঁরা অনেকদিন শেষ করেছেন—এ দেউলিয়া জীবনে আর কি কাজ? সেই নিবেদনময় গোধূলি লগ্নে আমারও হৃদয় একান্ত নিবেদন জানাল—

"আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তবুও মুক্তি তবুও শান্তি তবু অনন্ত জাগে।"

গোধুলি লগ্নে বৃন্দাবনের পথে কালীয়দহ—অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করেছিলেন, সেইখানে এসে পৌঁছলুম। এই কালীয়দহ তীরে চৈতন্যকে দেখে একদিন ব্রজবাসীরা আবার কৃষ্ণ ফিরে এসেছেন এই বিভ্রমে আকুল হয়ে উঠেছিলেন—সেখান থেকে দ্বাদশ সূর্য দর্শন করে পথশ্রান্ত আমরা শ্যামদাস বাবাজীর আশ্রমে ফিরে এলুম।

কত রাত পর্যন্ত ব্রজকথা বলে চললো শ্রীদাম—সে যেন আজ ক্লান্তিহীন···সারাদিনের এত পরিশ্রম, কিন্তু এরা কি কিছুকেই গ্রাহ্য করে না····যখন বসে থাকে তখন দিনের পর দিন বসেই থাকে, আবার যখন রাস্তায় পা বাড়ায় তখন হেঁটেই চলে, মনে হয় এদের এ চলার বুঝি শেষ নেই, এই পথ চলাতেই এদের পরমানন্দ।

সকাল বেলায় শ্যামদাসবাবাজী আসর জমিয়েছেন। উদ্ধব-সংবাদ পাঠ করছেন তিনি—কংস নিহত, নিষ্কণ্টক মথুরার সিংহাসনে কৃষ্ণ রাজভোগে, তবু কিন্তু সুখ নেই। থেকে থেকে সেই বৃন্দাবনের রাখালিয়া জীবন হাতছানি দেয়। ঐশ্বর্য্য কণ্টকে কণ্টকিত বিষাদ-নিমগ্ন চিত্তে উদ্ধবকে বলেন—যাও তুমি ব্রজপুরে, মাতা পিতা ভাই বন্ধু সখিগণের জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল। তুমি তাঁদের গিয়ে আমার কথা বলে সান্ত্বনা দিও, বল কৃষ্ণ তোমাদেরই আছে, শীঘ্র সে আসবে তোমাদেরই কাছে।—যোগিয়া বা বিরহকুঞ্জে অর্থাৎ যেখানে বিরহিনী গোপীরা শোকবিনিময় করতেন সেইখানে গিয়ে পৌঁছেচেন উদ্ধব—বিরহ ব্যাকুল গোপীরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে, আকুল হয়ে উঠছে নন্দীশ্বর কৃষ্ণের স্মরণে···এমন সময়ে সমস্ত মঠের শান্তি ভঙ্গ করে হাহাকার তুলে বাবাজীর পায়ে এসে আছড়ে পড়ল শ্রীকণ্ঠ—ঝড়ো হাওয়ার মত কোথা থেকে ছুটে এল সে? কি দুঃসংবাদ নিয়ে এল?

বাবাজী গো। আমাদের রাখালরাজ চলে গেছে…গড়াগড়ি দিয়ে আছড়াতে লাগলো সে….স্তব্ধ বিহ্বল সভা সচকিত করে শোনা গেল বাবাজীর কণ্ঠস্বর…. রাধামাধব! রাধামাধব! উর্দ্ধপানে চেয়ে কার পায়ে প্রণাম নিবেদন করলেন তিনি‥ওঠ! ওরে সে যে গোকুল ছেড়ে গোলোকে চলে গেল—তার জন্য আবার কান্না কিসের। নাম কর, নাম কর, ওরে নাম সংকীর্তন কর। রাধামাধবের কণ্ঠহার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাবাজী—বাবাজীর পেছনে পেছনে সারা আখড়া শূন্য করে সবাই বেরিয়ে পড়ল—বেরিয়ে পড়ল ব্রজবাসীরা—ছুটে চললো শ্রীকণ্ঠ সেই পথে যেখানে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছে তার রাখালরাজ। ঘরে ঘরে আগল খুলে সারা বৃন্দাবন শূন্য করে জনতা ছুটে চললো সেই পথে—পথে চেয়ে দেখি বেরিয়ে পড়েছেন ললিতাদিদিও সদলবলে।

সত্যই বুঝিলে সে রাখালরাজ—সৌম্য হাসিতে ভরে আছে তার চির নিদ্রিত প্রশান্ত আনন। হাহাকার করে উঠেছে যার জন্য সারা বৃন্দাবন তার মুখে কিন্তু সেই চির কৌতুকময় হাসিটি—মৃত্যুতে সে কি সত্যই মৃত্যুদেবতাকেও উপহাস করে গেল!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এক পাশে—কীর্তনের সুরে ভরে উঠেছে এ উদাসী প্রান্তর। বসন্তদাসের কণ্ঠে রাধামাধবের মালাটি পরম স্নেহে পরিয়ে দিলেন শ্যামদাস বাবাজী—একান্ত মমতায় মাথায় তার হাত বুলিয়ে দিলেন—এগিয়ে এলেন ললিতাদিদি, সৌম্য হাস্যে ভরা সে মুখ চন্দন-চর্চিত করে দিলেন—ফুলের মালায় কর্পূরের মালায় চন্দনে চন্দনে সুরভিত হয়ে উঠেছে এ বিজন মৌন বন। ধীরে ধীরে একজনকে একপাশে ডেকে শুধাই—কি হয়েছিলো ব্রজরাজের। শুনলুম কাকে নাকি দাহ করে সে ফিরে যাচ্ছিল সদলবলে। বনকেওড়ার ঝোপে তার মৃত্যুরূপী কালনাগ ওঁত পেতেছিলো, অতর্কিতে ছোবল দিয়েছে।

—একটু হাহাকার নয়, একটু কাতরতা নয়, কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র, তার পর সব শেষ হয়ে গেছে···ব্রজবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে পালিয়ে গেছে তাদের জীবন্ত নন্দকিশোর। এ জীবনে মৃত্যু অনেক দেখেছি, কিন্তু এই ব্রজের ধুলায় আজ আমি প্রত্যক্ষ করলুম মৃত্যুর মহিমা!

সায়াহ্নের কোলে আমি ও শ্রীদাম যমুনার কিনারে এসে চুপ করে বসে আছি। রাখালরাজ আজ সকলকেই উদ্‌ভ্রান্ত আত্মবিস্মৃত করে দিয়ে গেছে। আজ এই একান্ত দুর্বল মুহূর্ত্তে অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে গেল এক অপূর্ব রহস্যজাল উদ্‌ঘাটনের। আপন-ভোলা আত্মবিস্মৃত শ্রীদাম এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলে ফেললো তাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস, জীবনের প্রায়-ভুলে-যাওয়া তাদের রোজনামচা—তারা ছিল বিপ্লবী। কঠিন তাদের পরীক্ষা, ভয়ঙ্কর তাদের পণ। পদে পদে মৃত্যুকে উপহাস করে যাওয়াই ছিল তাদের জীবন ব্রত। অহিংস সংগ্রামে তারা বিশ্বাস হারিয়েছিল, তাই মৃত্যুময় রক্তাপ্লুত তাদের পথ। প্রয়োজন হলে নিঃশঙ্ক চিত্তে রক্তপাতের জন্য তারা সদাই প্রস্তুত। জীবনের সর্বস্ব তারা ত্যাগ করেছে—এ মহাব্রত তাদের দেশ-মাতৃকার পরাধীনতা মোচনের জন্য—তারা মায়ের পূজায় উৎসর্গীকৃত এক একটি সৈনিক—তারা সংগ্রামী. তারা "মৃদুনি কুসুমাদপি"—অথচ কর্ত্তব্যে অটল, প্রয়োজনে নির্ম্মম। পথ তাদের নানা জটিলতায় কণ্টকাকীর্ণ। চতুর্দিকে তাদের অবিশ্বাস, বিশ্বাস-ঘাতকতা, বঞ্চনা ও ঘৃণা—তবু থামলে চলবে না, তাদের যে এগিয়ে চলতেই হবে সামনের পানে চেয়ে—আপন লক্ষ্যে পৌঁছোতেই হবে তাদের। দলপতির বাক্যই তাদের বেদবাণী। প্রশ্ন নয়, জিজ্ঞাসা নয়—শুধু নিয়মানুবর্ত্তিতা, শুধু বশ্যতা, শুধু যন্ত্রচালিতের মত দলের আদেশ পালন করাই যে ছিল তাদের ধর্ম্ম। জাতির জীবনে সে এক

মহা সন্ধিক্ষণ। সে এক নিদারুণ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মুহূর্ত্ত। তাদের পথ ভুল কি নির্ভুল সে বিচার করবে যুগের ইতিহাস—বলে চলে আত্মহারা শ্রীদাম—কত কিশোর, কত তরুণ, কত সম্ভাবনাময় জীবনকে এই আদর্শের পায়ে শহীদ হতে দেখলুম—তাদের ভুল-ভ্রান্তির বিচারের স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমি আজ শুধু তাদের আত্মদানের নিয়মনিষ্ঠার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যাব। জীবন দিয়ে কি পেল তারা ?

—শুধু দুঃখ, শুধু বেদনা, অবিশ্বাস বঞ্চনা। তারা তাদের জীবন-স্বপ্ন সফল হতে দেখে যেতে পারে নি—কিন্তু তাদের সে আত্মদান, সে আত্মত্যাগ অক্ষয় হয়ে রইল মহাকালের মন্দিরে। তাদের পথ ভুল হতে পারে, কিন্তু বঞ্চনাময় নয়—স্বার্থ-কলুষিত নয় ! তারা নিজেদের জন্য কোন কিছু চায় নি—সব বাসনা কামনা তারা পদদলিত করেছে আদর্শের পায়ে—দেশমায়ের পূজায়। সে সব দিন মনে পড়লে আমার মন আজও বেদনায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

—আহার নেই, নিদ্রা নেই—শুধু দুশ্চিন্তা, শুধু উদ্বেগ। বন্য ব্যাঘ্রতাড়িত জন্তুর মত প্রতিটি মুহূর্ত্ত সচকিত, সদাই উৎকণ্ঠায় ত্রস্ত। কখন কোন সময়ে জীবন কোন রূপ নেয় তাও সংশয়াকীর্ণ—নিজের ছায়াও যেন ছলনা করে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধমনীতে সে কি আঘাত—সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন উত্তেজনায় আচ্ছন্ন অবসন্ন হয়ে আসে-তবু উপায় নেই। সংগ্রামীর পথ এক—সে পথ শুধু এগিয়ে চলার। ফিরে আসার কথা জীবনের মত তার কাছে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তার গত কিছু থাকতে নেই—অনাগতও কিছু নেই—যে মুহূর্ত্তটি নিয়ে সে বেঁচে আছে সেইটিই তার সব।

জীবনের এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মুহূর্ত্তে সব ত্যাগ করে ললিতাদি যখন চলে আসেন এই ব্রজের পথে শঙ্করদার সঙ্গে—এই শ্রীদাম বা স্নকুমারের ওপর ভার পড়ে পশ্চাতের সব স্মৃতি সব চিহ্ন ফেলে

পুড়িয়ে, পেছনের সব ইতিহাস নিশ্চিহ্ন করে বাড়ী ছেড়ে আসার।

শ্রীদাম আত্মগতভাবে বলে চলে—সেই সময় তার হাতে এসে পড়ে এক জীর্ণ খাতা—দিনলিপিও বলা চলে—বলা চলে স্মৃতির টুকরো কথা। অস্পষ্ট নাম, দেবযানী, তৃতীয় বর্ষ, স্কটিশ, চার্চ কলেজ। এক শঙ্করদা ছাড়া এঁদের কাউকেই তখন চিনি না—বিপ্লবীর অধিকার নেই প্রশ্নের—মন তার হওয়া চাই কৌতূহলমুক্ত। তবু বিস্মিত মন ভাবতে বসলো—কে এই দেবযানী? সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। পরম বিস্ময়ে অভিভূত মনে—মনে মনে খুঁজতে লাগলুম এই অজানা দেবযানীকে। মনে জাগলো দেবতা-দানবের দোলা। দেবতা বলেন, যারা পরম বিশ্বাসে তোমায় অন্দরমহলে ঠাঁই দিয়েছে তাদের সঙ্গে এই চৌর্যবৃত্তি করোনা—বিপ্লবীর ধর্ম্ম এ নয়। তার কৌতূহল রাখতে নেই। দানব যে সে সকৌতুকে বলে, দোষ কি, তুমি ত আর এ কথা জনে জনে বলে বেড়াবে না—সত্যযুগে দেবতা-দানবের যুদ্ধে দেবতা হয়েছিলেন জয়ী। আমার মানসদ্বন্দ্বে কিন্তু দেবতা পরাজয়ের আত্মগ্লানিতে মুখ ফেরালেন। দানব সে সদম্ভে গা-ঝাড়া দিয়ে রাজত্ব চালাল। বিপ্লবী জীবন কলঙ্কিত করে আমি চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে গেলুম। মানুষের দুর্ব্বলতা, ক্ষণিক মোহ পদে পদে মানুষকে বিড়ম্বিত কলুষিত করেছে—নামিয়ে এনেছে ধূলায়—দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা নিয়েই ত মানুষ! এমনি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় হয়ত কোনও বিপ্লবী প্রকাশ করে ফেলেছে তাদের কথা—অনিচ্ছায় হয়ে পড়েছে বিশ্বাসঘাতক। দাঁড়াতে হয়েছে অপরাধীর কাঠগড়ায়। বিপ্লবধর্মে নির্ম্মম তার লাঞ্ছনা, চরম তার শাস্তি ঘটেছে। এই পথে পদস্খলনের স্থান নেই—স্থান নেই কোনও মানবীয় দুর্ব্বলতার! প্রস্তরকঠিন এই পথ অরণ্য-জটিল। তার সম্মুখ পরিচয় সে বিপ্লবী—তার যে নবজন্ম এ দীক্ষায়!

সামান্য একখানি ছিন্নপ্রায় খাতা · কিন্তু এ যে রহস্যসাগর। পাতা উল্টে চলেছি--ধ্রুব! তুমি আজ কোথায়? মনে কি পড়ে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন? আকাশ সেদিন ঘনঘটাচ্ছন্ন—উন্মনা মন ঘরে থাকতে চাইল না—

—গাছতলায় এসে বসেছিলুম। হঠাৎ তুমি এলে, চঞ্চল দু চোখ তুলে বলে উঠলে, আমায় তোমার বন্ধু হবার অধিকার দাও দেবযানী!

অপেক্ষা রাখলে না নিমন্ত্রণের। বসে পড়লে ঘাসের ওপর। তুলে দিলে হাতে এক ঠোঙ্গা চানাচুর। কৌতুক চাপতে পারলুম না। হেসে বললুম, সন্ধিটা কিন্তু ঝাল দিয়ে আরম্ভ হল, তাই শেষরক্ষা সম্বন্ধে সন্ধিহান। শিশুর মত প্রাণ-খোলা হাসি হেসে বললে, না, তা আর হবে না, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। হঠাৎ বলে উঠলে, কিছু মনে করো না দেবযানী, সেদিন থেকেই স্বস্তি নেই মনে, আজ কয়দিন ধরেই সুযোগ খুঁজছি মিটমাট করে নেবার।

এতক্ষণ কেমন বোকা বোকা লাগছিল, হঠাৎ ঝলসে উঠল তোমার বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টি—কিন্তু মিটমাট কিসের? সেই যে সে দিনের বাগ্‌যুদ্ধের—

এতক্ষণে মনে পড়ল—আরে! এরই সঙ্গে না গত সপ্তাহের Debating Class-এ দারুণ বাগযুদ্ধ হয়ে গেছে! সত্যই সে দিনের সে পরাজয়ের গ্লানি নতুন করে জেগে মনকে আমার অপ্রসন্ন করে তুললো—বাঁকা কটাক্ষে বললুম, তাই কি স্তুতিবাদ শুনতে এসেছ?

ম্লান হয়ে বললে, ভুল বুঝো না দেবযানী, তোমায় আমার ভাল লাগে—তাই তো এত জ্বালাতন করেছি। কোথায় গিয়ে কথাটা যেন বাজল—অনেক স্তুতি, অনেক কটাক্ষ দেখেছি ও শুনেছি আজ কয় বছর ধরে, কিন্তু এমন সহজ সুরে মনের কথা তো এর আগে কেউ বলেনি—তোমার আবেদন আমার অন্তর স্পর্শ করল। স্তব্ধ হয়ে

বসে রইলুম দুজনে নীরবে। সে মুহূর্ত্তটির সাক্ষী হয়ে রইল সন্ধ্যাতারার দল আর আকাশের অসীম নীলিমা!

এর পর কয়েক পাতা হারিয়ে গেছে, কিছু গেছে ছিঁড়ে। বহু যত্নেও তার পাঠোদ্ধার হল না। আবার কিছুটা স্পষ্ট অক্ষর পাওয়া গেল: "কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছ—বছর খানেক দেখা নেই। চারিদিকে কানাকানি, নানা কথার চাপা গুঞ্জন জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। এমনি একদিনে আনমনা একা এসে বসেছি আমাদের সেই প্রিয় গঙ্গার ধারটিতে। যেদিন থেকে তোমার পরিচয় পেয়েছি, দেখেছি তুমি শিশুর মতই অসহায়। তুমি দৈত্যের মতই দুর্দান্ত, সেদিন থেকে রুদ্রের তপস্যা করে এসেছি। উপায় যে ছিল না! মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছে নানা বিগত স্মৃতি। একদিন যা ছিল সামান্য, তাই আজ অসামান্য হয়ে উঠেছে। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার উদয় হল। ধূলোমাখা মলিন দেহ, চুল বিস্রস্ত। বললুম, হয়েছে কি তোমার? কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছ? কোনও জবাব দিলে না, কম্পিত কণ্ঠে বললে, দেবযানী, তোমায় ভোলার সাধনায় আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি—তা আর হবার নয়। এস, এই গঙ্গা আর ওই দূরের চন্দ্রমাকে সাক্ষী করে শপথ করি, যেখানেই থাকি পরস্পরকে ভুলব না। হেসে বললুম, তুমি প্রকৃতিস্থ হও ধ্রুব! এর জন্য তো এত প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন নেই—তুমি দুর্ব্বল হয়ে গেছ তাই আজ মনের ওপর বোঝা চাপাতে চাইছ। যা সহজ তাতে তোমার বিশ্বাস নেই। পরাজয়ের হাসি হেসে বলেছিলে, সত্যই বোধ হয় আজ আমি দুর্ব্বল। তোমার সে বেদনা-বিহ্বল হাসি মর্ম নিপীড়িত করেছিল, মনে হয়েছিল বলি—ইহজন্মেই নয়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমি তোমারই প্রতীক্ষা করব। সংকোচ কণ্ঠরোধ করেছিল। তুমি পাশে বসে পড়েছিলে অসহায়ের মত।

সেই প্রথম উদ্‌ঘাটন করলুম তোমার আত্মগোপনের রহস্য—বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। বললুম, এ কি পাগলামি তোমার? এ পথে তুমি কেন গেলে?

"তোমার চোখে জল!"—এই বলে তুমি উল্লসিত হয়ে উঠলে, বললে, আর আমি কিছু চাই না—আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। তোমার এ চোখের জল অক্ষয় হয়ে রইল আমার মনের মণিকোঠায়। হঠাৎ দ্রুতপায়ে মিলিয়ে গেলে ঘনায়মান অন্ধকারে, কিছুই ভাল করে বুঝতে পারলুম না। মনে হল, সবটাই কি স্বপ্ন! পাশে ফেলে গিয়েছিলে আধময়লা রুমালখানা, তাই কুড়িয়ে শ্রান্ত মনে ক্লান্ত আমি ফিরে এলুম ঘরে। ঘরখানা ভরে জেগে উঠল বোবা কান্না। যে আমি আজ বিকেলে গিয়েছিলুম, সে আর ফিরল না। তার হল অকালমৃত্যু চিরদিনের মত আমাদের সেই একান্ত প্রিয় বকুলতলায়—কি থেকে কি হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন আমার ঘরে পড়ল পুলিসের হানা—সারা ঘর উলটে পালটে তচনচ করে সমস্ত হষ্টেলবাসীদের প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিভ্রান্ত করে হষ্টেল কর্ত্রীর চরম বিরক্তি উৎপাদন করে তারা চলে গেল। আমার অবস্থা বর্ণনাতীত। অকারণে সবারই মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল—সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন বিনা কারণে বিনা অপরাধে আমায় ত্যাগ করল—আমি যে ধ্রুবকে চিনি সেইটুকু ত্রুটিই আমার জীবন বিষময় করে তুলতে বিদেশী রাজের আইনের মানদণ্ডে যথেষ্ট ছিল। বিনা অপরাধে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন থেকে আমি ছিটকে পড়লুম এক অজানা ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝখানে। পাঠ্যজীবন দূরে সরে গেল, দূরে চলে গেল পরিচিত সমাজ, চেনা পরিস্থিতি। জীবন হয়ে উঠল একান্ত শান্তিহারা····পুরানো আশ্রয় ছাড়তে হল—উপায় যে ছিল না। মানুষ বুঝি এমনি করেই পদে পদে বিভ্রান্ত, বিচিত্র এই জীবন সংগ্রামে···

আবার অস্পষ্টতা। কয়েক পাতা উল্টে চলি—মনে প্রাণে আমি অহিংসবাদী—আমাদের লাগল সংঘাত মতবাদ নিয়ে। তোমার আমার মাঝখানে মহাপ্রাচীর তুলতে বসেছে রাজনীতি। সন্ত্রাসবাদীদের আত্মত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বিশ্বাস করিনা ও পথ—হিংসার পথে কখনও কল্যাণ আসে না—আসতে পারে না।

এর পর আবার কয়েক পাতা ছিঁড়ে গেছে—বহু কষ্টেও পাঠোদ্ধার হল না—আবার কিছু পাঠোদ্ধার হল—আর একদিনের কথা যে বড় মনে পড়ে ধ্রুব। দুর্দ্দান্ত গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে—হঠাৎ আমার হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে উঠলে—আমি যদি নাও সামনে থাকি আমার কথা কি মনে পড়বে দেবযানী?

বলেছিলুম—পড়বে বৈ কি। যখন তুমি থাকবে না সামনে, তখন ঘন দুর্যোগের রাতে—গভীর নিশীথে তোমার কথা মনে পড়বে—মনে মনে বলব—

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
হতেছ তুমি পার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

নয়ত বলব—

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো—
পাগল ওগো ধরায় আস

হাসি মুখে বলেছিলে, সাবাস বন্ধু! এইত চাই—ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললে—আর আমার কথা শুনবে না?

বললুম—শুনব বৈকি—একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলে—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

মোটা গলায় বেসুরো বেতালা গান···কিন্তু তাই কত সুন্দর মনে হয়েছিল—হেসে থেমে বলেছিলে, বল তুমি তারপর?

বলেছিলুম—তারপর!—তারপর যদি কোনও দিন হতাশায় বেদনায় মন ভরে ওঠে, ক্লান্ত দেহে ক্লিষ্ট মন নিয়ে এসে দাঁড়াও, বলব—

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো
সকল মাধুরী লুটায়ে যায়
গীতসুধারসে এসো।

বিহ্বল তোমার সমস্ত শরীর সেদিন থরথর করে কেঁপেছিল—চেষ্টায় আত্মসংবরণ করেছিলে—বারবার দেখেছি তোমার চিত্তের উদ্দামতা, কিন্তু দেখিনি কখনও অসংযমীর উন্মাদ বিকার···তাইত তোমার পায়ে এমন করে অন্তর লুটিয়ে পড়েছিল। সব সত্ত্বা বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

সেও গেছে একদিন····আর আজ? আজ আর কিছু নেই শুধু পিছু চাওয়া, শুধু মনে পড়া সেই দুরন্ত দিনগুলির স্মৃতি!

আমার কি সব শেষ হয়ে গেল? জীবন কি শুধুই ফেলে আসা? সামনে কি কিছু নেই? শুধু তরুছায়াহীন শূন্য মরুভূমি?

সম্বিতহারা হয়ে পাঠোদ্ধার করে চলেছি—তোমাদের কাজে অন্তর আমার কোনও দিনই সায় দেয়নি—তবু যখন একদিন তুমি এলে, হাতে মারণাস্ত্র নিয়ে বললে, লুকিয়ে রাখতে হবে তোমাকে

—বলতে যাচ্ছিলুম, এ আমি পারব না, ক্ষমা কর। আমার মনের দ্বন্দ্ব তুমি বুঝলে, বলে উঠলে—এর ওপর যে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে দেবযানী!

না বলা আর হল না, যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে হাত পেতে নিলুম, বিজয়ীর হাসি হেসে তুমি চলে গেলে।

সেই মুহূর্ত্তে ছায়া ঘনাল আমার চিরশত্রু তোমার অগ্নিমন্ত্রের গুরু শঙ্করদার মনে—কি হল জানি না, বললেন—ওটা আমায় দিয়ে দাও, তোমার রাখবার আর দরকার হবে না!

বললুম—ধ্রুব না বললে তো এ আমি হাতছাড়া করতে পারি না—

ক্রুদ্ধকণ্ঠে শুধালেন—আমাকেও না?

বললুম—না—

বেদনাচ্ছন্ন মুখে উঠে গেলেন—আপন মনেই বলতে বলতে গেলেন—সব ভুল হয়ে গেছে, সব ভুল হয়ে গেল। এ চলবে না—এ চলতে পারে না!

কি ভুল হল—কি হল না। কে কি পেল…কে কি পেলনা জানি না, মাঝ থেকে আমার জীবন হয়ে উঠল দুর্ব্বিসহ। মানুষ কি এমনি করেই পদে পদে পরাজিত, এমনি করেই লাঞ্ছিত আপন চিত্তদৌর্বল্যের দুর্বিপাকে?

সেদিন থেকে শঙ্করদার মনে এল প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন। আমায় যে কি স্নেহের চোখে দেখলেন! এতদিন পথের কাঁটার মত ধ্রুবর পথ থেকে আমায় সরাতে চেয়েছিলেন। এরপর থেকে শুরু হল তাঁর ধ্রুবকে ফেরানোর দুস্তর সাধনা আমার মুখ চেয়ে। শঙ্করদা চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। পাগল যখন মেতে ওঠে তার পাগলামিতে, তখন তাকে ফেরানো যায় না। যৌবনের চঞ্চলতা তখন উদ্দাম, দুর্বার—উত্তাল সে তরঙ্গ রুধবে কে? সে ঝঞ্ঝা শান্ত হবে কিসে?

মন্দাকিনী নেমেছিলেন শিবের জটায়—মহাপ্রলয় বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমি এ রুদ্রকে থামাই কোন মন্ত্রে? কোথায় আমার সে শিবশক্তি? কই সে আমার উমার তপস্যা? মরণ নিয়ে এই যে শিশুর মত লুকোচুরি খেলায় মেতেছে, এ থেকে এই দুরন্তকে আমি থামাই কি দিয়ে? আশা নিরাশায় দিন কেটে যায়—অনেক দিন আবার দেখা নেই। হঠাৎ এলে এক দুর্যোগের রাতে—শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে। তোমায় পেয়ে মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। শুধালুম—এ কি রুদ্র সন্ন্যাসী? রুদ্রের তপস্যা কি ভুলে গেলে? হেসে বললে, তাণ্ডবে যে রুদ্র সেই যে আবার উমাপতি। দেখতে কি পাওনা

"দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা
উদ্দামের উত্তরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে—
অস্থি-মালা গেছে খুলে মাধবী বল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।"

সকৌতুকে বলেছিলুম—আজ কি তবে তপস্বীর রাজবেশ?

হাসির ছটায় ঘর আলো করে বলেছিলে—এ ঘরে তো আমি চির রাজা।

দু-হাত ভরে সেদিন তোমার সেবা করেছিলুম—সে দিন যে আমার স্মৃতির মালায় অক্ষয় হয়ে আছে চিরদিনের মত। সমস্ত জীবনে সে দিনটি যে আমার অনেক আশায় পাওয়া—জীবন সঞ্চয় একটি আনন্দ মুহূর্ত্ত!

কি থেকে কি হয়ে গেলো—কালচক্রে কোথায় ভেসে গেলুম আমরা? মানুষ কি এমনি অসহায় সেই অদৃশ্য শক্তির পায়ে—যার নাম নিয়তি? স্তব্ধ মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়—ঘুমন্ত বিশ্ব প্রকৃতির বুকে বিচিত্র রহস্যের ছায়া পড়ে। ঘনিয়ে আসে রহস্যলোক—তোমায় বড় বেশী করে মনে পড়ে যায়। ক্ষমা করতে পারি না

নিজেকে, কেবলই মনে হয়, আমার বাঁধন বুঝি শিথিল হয়েছিল, নইলে কেমন করে তুমি এমন মৃত্যুযজ্ঞে ঝাঁপ দিলে! প্রতি মুহূর্ত্তের এই ত্রস্ত কণ্টকিত জীবন আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না। তুমি এগিয়ে চলেছ তোমার বিশ্বাসের শক্তিতে কিন্তু আমার সে সম্বল কই? আমি তো এ পথে বিশ্বাসী নই। আর একদিনের কথা —পুলিশ তখন তোমাদের পাগলা-কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে। কণ্টকিত আশঙ্কায় উদ্বেগময় দিনরাত কেটে যাচ্ছে! হঠাৎ চাপা কণ্ঠের ডাক এল পেছনের জানলা দিয়ে—দেবযানী—দেবযানী! ঘুমিয়েছ?

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি এ তুমি কেমন করে ভাবতে পেরেছিলে। নীরবে গিয়ে দাঁড়ালুম। জীর্ণবস্ত্র, সর্ব অঙ্গে ধূলো—কি চেহারা হয়েছে। যেন এক পথের ভিক্ষুক। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল, কষ্টে তা গোপন করে ঘরে নিয়ে এলুম পেছনের দরজা দিয়ে। কি পাব অত রাতে! অতি সামান্য যা ছিল ঘরে ধরে দিলুম। তুমি বুভুক্ষিতের মত তাই গিলতে লাগলে। হঠাৎ দূর থেকে গোলমাল ভেসে এল—তুমি চলে গেলে সেই অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়— আর দেখা হল না।

কি বেদনা-কণ্টকিত দুর্ভাবনাময় কয়েকটি দিনরাত কাটল। চতুর্দিক যেন মহাশূন্যতার রূপ নিয়ে খাঁ খাঁ করতে লাগল। অকারণে স্বস্তিহারা হয়ে উঠল মন। কি করি—কোথায় যাই— কার কাছে পাই সান্ত্বনা?

কদিন পরে শঙ্করদা এলেন—বিবর্ণ দেহ, মুখে কালি ঢালা। গোপনে শুধালুম, শঙ্করদা যা শুনছি সে কি সত্য?

শঙ্করদা মিথ্যা বলেন না ভেঙ্গে পড়ে বললেন—ডানহাতখানা আমার ভেঙ্গে গেছে বোন – আমি হেরে গেলুম। কিছুতেই পারলুম না সে ক্ষ্যাপাকে ফেরাতে।

একটি মুহূর্তে আমার কলমুখরিত চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেল—জীবন হলো যেন বিসর্জনের পর দুর্গা-দালান। উৎসবান্তে উৎসবগৃহ। দীপান্বিতা রাত্রির অবসানে মলিনা বিবর্ণা শেষ রাত্রি।

কেঁদে বললুম, আমি কি করব পথ বলে দাও—আমার যে সব অস্পষ্ট হয়ে গেল!

বললেন—চল বোন, এমনি করে তোকে ফেলে রেখে কোথাও যেতেও পারব না।

সুখে দুঃখে এক হয়ে আছি সেই থেকে—শঙ্করদা আমার ভায়ের অধিক—শঙ্করদা আমাদের গুরু। তার সঙ্গে আবার দেখা হবে এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে দূরের পানে চেয়ে পথ বেয়ে চলেছি। জন্মান্তরে আমি বিশ্বাসী—জানি না সে চির রহস্যলোকে সে আজ কোথায়?

সেই থেকে কি যে হল শঙ্করদার মনে—চুপ করে বসে বসে ভাবেন। একদিন বললেন, চল বোন, এখানে আর কাজ নেই, আমরা বোধ হয় ভুল করেছি রে। তাঁর কাজ তিনি করবেন—আমরা কে? সেই থেকে হল আমাদের নবজন্ম—পেছনের সব রইল পেছনে পড়ে--

শ্রীদাম এই পর্য্যন্ত বলেই ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে রইল। বিস্ময়বিমূঢ় মনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম আমি—তবে কি আজকের এই ললিতাদিই একদিনের দেবযানী? কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন—সত্যই যে একেবারে জন্মান্তর!

সাগ্রহে শ্রীদামকে শুধালুম, তারপর—শ্রীদাম বললে, আর একদিনের ঘটনা বলে শেষ করব বন্ধু!

শঙ্করদা তখন শেষ শয্যায়। মনের গোপন অপরাধের গ্লানি তাঁর পায়ে নিবেদন করে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় শয্যার পার্শ্বে গিয়ে বসেছিলুম—কিন্তু সুযোগ আর আমার হল না, তাইত এ

বোঝা এমন ভারী হয়ে বুকে চেপে আছে—এ আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না—কতবার মনে ভেবেছি যাঁর পায়ে অপরাধী সেই ললিতাদির কাছেই নামিয়ে দেব আমার এ দুর্বহ বোঝা—কিন্তু পেরে উঠি না। লজ্জা, গ্লানি, ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় আমার মুখ চেপে ধরে। এঁরা যে কত বড় তপস্বী, কত উচ্চ এঁদের সাধনা তা আমার মত তুচ্ছ কি করে বলবে—এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত।

আজও চোখের ওপর জেগে ওঠে শঙ্করদার মৃত্যুশয্যা—মৃত্যু যে এমন মহৎ, সে যে এমন প্রশান্ত এর আগে বুঝি নি। তাঁর মৃত্যুই ত মন থেকে নিঃশেষে মুছে দিয়ে গেছে মৃত্যুর বিভীষিকা।

মৃত্যুমুহূর্ত্তে মুখে সে কি জ্যোতি—সে কি প্রশান্ত আত্ম-সমাহিত আনন্দস্বরূপ। যাবার আগে ললিতাদিকে ডেকে বললেন—আমি যাই বোন, এরা সব রইল দেখিস! কখনও নিজেকে ছোট করিসনি রে, সব সময় মনে রাখিস তোরা মানুষ—মানবতাই যেন তোদের সব চেয়ে বড় পরিচয় হয়। মনে রাখিস বোন তোরা কারো চেয়ে ছোট নোস—এ পুরুষ কৌলিন্য সমাজে যতই তোদের অনাদর হোক না কেন। দুঃখ করিসনে রে, যা অবশম্ভাবী তাকে সহজ স্বীকৃতিই দিতে হয়। তোর চোখ দিয়ে জল পড়লে বুঝব আমার সব ভুল, সব মিথ্যা হয়ে গেছে। আজন্ম আমি ভুলেরই সাধনা করে এসেছি রে—আমি যে কি বিশ্বাসে চলেছি তা কি দেখতে পাচ্ছিস না? এত শুধু গৃহান্তর, দেহ ছেড়ে দেহাতীতে যাওয়া রে পাগলি! জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্লোকে পরম জ্যোতিতে লীন হয়ে গেলেন। জীবনে আমাদের অনেক গেছে—এও ধীরে ধীরে আমাদের সয়ে গেল।

আপন্-ভোলা শ্রীদাম হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল। আচমকা চমকে উঠল সে। কে যেন সর্বাঙ্গে চাবুক মারল—লজ্জায়

অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে মুখ তার কালো হয়ে গেল। বেত্রাহতের মত ব্যথাবিহ্বল সে আমার কাছে থেকে উঠে চলে গেল।

বিস্ময়বিমূঢ় আমি চুপ করে বসে রইলুম—শূন্যতার পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে। আমার এ বৃন্দাবনের জীবনে শ্রীদাম যে কতখানি জুড়েছিল এতদিন বুঝতে পারি নি। এ ঘটনার পর কে যেন দূরত্বের যবনিকা টেনে দিল—আমরা আর কিছুতেই সহজ হতে পারলুম না। আমায় শ্রীদাম প্রাণপণ এড়িয়ে চলতে লাগলো। তার সে সদানন্দ প্রশান্ত ভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেল—তার সে আত্মনিগ্রহের ব্যথাপীড়িত মুখ আমায় মর্মান্তিক দুঃখ দিল। তার এ ব্যবহারে আমিও অস্থির হয়ে উঠলুম।

আমাদের এ আচরণ আশ্রমের কারও দৃষ্টিই এড়াল না; এ আবহাওয়া আমার কাছে একান্তই শান্তিহারা হয়ে উঠল। কোথায় যাই? কার কাছে পাই সান্ত্বনা? বৃন্দাবনের সমস্ত শ্রী যেন মুছে গেল মন থেকে!

রাধার দৃষ্টি এড়াল না। তার কাছেই নামিয়ে দিলুম এই গোপন অপরাধের বোঝা।

বলল, এ আলোচনা উচিত হয়নি বন্ধু। আরও বলল—ভুল-ভ্রান্তি-দুর্বলতা নিয়েই মানুষ—এ যে স্বভাবধর্ম। এই জয় করার সাধনাই তো করে আসছেন মনীষীরা যুগে যুগে—তবে এ আশ্রম তোমায় ত্যাগ করতে হবে কিছুদিনের জন্যে—ত্যাগ করাই ভাল। কথাটা তোমায় বলব বলব ভাবছিলুম আশ্রমের হাওয়া কেমন যেন ভারী হয়ে উঠেছে!

বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। তবে কি রাধাও আমায় পথে বার করে দিতে চায়? নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—উদ্বেলিত ব্যথা-সমুদ্র আছড়ে মরছে মনের বালুকা-বেলায়।

বাইরে ঝড় উঠেছে। অধীর প্রাণে বেরিয়ে পড়লুম দরজা খুলে। হু-হু করে বইছে ঝড়ো হাওয়া। উদ্দামতায় মেতে উঠেছে বনভূমি। অস্থির নাচনে নাচছে ডালপালা। রাধার ঘরে জ্বলছে আলো; খোলা জানালাটা দিয়ে তা দেখা যায়। তবে সেও কি বিনিদ্র এই ঝড়ের রাতে? পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। সেদিন সে সর্বনাশা রাতে সব হারিয়ে মন বুঝি তাকেই কামনা করেছিল।

রাধা সম্বিতহারা স্তব্ধ! ধ্যানরত মুখে এ কি অপূর্ব প্রশান্তি! এ কি অপার মহিমা!

এ শুচিতায় মন সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুগ্ধনেত্রে সব ভুলে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। হাওয়ায় হঠাৎ আছড়ে পড়ল কবাটখানা। সচকিত রাধা তাকিয়ে দেখল:

এ কি? এ অসময়ে এমন করে তুমি? এস, এস, ঘরে এস!

কেমন করে বলি আজ যে আমার সারা বিশ্ব দেউলে হতে বসেছে। ঘরে তার পাশে অসহায়ের মত বসে পড়লুম। বাইরে চলতে লাগল তেমনি ঝড়ের অশান্ত মাতামাতি।

কিন্তু বার বার মনে হতে লাগল—আমি এমন এক জায়গায় এসে বসেছি—যেখানে ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই, ক্ষোভ নেই, সুখ-দুঃখ কিছু নেই—এ স্তব্ধ অন্তরলোক ধ্যানমৌন। শান্ত দৃষ্টি মেলে আমার পানে চেয়ে বলল, ঘুম বুঝি এল না বন্ধু?

পাশে পড়েছিল একতারাটা। হেসে বলল—গান শুনবে?

নীরবে সম্মতি জানালুম—শান্ত কণ্ঠে সে গাইল—

মেরে তো গিরিধারী গোপাল
দুসরা না কোই রে…

চোখের ওপর ভেসে উঠল সর্বত্যাগিনী কৃষ্ণগতপ্রাণা পথ-ভিখারিণী মীরা—

মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরা ন কোই…

মরমী জন বুঝি আপন অন্তরে শুনতে পায় সে বুক-ফাটা কান্না অনন্ত কাল ধরে। মীরার কান্না....সে যে নাম-না-জানা ব্যথার আকুল প্রকাশ! আত্ম-ভোলা সেই একান্ত প্রেমের এ বিশ্বে তুলনা কই? গান কখন সাঙ্গ হয়ে গেছে, চুপ করে দুজনা মুখোমুখি বসেছিলুম। বিমুগ্ধ মন ভাবতে লাগল কে এই তাপসী?

খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে রাধা বলল, একদিন তোমায় যেতে দিতে হবে জানতুম। কিন্তু সে যাওয়ায় যেন কোনও মালিন্য না স্পর্শ করে, জাগে না যেন কোনও ক্ষোভ—সে আমার সইবে না। হাসিমুখে তোমায় এ আশ্রমে এনেছিলুম, হাসিমুখেই বিদায় দেব—এই ইচ্ছাই জাগছে মনে। ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললুম, কালই আমি যেতে চাই রাধা, এ আর আমার সইছে না!

কিছু জবাব দিল না। বললুম, আবার কি দেখা হবে? চুপ করে চেয়ে রইল, বলল, পথের কথা পথই জানে বন্ধু! তবে এইটুকু তুমি জেনে যাও—এ বৃন্দাবনের বুকে তোমার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল। আমার একান্ত নিভৃত মুহূর্তে অবসর ক্ষণে শুধু এই কথাই মনে পড়বে—তুমি এসেছিলে!

দুঃখ, গ্লানি, বুক-ফাটা কান্না নিয়ে ভিখারীর মত রাধার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। এঁরা অন্নপূর্ণার জাত, পরিপূর্ণ করে দিলেন ভিক্ষাপাত্র। ফিরে এলুম অনন্ত প্রশান্তি আর বুক-ভরা আনন্দে পরমতমকে পাওয়ার তপস্যা বুকে নিয়ে।

ভোরবেলা আপন হাতে রাধা গুছিয়ে দিয়ে গেল আমার পথের ঝোলা। স্বচ্ছ আকাশের নীলিমার অন্তরালে কি আছে সে কে জানে!

—সকাল সকাল দুটি খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও ঠাকুর, নইলে পথে কষ্ট হবে যে, হেসে হেসে বললে রাধা।

আচরণে জানাতে চায় না কোথাও বিঁধছে তার অদৃশ্য গোপন ব্যথার কাঁটা।

নমিতা ও মুক্তাধারা আজ বিশেষ যত্নে খাওয়ালো—বার বার ঘুরে ফিরে বললে, আবার এস ঠাকুর, আমাদের ভুলো না। কত কষ্টই না পেয়ে গেলে এই গরীব ঘরে।

পথে পথে এমনি করেই পেয়েছি কত মা-বোন। এই কয় মাসে এরা আমার কত আপনই না হয়েছিল।

সবাইকে দেখলুম। দেখা হল না শুধু শ্রীদামঠাকুরের সঙ্গে আমায় সে এড়িয়ে চলেছে আজ কয়দিন ধরে। এই চলে যাবার দিনটিতে বারবার তাকে স্মরণ করলুম। শুনলুম সে গেছে তীর্থের পথে দেবপ্রয়াগে, কাউকে কিছু না বলে—ঘরে ফেলে রেখে গেছে একখণ্ড কাগজে তীর্থযাত্রার সংবাদ।

নিভৃতে রাধার কাছে গিয়ে বললুম—রাধা! যদি সুযোগ পাও শ্রীদামকে বল যে আমার অপরাধী মন বার বার তার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে!

বিদায়মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এল। আমার পথের ঝোলাটি তুলে রাধা বলল, চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

নিঃশব্দে দুজনে পথ কেটে চলেছি। এই পথেই একদিন এসেছিলুম অচেনা মানুষ, আর আজ আবার সেই পথেই ফিরে চলেছি···কিন্তু এও কি সেই আমি?

আজ আমার সুখ-দুঃখের কত সঞ্চয়—কত বেদনামধুর স্মৃতির সম্বল!

নীরবতা ভঙ্গ করে রাধা বলল—এবার আমি যাই, ফেরার সময় হলো বন্ধু।

তাকিয়ে দেখলুম, দেখার ভুল কিনা জানি না, মনে হল সে দৃষ্টি যেন বিহ্বল!

এগিয়ে এলুম পথের ঝোলাটি নিয়ে পায়ে পায়ে। মোড় ফেরার আগে আর একবার বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে পেছনে তাকিয়ে দেখলুম, যেখানে পড়ে রইল আমার জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া। মনে মনে বললুম, রাধা, এরই কথা কি তুমি আসবার দিন বলেছিলে, এরই নাম কি পাথেয়? এই কি পথের সম্বল?

এ পাওয়ার চেয়ে কি না পাওয়া ভাল ছিল না?

এ জনারণ্যে জনতার মাঝখানে
চির সুন্দর ! তোমায় খুঁজিয়া মরি—

জনতার কোলাহলে পথে পথে নিজেকে বয়ে বেড়াই—কোন কিছুতেই আর স্বস্তি নেই। কোথায় যেন বাধা পেয়েছে প্রাণ-প্রবাহ। পথ-চলায় আর পাইনে উৎসাহ, পাইনে উদ্দীপনা—

'তারে নিয়ে হলনা ঘর বাঁধা
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা—'

—রাত যায়, দিন আসে—দিন যায়, সন্ধ্যা ঘনায়। মন স্বপ্ন দেখে—বৃন্দাবনে সন্ধ্যা হল। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আরতির শঙ্খ ঘণ্টা শোনা যায়—দেবালয়ে দেবালয়ে ওঠে ভজন গান। আসে নতুন রাধা প্রদীপটি হাতে নিয়ে আমার ঘরে—শূন্য ঘরখানায় সে কাকে খোঁজে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে !

শুনেছি মানুষের ব্যর্থ আশা—ব্যথার হাহাকার তীর্থের পথে অমৃতের সন্ধান পায়, সর্বহারা লাভ করে মহাসম্পদ। যার পরশে সে স্নিগ্ধ শান্ত হয়। ব্যাকুল মন প্রশ্ন করে আমিও কি পাব সে মহা পরশমণির সন্ধানে তীর্থের পথে ?

একদল যাত্রী চলেছে হরিদ্বারে। দিকভ্রান্ত আমিও তাদের সঙ্গেই ভীড়ে গেলুম, কিন্তু সে সঙ্গ আমার সইল না। কি বিবাদ, কি বিসংবাদ—তুচ্ছ তুচ্ছ সামগ্রী নিয়ে কি দীনতা ! কারো বা শুচিতার অন্ধ অহংকার—কারো বা বিফল পাণ্ডিত্যের ! কোথাও বা ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ আড়ম্বর—কোথাও দেখি কামনার কলুষ কদর্যতা !

কে এরা ?

মন প্রশ্ন করে আতুর বেদনায় !

এও কি আমাদেরই বিভিন্ন রূপ ? কেন এরা এসেছে তীর্থের পথে ?

তিক্ত বিতৃষ্ণ মন নিয়ে নামলুম হরদ্বারে…বারবার বোবা প্রশ্ন জাগে আমি কি চাই? কাকে চেয়ে এমন পথে পথে ঘুরে মরছি?

হরদ্বার বা হরের দুয়ার—ভগবানের পথ। কোন ভক্ত কবে আপন ভুলে এ নাম রেখেছিল কে জানে! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটির সর্ব অঙ্গে যেন শুচিতা। ভোলাগিরির আশ্রমে গঙ্গার কূলে এসে বসলুম। কলনাদিনী মন্দাকিনী বয়ে চলেছে আপন প্রাণছন্দে মাতোয়ারা হয়ে—স্বচ্ছ জল, নদীর তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। সামনে চণ্ডীপাহাড় যেন যুগ-যুগান্তের প্রহরী। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অটল মহিমায়।

মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল সুন্দর দেবতার এই সুন্দরতম রূপে। প্রশস্ত ঘাট। কয়েক ধাপ উঠে গিয়ে সামনে একটি ছোট শিবমন্দির—আরতির বন্দনা-গানে সম্বিত ফিরে পেছনে তাকালুম। মন তখন পরিপূর্ণ শান্তিতে স্তব্ধ…হৃদয় তার সব চঞ্চলতা বুঝি জাহ্নবীর জলকল্লোলে ডুবিয়ে দিয়ে এল।

আজও এ সহর পুরাতনকে জড়িয়ে রেখেছে আপন অঙ্গে যেন কোন নিবিড় মমতায়। সংস্কৃত-চর্চ্চা আজও এখানে চলছে মরানদীর মত। ছোট বড় বহু ছাত্র-নিবাস। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে বিদ্যার আদান-প্রদান। এখানে আছেন বহু পণ্ডিত, উপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় তাঁদের শাস্ত্রতত্ত্বের অতল সমুদ্রে ডুবে—বেদ-বেদান্তের গহনে আত্মনিমগ্ন হয়ে…ভারতের আধ্যাত্মমহিমা এখানে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে।

চলন আছে আয়ুর্বেদের। এখানকার আয়ুর্বেদ কলেজ সর্বজনবিদিত। অলিতে গলিতে বিক্রি হচ্ছে মৃগনাভি, শিলাজতু, ব্রাহ্মীবুটি, জড়িবুটি, গাছ-গাছড়া। গুণীজনেরা তা সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছেন পরম যত্নে। কেউ করতে পারে না জীবহিংসা এর কোলে

বসে। এখানকার নদীতে তাই দেখেছি মৎসকুলের নির্ভীক যাতায়াত।

হর-কি-পায়রী অর্থাৎ হরের চরণ ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে মহাশীর্ষ বা 'মহাশের' মাছ…পূণ্যকামী লোকেরা তাদের দুই হাতে আহার দেন….তারা সযত্নে পালিত হচ্ছে বহুদিন ধরে।

এই ব্রহ্মকুণ্ড হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান…এইখানেই প্রথম হর-কি-পিয়ারী গঙ্গা নামেন শিবের জটা থেকে ব্রহ্মার তপস্যায়। পূণ্যকামী জনতার কি ভীড়! একধারে চুপ করে বসে বসে দেখছি এই জনতার কলকোলাহল। পশ্চিমাদের হরদ্বার ও বাঙ্গালীর বারাণসী—যেন কোথায় নিবিড় যোগ আছে!

যাত্রীরা এসেছেন দলে দলে নানা কামনা নিয়ে। কেউ করছেন পিতৃপিতামহের তর্পণ, কেউ বা আপন শিশুপুত্রের শিরমুণ্ডন অর্থাৎ শুদ্ধভাষায় চূড়াকরণ সংস্কার।

আমি বাঙ্গালী—গঙ্গার দেশের মানুষ। জলাভাবের কথা আমি ভাবতে পারি না। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-সরস্বতী, কত নদ, কত নদী শিরা-উপশিরার মত ছড়িয়ে আছে বাংলার বুকে—বাংলা নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু পশ্চিম—সে যে নদীবর্জ্জিত মরুময়। যদিও পঞ্চনদের জলধারা পাঞ্জাবের গা বেয়ে এসে মিশেছে সিন্ধুনদে—করাচি দিয়ে সে নদ গিয়ে মিলেছে মহাসমুদ্রে। বাংলা শস্যশ্যামল—পশ্চিম বন্ধুর, রুক্ষ, রূঢ়। পশ্চিমের রীতি—এরা মৃতের অস্থি কুড়িয়ে রাখে এই ব্রহ্মকুণ্ডে বিসর্জনের আকাঙ্খায়। নতুন মৃৎপাত্রে তুলসী মঞ্জরী দিয়ে লাল নতুন কাপড়ে বাঁধা কত যে এমন নশ্বর জীবনের শেষ বিসর্জন দেখলুম বসে বসে। কত মানবের শেষ চিহ্ন শীতল-জাহ্নবীর কোলে চিরসমাধি লাভ করছে….তাদের অস্থিতে অস্থিতে জীবনের যে দাহন, সেই দাহন বুঝি জুড়িয়ে যাচ্ছে এই পূত জাহ্নবীর

জলতলে···তুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে কারো···কেউ বা এনেছেন একাধিক অস্থি, তাঁরা হয়ত এসেছিলেন তীর্থে—যারা গরীব বা অক্ষম, আসতে অপারগ, এমন প্রতিবেশী বা পরিচিতের অনুরোধে এনেছেন তাদের প্রিয়জনদের অস্থি এই পুণ্যভূমিতে বিসর্জন দিতে। সঙ্গে পুরোহিত আছেন—মন্ত্রোচ্চারণ, দান ও পুণ্য সহকারে শেষ সংকার হচ্ছে। অস্থির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে নবরত্ন, সোনা-রূপার কুঁচি, এই নাকি প্রথা। লোভী অগ্রদানী ব্রাহ্মণের দল খুঁজে মরছে সেই রত্ন জল তোলপাড় করে, তুই পায়ে মৃতের অস্থি দলিত মথিত করে···হায়রে মানবতা। জনতা কিছু কমতে চেয়ে দেখি ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে তুটি পশ্চিমা ছেলে-মেয়ে। কেমন বিষণ্ণম্লান। ছোট ভাইটি শুধায়···"ছোটি বহিন কি হড্ডিয়াঁ ভি য়াঁহি হৈ না? বড় বোনটি জবাব দেয়, "হাঁ ভইয়া···

"তো য়হাঁ গোড় ন ধরি?"

"নহিঁ ভইয়া····"

"পানি মাথে মে লিঁ?"

"হাঁ ভইয়া।"

চেয়ে দেখি বড় বোনটির চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে বুকের বসন ভিজিয়ে দিয়েছে। চেয়ে আছে সামনের পানে উদাস দৃষ্টি মেলে। সুখ-তুঃখ-মিলন-বিরহময় জীবনের একখানি পরিপূর্ণ ছবি চোখের সামনে জেগে উঠল। হৃদয়ের অশান্ত বিরহী হা-হা করে মরতে লাগল—সত্যই ত যেখানে সহস্র সহস্র মানবের নশ্বর দেহের শেষ এসে মিলেছে—অসংখ্যের অস্থি এসে যে ব্রহ্মকুণ্ডে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সেখানে কি পা ডোবানো চলে? সে মাথায় নেবারই সামগ্রী। সেই উদাসী মধ্যাহ্নে স্তব্ধ মন বারবার জন্ম-মৃত্যুর রহস্য হাতড়ে মরতে লাগল!

আবার সেই ব্রহ্মকুণ্ড—দেখেছি সকালে দিনের ছবি, কলকোলাহল মুখর, মধ্যাহ্নের রৌদ্রদাহে নীরব স্তব্ধতা, আর সায়াহ্নের কোলে সেই জনতারই অন্য রূপ। এ জনতা উৎসবমুখর।

গঙ্গার উপর দিয়ে ছোট একটি সেতু ব্রহ্মকুণ্ড পার হয়ে গঙ্গার মাঝ বরাবর খানিকটা বাঁধান জায়গায় এসে মিশেছে—চতুর্দিকে জল আর মাঝখানের এই বাঁধান জায়গাটি সত্যই মনোরম। কোথাও বা দুটি মুগ্ধমন নিভৃত আলাপন জুড়ে দিয়েছে। এই সব-ভোলানো সন্ধ্যায় দখিণা বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাদের এলোকেশ, চূর্ণ কুন্তল। এক জায়গায় বসেছে রামায়ণ গান—

"চিত্রকূটকে ঘাট পর
ভয়ী সন্তন কি ভীড়
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে
তিলক দেত রঘুবীর।"

একটু পরেই আরম্ভ হবে গঙ্গার আরতি ব্রহ্মকুণ্ডের হর-কি-পায়রী ঘাটে—দূর দূর থেকে এসেছে কত যাত্রী এ আরতি দর্শনে—ভক্তিপ্রণতা মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন দর্শনাকাঙ্খায়। আরতির ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল, যে যেখানে ছিল স্তব্ধ হয়ে মুখ ফেরালো ঘাটের দিকে। গঙ্গামন্দিরের সামনের চাতালে হর-কি-পায়রী ঘাটের ওপর এসে দাঁড়ালেন পুরোহিতের দল……শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টারবের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রদীপের ঝাড় নিয়ে… বড় বড় চামর হাতে সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে চললো গঙ্গার আরতি বহুক্ষণ ধরে। মুগ্ধমন তাকিয়ে দেখল এই দেবতার আরাধনা—সন্ধ্যার এই মিলিত বন্দনায় সেও তার প্রাণের প্রণাম নীরবে নিবেদন করল সেই অজানার পায়ে, যাঁকে জানবার সাধনা চলছে যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের মনে…

"রঘুকুল কমল দিবাকর হো
হে রাম তুম্‌হারি জৈ হোবে"।

এক সুকণ্ঠ সৌম্যদর্শন গায়ক তাঁর গানের আসর জমালেন। চারিধারে আস্তে আস্তে এসে জমলো মুগ্ধ জনতা। সর্বভারতীয় ব্যাপার…পাঞ্জাবের লোক আছেন, হিন্দুস্থানী, বিহারী, ইউ,পির লোকও আছেন, আছেন মাদ্রাজী, মারাঠী ও গুজরাটি, বাঙ্গালীও এসে জুটেছেন—এসে জুটেছেন সুদূর নেপাল থেকে নেপালী, আছেন পাহাড়ী—বিভিন্ন ভারতবাসী এক মহাতীর্থের কোলে এসে একই ভাবনায় এক হয়ে গেছেন। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত গেয়ে চলেছেন কথকঠাকুর। রাত্রি ক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল…গান গেল থেমে। আমি বসে আছি সামনের দিকে চেয়ে শূন্যতার মধ্যে শূন্য দৃষ্টি মেলে…ধীরে ধীরে সেই শূন্যতার বুকে আমার মানসনেত্রে ফুটে উঠল আর একদিনের ছবি। বৃন্দাবনের আখড়ায় আসর জমেছে, আমিও ঠাঁই পেয়েছি এক কোণায়….রাধা গান করছেন,

"হুঁহুঁ ক্রোড়ে হুঁহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

গান শেষ হয়ে গেছে…নীরবে রাধার পানে চেয়ে কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কেটে গেছে জানিনা। বাস্তব জগৎ, এ সংসার, লোক-লাজ, বিশ্ব-চরাচর সব যেন আমার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেই জনতার মাঝখানে আমার ভীরু তন্ময় মন কি চেয়েছিল?

সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠেছিলো—অসুরদের ছলনায় ভুলিয়ে সে অমৃতকুম্ভ নিয়ে দেবতারা হয়েছিলেন পলাতক—কুম্ভ ছাপিয়ে কয়েক বিন্দু অমৃত এ বসুন্ধরার বুকেও পড়েছিল। সেই কয়টি বিন্দুর একটি বিন্দু নিয়ে এ হরিদ্বার অমৃতময় হয়ে গেছে। সেই মহাপুণ্যভূমি হরিদ্বারের বুকে ভোর হচ্ছে…ঘাটে বসে

বসে শুনি কোন সে আদিকালে কে যেন বলছে, "ও উষা! উষা ওঠ! ভোর হল যে, এখনি অরুণ আসবে তার সপ্ত ঘোড়ার রথ চালিয়ে সূর্য-সারথি হয়ে···তুমি কি জাগবে না?"

আকাশ জুড়ে আরম্ভ হয় আলোদেবতার দুরন্ত মাতামাতি পলাতকা প্রিয়ার অনুসরণে····থামো! থামো! ওগো জীবনের দূত! শুনছ নাকি?

চরণধ্বনিটি ও আগমনীর
নীথর মাটিরে করিল অধীর।
নিদ্রিত বীজ হল চঞ্চল
হেরিয়া আলোর তূণ।

ঘুমন্ত জীবন-জাগার কলকোলাহল দিকে দিকে জাগিয়ে এল দিনের অধীশ্বর। লোকালয়ে লোকালয়ে কর্মব্যস্ততা····কিন্তু বন-বনান্তে ও কি শোনা যায়?

শাখা পল্লবে ওঠে হায় হায়।
পাগল পবনে বারেক শুধায়,
যৌবন ধন এই তনুমন
সঁপিব কাহার কাছে?

এ কি ব্যাকুল প্রশ্ন দিকে দিকে?
কিন্তু, হে সূর্যদেব! চেয়ে দেখি·······

তুমি কাছে আসি
মুখে মৃদু হাসি
নিবিড় আলিঙ্গনে
ছড়ালে তোমার রবিকরজাল
ধরণীর বনে বনে····

ভরে উঠল বিশ্বভুবন এই চরাচর তোমার অমৃতময় আশীর্ব্বাদে।

ব্যাকুল মন বলে—কোথায় হারাল আমাদের সেই ঋষির আশ্রম, শান্ত তপোবন? আজ সে কি শুধুই স্মৃতি, শুধুই পুরাণ-কাহিনী?

হে অতীত, কথা কও।

ভোরের হাল্‌কা হাওয়ায় এগিয়ে চলেছি লোকালয় জনারণ্য ছাড়িয়ে। দুই ধারে পড়ে বনতুলসী, আকন্দ ও ধুতুরার গাছ। বনতুলসীর গন্ধে পাগল বাতাস মন মাতিয়ে তোলে···কাঁচা সিদ্ধির এখানে অজস্রতা, সিদ্ধির জঙ্গল হয়ে আছে পথের দুই ধারে···হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তার মনমাতান গন্ধ। জাগরণের আনন্দে উড়ে চলে এখানে ওখানে পাখীর দল। সারা-রাতের বিশ্রাম-পাওয়া ডানায় তাদের এসেছে নতুন উদ্দামতা।

আর এক কথা—হিন্দুতীর্থ মাত্রেই দেখেছি বাঁদর বা হনুমানের ভীড়। সত্যই কি এর সঙ্গে রামায়ণের রামদাসের কোনও সংস্রব আছে?

কি তাদের অসহ্য উৎপাত। এই দেখেছি কাশীতে, তাই দেখলুম বৃন্দাবনে, আর তাই দেখছি এই হরিদ্বারের বুকে।

ধ্বংসেরও বুঝি একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে···আছে একটা আপন রূপ। পথে পড়ল এক ভগ্ন স্তূপ···এক ভাঙ্গা মন্দির। আজ আর মন্দিরত্ব কিছু নেই; শ্রীহীন সে দেউল।

"কত উৎসব হইল নীরব কত পূজানিশা বিগতা।" ভাঙ্গা ঘাটে চুপচাপ গিয়ে বসে পড়লুম। কলনাদিনী গঙ্গা আপন উচ্ছল ধারায় বয়ে চলেছেন যেন দিক্‌ভ্রান্তা। তাকিয়ে দেখছি চারিধার—হঠাৎ কিছু দূরে জলের মধ্যে হুল্লোড় উঠল····মনে হল কালো কালো বেড়ালের মত কারা যেন জলে ঝাঁপ দিয়ে জল তোলপাড় করছে। কৌতুকবিহ্বল মন এরা কী জানতে চাইল··· চুপে চুপে শিকারীর মত নিঃশব্দ পায়ে কাছে গিয়ে দেখি, আরে!

এ যে ভোঁদড়ের পাল মাছের ঝাঁককে তাড়া করে ফিরছে প্রকৃতির সহজ তাড়নায়। কে বলে হিংসা নেই হরিদ্বারের আকাশে বাতাসে ?

হে রুদ্র ! হে ধ্বংসের দেবতা ! কোনও না কোনও রূপে তুমি আছ সর্বত্র নিত্যকালের বুকে পরম সত্য হয়ে ! এদের চঞ্চলতা অন্তরের চিরশিশুকে জাগিয়ে দিল···সেই ভাঙ্গা ঘাটে জামা-কাপড় রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লুম জাহ্নবীর জলে। বেচারারা হঠাৎ তাদের জল-কেলিতে বাধা পেয়ে ভয়চকিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে পালিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে যাই—মনে আমার আনন্দ ধরে না দেখে। একাই কতক্ষণ জলে কেটে গেল। হরিদ্বারে এসে এমন করে স্নান করা একদিনও হয় নি। ঘাটে উঠে মনে হল বড় ক্ষিধে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি পা চালালুম সহরের দিকে। গরম গরম পুরীর গন্ধ যেন অদৃশ্য বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই সঙ্গে রকমারি আচারের গন্ধে সত্যই জিভে জল আসে। কত রকম যে আচার দেখেছি এই হরিদ্বারে···এত আচার-মোরব্বার রকম ফের বুঝি আর কোথাও নেই····তবে বাংলার বীরভূমও এ বিষয়ে কম যায় না। বাঁশের কচি শিকড়ের আচার-মোরব্বা এদের অতি প্রিয়—আর প্রিয় খাদ্য ভ্যাঁর তরকারি। প্রথমটা বুঝতে পারিনি এই ভ্যাঁ বস্তুটি কি····অনুসন্ধানে জানলুম পদ্মের শিকড় বা যে অংশটি মাটীর তলায় থাকে এ তাই···· সমস্ত পাঞ্জাবে তথা সুদূর কাশ্মীরিদেরও এ অতি প্রিয় ভোজন সামগ্রী। আমরা শুধু পদ্মের মুড়ি শিশুদের খেতে দেখি··· আর জানি পদ্মমধু। এরা পদ্মের আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত খায়। পদ্মের শুক্‌নো মুড়ি বা বীজ এদের মূল্যবান ওষধি। ঠাণ্ডাই অর্থাৎ গ্রীষ্মাতপনাশক পানীয় হিসাবে এই পদ্মমুড়ির ব্যবহার। এরা একে বলে “কওল ডোডা”। মসৃণ কুলের বিচির মত ওপরের কালো খোসাটি ফেলে ভেতরের সাদা শাঁসটি নেওয়া হয়—তারপর

বাদাম, মিছরী ও এলাচগুঁড়ো সহকারে অতি উপাদেয় সরবত তৈরী হয়....এ নাকি পশ্চিমের বহুবিদিত 'লু' বা তপ্ত হাওয়ার মন্দ ফল নাশ করে। 'লু'র আর এক মহৌষধ কাঁচা পেঁয়াজ...প্রায়ই দেখা যায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলেদের গলায় এই পেঁয়াজের মাদুলি ঝুলতে। এই পশ্চিমাদের আর এক প্রিয় খাদ্য কচি শিমূলকুঁড়ির ডালনা.... খেতে মন্দ লাগে না, নতুনত্ব আছে। পানিফল বা সিঙ্গাড়ার আটার প্রচুর প্রচলন এই হরিদ্বারে। আমাদের যেমন পটলের প্রাচুর্য্য দোকানে দোকানে—এদের তেমনি ঠিণ্ডার...পাঞ্জাবীদের দৌলতে আজকাল কলকাতার বাজারেও এর প্রায়ই দর্শন পাওয়া যায়। এদের আর এক প্রিয় খাদ্য রায়তা। এমন তরকারি নেই যার রায়তা এরা করে না। এমনিতেই এরা একটু পাকৌড়ির ভক্ত। বিশেষ করে, পালংশাকের পাকৌড়ীতো এরা নিমন্ত্রিতকে খাওয়ায়। কচনারের রায়তা এদের খাদ্যতালিকায় আভিজাত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। ছোট ছোট ভায়োলেট রংয়ের ফুল—গাছটি আমাদের শিউলির মত....পাতা খানিকটা গোল গোল, যেন সবুজ রংয়ের গরুর পায়ের ছাপ, ঠিক ঐ রকম মাঝখানটা কাটা। সবুজ ঝাঁকড়া গাছটি যখন ভায়োলেট রংয়ের ফুলের অজস্রতায় ছেয়ে থাকে, তখন দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। তলার শ্যামল মাটীও ছেয়ে থাকে ঝরা ফুলে। 'যস্মিন দেশে যদাচার'—যা এদের সহজলভ্য তাই দিয়েই খাদ্যে রকম ফের করেছে। মিষ্টান্নে এরা বড় কিছু রকম ফের জানে না। লড্ডু, পেড়া, বরফি, কলাকন্দ...ছাঁচি কুমড়োর মিষ্টান্ন বা পেঠেকি মেঠাই এদের বড় প্রিয়। রাবড়ি অতি উত্তম। মিষ্টি দই এরা খেতে জানে না। টক দই বা খট্টি দহি নুন ও লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েই খেতে অভ্যস্ত। ঘোল বা লস্যি এরা প্রায়ই খায়, তবে চিনিবর্জ্জিত। পায়েস-পরমান্ন বড় একটা বোঝে না। ধনীগৃহে পাবেন ফিরনী বা ঘন দুধে চালের গুঁড়ো দিয়ে জমানো এক রকম

পায়েসেরই মত....তার ওপর দেখতে পাবেন গোলাপের পাপড়ী। হয়ত বা এর প্রথম আগমন মোগল আমলে, তাই অঙ্গে এই বসরাই সৌখিনতা। পাবেন সেমিয়ার পায়েস, সেমিয়ার হালুয়া। জলযোগে প্রায়ই পাবেন পঞ্জিরী অর্থাৎ আটা-চিনি-মেওয়াসহ ঘিয়ে ভাজা—খেতে উপাদেয়....একবার তৈরী করে ছয়মাস ধরে খাও, নষ্ট হবার উপায় নেই। নিমন্ত্রিত হলে মাঝে মাঝে পাবেন মিঠা চাওল অর্থাৎ মিষ্টি ভাত। সীতাভোগেরই এক সংস্করণ বলতে পারেন। পোলাও-কালিয়া এরা বোঝে না, ভাতও খায় না রোজ—কালে ভদ্রে ইচ্ছে হলে খায়, নয়ত চাপাটি-পুরীই এদের প্রধান খাদ্য। আপনারা আমায় হয়ত পেটুক ভাবছেন, কিন্তু তা নয়! আহার আমাদের জীবনধারণের, আমাদের সভ্যতার পরিবাহন—একটা দেশকে, একটা জাতিকে জানতে হলে তার সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গেই তার খাওয়া-পরার খবরও রাখতে হবে। খেয়েছেন কখনও হিন্দুস্থানীর ঘরে 'কড়ি কি তরকারি'? আর তেঁতুলের বা আমচুরের কাই ছড়ানো 'আলু কি ভুজিয়া'? মুখ ছেড়ে যাবে বিশ্বাস করুন! পথে চলতে কয়েকটি বাঁশঝাড়ের কাছে এসে পড়লুম। কতগুলি ছেলেমেয়ে মাটীর হাঁড়ি হাতে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় যেন কি খুঁজছে। "কি রে তোরা কি খুঁজছিস?" "কোঁড় জমা রহেঁ বাবুজী"- বাঁশের এক একটি কচি শিকড়ের মুখ বার করে হাঁড়িতে পুরে বন্ধ করে দিচ্ছে। আবার আগে যে হাঁড়িটি দিয়ে গিয়েছিল সেটি খুঁজে বার করছে। পুরোনো হাঁড়ীগুলি কচি শিকড়ে ভরে গিয়ে কোন কোনও হাঁড়ী ফাটিয়ে দিয়েছে। সহজগতিতে কেমন বিঁড়ের মত গোল আকার ধারণ করেছে। এইগুলি এরা কেটে নিয়ে যাবে আচার বা মোরব্বা করবার জন্য। খাবার জন্য মানুষের কত না পরিশ্রম, কত না বুদ্ধি খাটান....জীবনের সব চেয়ে বড় তাগিদ বুঝি এই বেঁচে থাকার তাগিদ।

আনমনা এগিয়ে চলেছি, মাথার ওপর সূর্য্য প্রখরতর হয়ে উঠেছে···সামনে পড়ল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। প্রত্যেকের কোঁচড়ে কিছু-না-কিছু সঞ্চয়। "ওরে তোরা কি নিয়ে যাস?"—কারো কাছে কাঁচা ব্রাহ্মীশাক, কারোর বা কোঁচড়ে সদ্য-তোলা খুম্বা···গঙ্গার ধারে ধারে এমন হয়ে আছে অঢেল। শুধু চিনে নেওয়া, শুধু সঞ্চয় করে নেওয়া। খুম্বা—যাকে ইংরেজীতে বলে Mushrooms—এরা তার বড় ভক্ত···আসাম বা চট্টগ্রামবাসীর সুঁটকি মাছের উৎসব আর কি। পোড়ো বাড়ীর আনাচে-কানাচে, ইটখোলায়, জলের ধারে প্রায়ই এরা হয়ে থাকে। সাদা ধবধবে রং, আলনার খুঁটীর মত। ছোট বড়, নানা আকারের। কেউ বা পেয়েছে অনেকগুলি, কেউ বা অল্প। এগুলি ঠিক ছত্রাক নয়, কাজেই বিষাক্ত কিনা তা নিয়ে নেই ভাবনা। পরমানন্দে এরা তাদের সঞ্চয় নিয়ে ফিরছে—হয়ত বা নিজেরাই খাবে, নয়ত বেচে দেবে। এখানে খুম্বা খুবই দামে বিক্রি হতে দেখেছি বাজারে। পরম যত্নে দোকানী মালার আকারে গেঁথে সাজিয়ে রেখেছে দোকানে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের আশায়। তা ছাড়া Mushrooms তো সৌখীন মহলেও বিশেষ পরিচিত—সযত্নে এর চাষ হয়।

সহরে পৌঁছতে মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল—পরমানন্দে ভোজন সমাধা করে মন্থর পায়ে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেছি—ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, কেমন যেন এক একান্ত অনুভূতিহীন অবস্থা। সমস্ত দেহমন যেন ভারমুক্ত হয়ে গেছে। পথে কতই না ঘাট পড়ছে, কত না মন্দির, ভজনালয়, অতিথিনিবাস। একটি ছায়াশীতল বাঁধানো ঘাটে নিশ্চিন্ত চিত্তে শুয়ে পড়লুম। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলনাদিনী গঙ্গা। ঠাণ্ডা বাতাসে দেহমন জুড়িয়ে গেল। ক্লান্ত আমি পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লুম। কখন দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারি নি—হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল আরতির

শঙ্খধ্বনিতে। চেয়ে দেখি ঘাটের দেবালয়ে আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে···আরম্ভ হয়ে গেছে সন্ধ্যার বন্দনা। ভক্তের দল একটি দুটি করে এসে জমছেন। ধূপ-ধুনার গন্ধ ফুল-বিল্বদলের গন্ধে মিশে আমোদিত করে রেখেছে সন্ধ্যার মন্দমধুর বাতাসকে। মন আপনি উন্মনা হয়! এ শুচিতায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়!

আরতি শেষ হয়ে এল···ভক্তিপ্লুত প্রণাম নিবেদন করে জনতা স্তব্ধ হয়ে বসল দেবতার আশীর্বাদের আশায় শান্তিজল নিতে··· সুললিত কণ্ঠে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছেন

"ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তি
রাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ,
সা মা শান্তি রেধি॥"

দ্যুলোকে অন্তরীক্ষে পৃথিবীতে শান্তি আসুক—সকল দেবগণে, ব্রহ্মে ও নিখিল চরাচরে শান্তি আসুক···জলে, ঔষধিতে, বনস্পতিতে শান্তি আসুক, সর্ব্বত্র শান্তি হউক, শান্তি হউক এবং সেই শান্তি আমাতেও আসুক····সন্ধ্যার এই বিশেষ লগ্নে এ প্রার্থনা যেন সহস্র হৃদয় থেকে উত্থিত হয়ে ঊর্দ্ধপানে মহাব্রহ্মে লীন হয়ে গেল। ধ্যানমুগ্ধ ব্রাহ্মণ বলতে বলতে চললেন···

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেবাবিশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর ঐ জগৎ এবং দৃশ্যমান এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মদ্বারা পূর্ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতেই অখিল জগৎ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ সৃষ্টি আসিলেও পূর্ণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট

থাকেন। পুরোহিত চলে গেলেন দৃষ্টির বাইরে···তাঁর কণ্ঠও গেল থেমে, তবু যেন আকাশে বাতাসে অনুরণিত হতে লাগল

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ভোরের পাখী তখনও জাগেনি—সুরু হয়নি কলকাকলি বন-বনান্তে। আকাশের গায়ে তখনও জেগে আছে শুকতারা। কনখলের নির্জন ঘাটে এসে দাঁড়ালুম। কেদারখণ্ডে হরিদ্বারকে বলা হয়েছে মায়াক্ষেত্র··তার প্রধান স্থান মায়াপুর বা এই কনখল। ভারতের সপ্তপুরীর এক পুরী। হরিদ্বার ও কনখলের মাঝে পড়ে প্রসিদ্ধ গঙ্গানহর····ঋষিকুল, গুরুকুল প্রভৃতি আশ্রম। হরিদ্বারের পাণ্ডাদের নিবাস এইখানেই। কোন গত যুগের প্রহরীর মত আধো অন্ধকারের কুহেলিকায় দাঁড়িয়ে আছে দক্ষরাজার অতি পুরাতন মন্দির। পৌরাণিক এ দেবস্থানে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ মন ভেবে চলে—এইখানেই কি হয়েছিল দক্ষযজ্ঞ? সতী কি পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেছিলেন এইখানেই? তাণ্ডব-নাচ নেচেছিলেন সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এইখানেই কি ভোলা মহেশ? সৃষ্টি যে বিনাশ হয় ক্ষ্যাপার উন্মাদনায়। চতুর চক্রী কৃষ্ণকে তাই চক্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করতে হয়েছে সতীর দেহ····গড়ে উঠেছে বাহান্ন পীঠ ভারতের বুকে। আনমনা এগিয়ে যাই মন্দির ছাড়িয়ে। শ্মশানভূমি মহাশূন্যতা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে অসীম আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে। কি বৈরাগ্যময় নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত রূপ। "দরদী মন কেন উদাসী হতে চায়।"

উপল চপল পায়ে নেমে এসেছে চঞ্চলা জলধারা—ত্রিধারা এসে মিশেছে এখানে অপূর্ব রূপ নিয়ে চল্ চল্ ছল্ ছল্—কোথায় চলেছে এ উন্মাদিনী নীলধারা? পিছনে ধূসর পর্বতমালা আকাশের

পটে মিলিয়ে গেছে...তারই অন্তরালে বুঝি এর রহস্যময় জন্মস্থান? বিস্ময়বিমুগ্ধ মন বারবার উচ্চারণ করল,

"অজাত ইত্যেবং
কশ্চিত ভীরুঃ মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥"

জনম-মরণের অতীত হে দেবাদিদেব! হে মহারুদ্র! তোমার দক্ষিণ মুখ যা অভয় বিতরণ করে...তোমার সেই হাসি ভরা মুখে আমায় অভয় দাও। আমায় পালন কর। এই জন্ম-জরা-মরণভীরু আমি তোমারই শরণাগত। ভারমুক্ত মন সব বোঝা ফেলে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়...পেছনের পথ থাক্ পেছনে পড়ে। তার সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনের ইতিহাস নিয়ে। মন আজ এই মুক্ত আলোয় মুক্তিস্নান করুক্—এগিয়ে যাক্ মহাশান্তির পথে।

হে সূর্যদেব ওঠ! ত্বরা কর! হে পুষণ অপাবৃণু—তোমার আবরণ উন্মোচন কর! হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিত্যং মুখম্, তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলদ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখ ঢাকা রয়েছে! হে পুষণ! সত্যই আমার ধর্ম, আমি যেন সত্য স্বরূপ তোমাকে দেখতে পারি। আমার সমস্ত মোহ, সমস্ত অজ্ঞানতা দূর হয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশ হোক। ভয়-বিস্ময়-বিহ্বলতার তমসা-জাল ছিন্নভিন্ন করে আমায় পথ দেখাও। আমি বিভ্রান্ত।

—অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়—

অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতত্বে লইয়া যাও।

পথিক ফিরে এল ঘরে—ফিরতে তাকে হবেই। মাথায় প্রখর রৌদ্রদাহ, জঠরে ক্ষুধার জ্বালা। ভোলাগিরির আশ্রমের একতলার একটি ঘরে এখন তার আশ্রয়। সেইখানেই ফিরে এলুম পথশ্রান্ত আমি। আমাদের আশ্রয় না হলে কি চলে না? এক আশ্রয় ছাড়ি, আবার আশ্রয় গ্রহণ করি। সে আশ্রয়ও ছেড়ে চলি অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে। ঘর ও পথ দুই মিলিয়েই যেন আমাদের জীবন সমন্বয়।

ধর্মশালার ঘরে অলস আলস্যে পড়ে আছি···অপরাহ্নের তন্দ্রাচ্ছন্ন স্তব্ধতাকে সচকিত করে হঠাৎ সামনের ঘর থেকে দারুণ বচসার কলকণ্ঠ শোনা যায়। এক পলিতকেশা বৃদ্ধা এসেছেন তীর্থে···একমাত্র মাতৃহীন নাতিটীকে বাহন করে—কিন্তু মনকে করতে পারেন নি তীর্থবাসী। এখানেও সেই চিরন্তন ঘরকন্নার চিন্তা, নিত্য সুখ-দুঃখের পরম বন্ধন। এই সব তীর্থযাত্রীদের দেখলে মনে হয়—জীবনের আর পাঁচটা নিত্য অবশ্যকরণীয় কর্মের মধ্যে এও তাঁদের একটি। তীর্থে মাঝে মাঝে না এলে, এই হরিদ্বারের গঙ্গায় দুটো ডুব না দিলে তো পাপ ধৌত হবে না—আপন সমবয়সী সমাজে মানই বা রাখবেন কি উপায়ে। উপস্থিত বচসা নাতির বিবাহ নিয়ে—এই পুণ্যভূমিতে ধর্মশালার ঘরে বসে ঘটকালির কচ্‌কচি না করলেই কি নয়?

উপযুক্ত স্থান-কাল বটে!

থেকে থেকে একটি স্নেহপীড়িত মনের স্নেহপাত্রের মঙ্গলকামনায় উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে এ অপরাহ্নের উদাসী প্রহর আমার কাছে আরও উদাস হয়ে উঠল। মেয়েরা বুঝি যুগে যুগে এমনই করেই স্নেহ দিয়ে অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুরুষকে বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন, আর এই স্নেহ-কাতরতার সুযোগটুকু নিয়ে পুরুষ বুঝি চিরকাল মিথ্যা আস্ফালনই করে এসেছে।

শুয়ে থাকা আর হল না, শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লুম।

ওঘরে দিদিমা ততক্ষণে কাকুতি-মিনতি, বাবু-বাছা থেকে গালাগালিতে গিয়ে পৌঁছেছেন।

"লক্ষ্মীছাড়া! আজ যে বড় তোর মুখ হয়েছে দেখি—যখন মা এক মাসেরটি ফেলে পালিয়েছিল, তখন এ হিম্মৎ ছিল কোথায়?

অপর পক্ষ তার স্বরে জবাব দিল, "তা মানুষ করেছো হয়েছে কি—মাথা কিনে নিয়েছো নাকি? তোমার সই-টইয়ের কথা ও সব আমি বুঝি না—আমার টাকা চাই, টাকা—স্রেফ্ টাকা বুঝলে!

কি দুর্বিনীত—ইচ্ছে হতে লাগল একটি চড়ে মুখ বন্ধ করে দি—কিন্তু ঐ দিদিমাই তখন আমার প্রতি মারমুখী হয়ে তেড়ে আসবেন।

যাই হোক্ অসার সংসারে সার কথাটি বুঝেছে ছোক্‌রা—জীবন নদে রাজহংস, জল ছেঁকে দুধটুকু পান করতে চায়, রাখতে চায় না মনের বালাই, মানবতার বিড়ম্বনা। ঘাটের দিক থেকে উঠে এলেন এক সৌম্যদর্শন সাধুপুরুষ—স্মিত হাস্যে শুধালেন, "কবে এসেছেন? আপনাকে তো আগে দেখিনি—"

পিছনে পিছনে এগিয়ে চললুম, আবার প্রশ্ন হল—

সন্ন্যাসী নাকি? কোন সম্প্রদায়ের?

এঁদেরও দলাদলি, গোত্র-সম্প্রদায়। সন্ন্যাসীকে নাকি দশনামীর এক পর্য্যায়ের হতেই হয়। বললুম, কোন সম্প্রদায়েরই নয়....উপস্থিত যাযাবর।

আবার প্রশ্ন হয়—তা করা হয় কি?

কিছুই না—ভবঘুরে।

চলে কি উপায়ে?

মনে মনে বললুম, আপনি না সন্ন্যাসী...অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে এ ঔৎসুক্য কেন?

কথায় কথায় দোতলায় পৌঁছে গেলুম···সুন্দর প্রশস্ত বারান্দার সামনে সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরখানি—কে বলে এ সন্ন্যাসীর গৃহ! বিছানা, পর্দা, বই-পত্র ইত্যাদি সব মিলে মিশে একটি সৌখীন মানুষের পরিচয় দেয়। রূপার গ্লাসে মিছরীর সরবৎ খাওয়ালেন। সৌখীন মোরাদাবাদী মিনার কাজ করা ডিবেতে এলাচ ও হরিতকির টুকরো—কথায় কথায় বললেন, সবই নাকি কোনও না কোনও শিষ্যার দেওয়া—আমাদের মেয়েরা নাকি বড় ভক্তিমতী। সন্ন্যাসীদের প্রতি বুঝি বা মেয়েদের গোপন আকর্ষণ আছে সহজাত শ্রদ্ধার আকারে। ঘরকে উপেক্ষা করে, মানে তাদের উপেক্ষা করে চলে আসে যে পুরুষ, তার প্রতি গোপন কৌতূহল থাকাটা মেয়েদের খুবই স্বাভাবিক। হয়ত বা এ তাঁদের ভক্তির ছলে গোপন প্রতিশোধ। সহজাত প্রবৃত্তির দুর্নিবার আকর্ষণে সৃষ্টির কোন আদিকাল থেকে নর ও নারী পরস্পর পরস্পরকে পেতে চাইছে সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে। সহজ পথ যারা ছেড়েছে—বিকৃত পথে ছলনার আবরণে তাদের সে প্রবৃত্তি মাথা তুলে দাঁড়ায় সৃষ্টির আদিমতম তপস্যায়।

বহুক্ষণ আলাপচারী হল। ভদ্রলোক বাস্তবিকই পণ্ডিত। অধ্যয়নে বহুদিন ব্যয় করেছেন—শাস্ত্র-সমুদ্রপারে সগৌরবে উত্তীর্ণ। জীবনের প্রতি সহজ দৃষ্টি আছে। দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর উদার, জীবন-দর্শন তাঁর ভাবাবেগমুক্ত, সমন্বয়ধর্মী। বাইরের আচরণে কি আসে যায়, মন যদি তোমার সত্যকার নির্বিকার করতে পারো, বললেন কথায় কথায়। অতি সত্য কথা—মহাশয়ের নাম ব্রহ্মানন্দ ভারতী। শঙ্কর মঠের অনুগামী। চার ধামে শঙ্করের চারটি মঠ আছে। পুরীতে গোবর্দ্ধন, দ্বারকায় সারদামঠ, মহীশূরের কাছে শৃঙ্গেরীমঠ, আর এই কেদার-বদরীর পথে যোশী বা জ্যোতির্মঠ। এই মঠ চারটিকে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও সম্প্রদায়ে বেঁধে দিয়ে গেছেন শঙ্কর। সারদামঠে সামবেদ, গোবর্দ্ধনে ঋগ্‌বেদ, যোশীমঠে অথর্ব্ববেদ ও শৃঙ্গেরীমঠে

যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য। 'তত্ত্বমসি' 'প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই চারিটি মহামন্ত্রই চারিটি মঠের অবলম্বনীয় জ্ঞানধারা। সারদামঠের সন্ন্যাসিগণ তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়ের, গোবর্দ্ধনের সন্ন্যাসিরা বন ও অরণ্য, যোশীমঠেররা গিরি, পর্ব্বত ও সাগর এবং শৃঙ্গেরীমঠেররা সরস্বতী, পুরী, ও ভারতী সম্প্রদায়ের। ব্রহ্মচারীদেরও চার মঠে চার উপাধি দিয়ে গেছেন শঙ্কর। যথা, সারদামঠে 'স্বরূপ', গোবর্দ্ধনে 'প্রকাশ', জ্যোর্তিমঠে 'আনন্দ' ও শৃঙ্গেরীমঠে 'চৈতন্য'। আজ হাজার বছর ধরে তাঁর অদ্বৈত মত ভারতের আকাশে বাতাসে বিস্তারিত। জীবনকে এঁরা দেখেছেন বৈরাগ্যের গেরুয়া রংয়ে রাঙ্গিয়ে। তাঁর এই মায়াবাদ কতটা শুভ ফলপ্রসূ বলতে পারি না, তবে মনে হয় এ পথ সহজ স্বচ্ছন্দ নয়—এড়িয়ে যাওয়া তো সহজ পন্থা! জীবনের দুঃখ সমুদ্র মন্থন করে সমস্ত হলাহল পান করেও যিনি শিবের মত নীলকণ্ঠ হতে পারেন তিনিই তো সত্যকার অমৃতের পুত্র! কে বলে শুধু জীবন-ভরা গরল, জীবন-ভরা দুঃখ? এ আমি স্বীকার করি না। এ সংসার অমৃতে ও বিষে মেশামেশি হয়ে আছে—অমৃত-গরলের সঞ্চয় সে তো কিছুটা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত। তপস্যা করতে হবে সেই সত্যের যা এনে দেবে দুঃখজয়করা অমৃত, জীবনের প্রাণপদ্মে। সন্ধ্যার দিকে ব্রহ্মানন্দজী ও আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। পথে চলতে নানা শাস্ত্রালোচনা, নীতি-কথা হচ্ছে। ভারতীজি দুঃখ করে বলছেন—কি বিকৃত রূপই না ধর্মের আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবতা এই ব্রাহ্মণকৌলিন্য সমাজে আজ রসাতলে ডুবতে বসেছে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনিই সত্যকার ব্রাহ্মণ। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ আজ কই? মানুষের মন, বিশেষ করে, সনাতনীদের মন আজ ঘোর অজ্ঞানতায় ডুবে আছে। মিথ্যা কুসংস্কারের বেড়াজালে জড়িয়ে জন্তুর মত আর্তনাদ করছে। কিন্তু তবু শেকল কাটবে না, দেবে না বাঁধন আল্‌গা করে। বিশেষ করে, এই পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েদের স্থান আজ বড় নিম্নমুখী, বড় অবমাননাময়। নারী আজ জড় বস্তুরমতই

ব্যবহার পাচ্ছে, মানুষের মত নয়। সে আজ সম্পত্তির সামিল, তার আদর অনাদর অধিকারীর ইচ্ছাধীন। কোথাও সে তাই দেবী, কোথাও সে ক্রীতদাসী। আজকের সমাজের যূপকাষ্ঠে কত যে নারীবলি দেখলুম সে আর কি বলব! সময় সময় মন আর্ত বেদনায় ভরে ওঠে! এ কিন্তু বেশী দিন চলবে না—চলতে পারে না। এই কথাই সাক্ষ্য দেয় যুগের ইতিহাস। মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারলুম না—বুঝলুম তাঁর সব কিছুর অন্তরালে সত্যকার একটি শুভশুচি, ন্যায়নিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মন আছে যা একান্ত ভাবেই মানবদরদী!

দুইজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় শান্ত সন্ধ্যার সে স্নিগ্ধ সৌম্যতা খান্ খান্ করে সামনের একটি বাড়ী থেকে আর্তনারী-কণ্ঠের চিৎকার উঠল—বিষিয়ে উঠল এ মহাতীর্থভূমির মৌনমহিমা। কোনও রমণীকে নির্দয় প্রহার করা হচ্ছে, আর হাহাকার তুলে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে তারই অসহায় করুণ আর্তনাদ। ভারতীজি থম্‌কে দাঁড়ালেন, ঘৃণায় তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হল—এই দেখুন বর্বরতার, বিকৃত বুদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ—জানেন যিনি উপস্থিত এই কুকর্মের নায়ক, সেই মহাপুরুষটি হচ্ছেন এই বিদ্যার্থীদের প্রাধান উপাধ্যায়। দস্তুরমত শাস্ত্রজ্ঞ। আচার্য উপাধি ভূষিত একটি পাষণ্ড। পরীক্ষকদের কমিটিরও একজন বিশিষ্ট সভ্য। কিন্তু ঐ এক জ্বালা, অপুত্রক, তাই পুন্নামনরক থেকে উদ্ধারের আকাঙ্খায় কত যে জীবন্ত নরক সৃষ্টি করলেন, তা আর বলি কত। পর পর তিনটি বিবাহ করলেন। বড়টি জীবিতা আছেন—তিনি শুনেছি অত্যন্ত সহনশীলা, ভোর থেকে নীরবে এই চণ্ডাল পতির সেবা করে যান। মন তোষণ করে চলেন, তাই আজও নির্বাসিত হন নাই পিতৃহীন পিত্রালয়ে। মাঝেরটি নাকি একটু আত্মসচেতনা ছিলেন, তাই এই বৃদ্ধের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়িয়েছেন। এই তৃতীয়াটিকে কিছু দিন হল

কোথা থেকে বিবাহ করে এনেছেন। মেয়েটি নিতান্তই নাবালিকা, উদ্ভিন্ন-যৌবন সুন্দরী। তাই হয়েছে তার অপরাধ, বৃদ্ধের মন সদাই সন্দিগ্ধ। শুনেছি যে প্রায়ই ঘরে তালা দিয়ে রাখেন, আর সময় মত তালা খুলে স্নানাহার করতে অনুমতি দেন। এর বিরুদ্ধে কিন্তু কারুর কিছুই বলার নেই। সমাজ স্বামী নামক জীবটিকে এমনই অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে! পুরুষকৌলিন্য এ সমাজ পদে পদে নারীকে খর্ব করেছে। আচ্ছা বলুন তো, এ দেশে আপনি কি প্রত্যাশা করেন? একি মানুষের প্রতি চরম অবমাননা নয়? এ সবের মূল গলদ যদি দেখতে যান তবে দেখবেন যে অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যই সকল অনর্থের মূল। নারী আজ সম্পূর্ণ পরাধীনা, পরমুখাপেক্ষি। এর ওপর অশিক্ষার চাপে মেরুদণ্ড তার একেবারেই ভেঙ্গে দিয়েছে এ সমাজ। নারীর নাকি বেদপাঠে অধিকার নেই—আরে! যে বেদের বহু সূত্র নারীর রচিত, সে বেদ সম্বন্ধে এ বিধি-নিষেধ যে কত বড় অজ্ঞতা, কতখানি স্বার্থকলুষিত সে কি এক কথায় বলা যায়?

আর এক হয়েছে জ্বালা—ছাত্রেরা পর্যন্ত কেউ টিক্‌তে পারছে না এই সন্দেহবিষের জ্বালায়। কিছুদিন আগে সে এক ছাত্রকে নিয়ে মহা হুলুস্থুল, দারুণ কেলেঙ্কারী। দুইটিতে নাকি ছাতের প্রান্তে বসে গল্প করছিল—তারা বুঝি একই গাঁয়ের ছেলেমেয়ে। হয়ত এই সামান্য নৈকট্যের টানে মেয়েটি তাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে এই বান্ধববর্জিত কারাগারে আত্মকাহিনী শোনাচ্ছিল, নয়ত বা সহজাত সমবয়সের টানে পরস্পর পরস্পরকে সুখ-দুঃখের অংশভাগী করেছিল, তার ঠিক খবর জানিনা—কিন্তু শুনেছি যে সেদিন নাকি বৃদ্ধটি মেয়েটির সমস্ত কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করেও তৃপ্ত হন নি, গরম লোহার ছেঁকায় তার মুখের শ্রী নষ্ট করতে গিয়েছিলেন। মেয়েটির অসহায় চিৎকারে ছাত্রেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বৃদ্ধকেই প্রহার করতে যায়। তারপর অনেক কষ্টে তাদের শান্ত করতে হয়েছিল। একটা মজা দেখবেন—অনেকেই হয়ত মেয়েটিকে মৌখিক

সহানুভূতি দেখাবে—কিন্তু ওর সত্যকার সুখ-দুঃখের ভার নিয়ে কেউ ওকে এই পিশাচের হাত থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসবে না। আপনি হয়ত বলবেন, ও যে বিবাহিতা! কিন্তু একেই কি বলে বিবাহ? মেয়েটি যদি এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে ত্যাগ করে আজ তার সত্যকার জীবনসঙ্গী বেছে নেয় তাই হবে মিথ্যা? এ অন্যায়, এ অসত্য কিছুতেই চলতে পারে না। ব্যাভিচার দূষণীয়, সহজাত প্রেম কদাপি নয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে, এমন ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ। এই যে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা নিয়ে প্রত্যহের কদর্যতা একেই তো বলব অন্যায়, বলব ব্যাভিচার! নিস্ফল বেদনায় মন স্তব্ধ হয়ে গেল—সত্যই হয়ত আমাদের পদে পদে এমনি কতই কলুষতা, কতই দুরপনেয় কলঙ্ক বহন করে যেতে হয়। অক্ষমের বিদ্রোহের অধিকার কই?

পরের দিন বহু যাত্রীর সঙ্গে ঋষিকেশ-লছমনঝুলার বাসে উঠে বসলুম। হৃষীকেশে দেরাদুন, গড়বাল ও টিহরী-গড়বাল জেলা মিলিত হয়েছে। টিহরী রাজ্যের নূতন রাজধানী নরেন্দ্রনগর এখান থেকে মাত্র মাইল দশেকের পথ। এখানে যাত্রীরা যাত্রা করে দেবপ্রয়াগের পথে—মোটর বাসে—কেদার-বদরী যাত্রাপথের সকল আয়োজনের ইহাই প্রাণকেন্দ্র। মনে পড়ে গেল কালি-কমলিবাবার ইতিহাস। এইখানেই আছে সেই মহাত্মার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র ও যাত্রাপথের প্রথম চটি। আছে তাদের স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয়। এইখানেই সাধুরা পায় ছাড়পত্র, তাদের আহার-বাসস্থানের আর ভাবনা থাকে না কেদার-বদরী পথে। সারা পথে আছে এদের ধর্মশালা। একটি কালো কম্বল সম্বল করে বহুদিন আগে এই কম্বলীবাবা কেদার-বদরী পথে অশেষ পথক্লেশ সহ্য করে দেব-দর্শনে যান। তাঁর কালো কম্বল ধারণ হয়ত বা কেদারখণ্ডে বর্ণিত শিবের ভীলবেশের অনুকরণ—নয়ত বা মনের খেয়াল। কিন্তু তিনি আজ চিরস্মরণীয় এই দুর্গম পথযাত্রীদের মনে। শুনেছি যে জয়পুর

তাঁর জন্মস্থান এবং সন্ন্যাস আশ্রমে তিনি বিশুদ্ধানন্দজী নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৯ সালে তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রিয় শিষ্য পাঞ্জাবের নাথ সম্প্রদায়ের রামনাথজী এই প্রতিষ্ঠান গঠন আরম্ভ করেন। রামনাথজীর চেষ্টায় হরিদ্বার-ঋষিকেশ পথটি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠানের চটিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরও দেহান্তর ঘটে ১৯২৬ সালে। তীর্থ যাত্রীদের পথকষ্ট লাঘবের আশায় তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে ফেরেন। তাঁর ভিক্ষাপাত্র প্রধানত মারোয়াড়ী শেঠজীরাই পূর্ণ করেন! তাই আজও এখানকার পাহাড়ীয়ারা বিশিষ্ট যাত্রী মাত্রকেই শেঠজী বলে থাকে। শূন্য হাতে সে মহাত্মা সফল করতে পেরেছিলেন তাঁর সাধনা। আজ সমস্ত পথে পথে ছড়িয়ে আছে কম্বলীবাবার চটি তীর্থযাত্রীর পথশ্রম লাঘব করতে, শ্রান্ত ক্লান্ত পথচারীকে অন্নজলের সংস্থান করে দিতে। লছমনঝুলা ঋষিকেশ থেকে মাইল তিনেকের পথ। মাঝে পড়ে মুনিকি-রেতি। বাস আমাদের লছমনঝুলার পুলের এপারে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল মুনিকি-রেতি। সেখানেই সে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে। সামনেই লক্ষ্মণের মন্দির পড়ল—এখানে নাকি লক্ষ্মণ তপস্যা করেছিলেন, তাই কেদারখণ্ডে এই স্থান লক্ষ্মণস্থান নামে পরিচিত। ঝোলানো দড়ির সেতু পার হয়ে পর-পারে যেতে হয়। কিংবদন্তী বলে লক্ষ্মণ এই দড়ির সেতুটি প্রথম তৈরী করেছিলেন—তাই এর নাম লছমনঝুলা। এখন কিন্তু আর দড়ির সেতু নেই। বর্ত্তমানের লোহার সেতুটি সুরজমল ঝুনঝুন্‌ওয়ালার অর্থে নির্মিত হয়েছে। সেতুটির নীচে দিয়ে স্বচ্ছ ধারায় পাহাড়ীয়া নদী অপূর্ব রূপ নিয়ে চঞ্চল চপল পায়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে যেন বিশ্বরূপ দর্শনাকাঙ্খিনী হয়ে ছুটে চলেছে। এখানের প্রকৃতির রূপ বড় মনোরম—বিহঙ্গ কূজিত এই বিজন স্থান ধ্যানমৌন। যেন কোন অদৃশ্য তপস্যায় এই বনভূমি শান্ত! সেতুর ওপারে আম্রবীথি পার হয়ে একটু গেলেই স্বর্গদ্বার। স্বর্গদ্বার—নামেই তার পরিচয়!

মনে পড়ে যায় এই স্বর্গদ্বার সৃষ্টির ইতিহাস। স্বামী আত্মপ্রকাশ নামে সিন্ধুদেশীয় এক সাধু ও কম্বলীবাবার শিষ্য তাঁর অপর শিষ্য রামনাথজীর সহিত মনোমালিন্যের ফলে এই স্বর্গাশ্রম স্থাপন করেন। এখানে পৃথক দেবালয় ও মঠ আছে। ১৯২০ সনে আত্মপ্রকাশজীর দেহান্তর হয়। আর আছে কিছুদিন পূর্বে প্রস্তুত গীতাভবন, যার সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ গীতার শ্লোকগুলি খোদাই করা আছে। রংয়ের ব্যঞ্জনায় দূর থেকে মনে হয় যেন চিত্রিত। শ্যামল ঝোপ-জঙ্গলময় পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট পর্ণ-কুটীর বেঁধে তপস্বীরা বাস করেন। এ তপোভূমিতে বহু তপস্বীর মিলিত বন্দনা এক হয়ে ঊর্দ্ধে উঠে যায় সেই পরম ব্রহ্মের চরণে যিনি আদি-অন্তহারা, অবিনাশী—যিনি অনন্ত জ্যোতির্ময়।

হিমালয়ের এই পাদদেশ ডাক দেয় মহাপ্রস্থানের পথে। এই সেই মহাপথ যে পথে গিয়েছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভাইদের নিয়ে স্বর্গের সন্ধানে। এই পথে হাতছানি দেয় অজানা কৌতূহল—হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে গুহা-গহ্বরে দুর্গমের যে রহস্য ছড়িয়ে আছে এই-খানেই যেন তার আরম্ভ! মন কল্পনাসায়রে ভেসে যায় মানস সরোবরের তীরে, যেখানে দলে দলে চরে বেড়ায় হংস-বলাকার দল—মন ছুটে চলে সেইখানে, যেখানে মন্দাকিনী এসে মিলেছেন অলকা-নন্দায় অপার মহিমায়! শুনেছি এই পথেই যেতে হয় নন্দনকাননে, যেখানে গন্ধর্বরা আজও বিচরণ করে বেড়ায়। এই সেই মহাপথের যাত্রাপথ, যে পথ নিয়ে যায় তীর্থযাত্রী মনকে বদ্রীকায়—বিশ্বের দেবাদিদেব শ্রীকৈলাসের চরণে।

আজ এই পরম মুহূর্ত্তে মন যাত্রা করতে চায় মহাপ্রস্থানের পথে—সেই অজানার সন্ধানে,শুনেছি যাঁকে জানলে সব জানা শেষ হয়ে যায়—সব অপূর্ণতা পূর্ণ হয়। কিন্তু উপায় যে নেই, এখন অসময়। এই অসময়ে সে পথে কেউ যাত্রা করে না। সে পথ এখন ঝড়, ঝঞ্ঝা ও তুষারে সমাচ্ছন্ন, একান্ত দুগম! মনের অদমনীয় আকাঙ্খা মনেই চেপে ফিরে

চলেছি কোনও নতুন পথের সন্ধানে—জানি না কি আছে ভবিষ্যের মনে। আমার এ আকাঙ্খা, এ আতুর আকিঞ্চন কি কোনও দিন পূর্ণতা লাভ করবে ?

"পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা
আনন্দে তাই এক হয়ে যায় পৌঁছানো আর চলা।"

যে আনন্দে পৌঁছানো আর চলা এক হয়ে যায়, সে পরশমণির ছোঁয়া কি পাবো কোনও দিন ?

কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখী শ্যামচন্দ্র নাহি রে—

থেকে থেকে মনে হয় এত পাওয়ার মধ্যে কি কি যেন পাওয়া হলো না। মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে এ কিসের দুরাশা ? স্বর্গদ্বারের জনহীন ঘাটে বসে নিদ্রাহীন নিস্তব্ধ রাত্রে চেয়ে দেখি তারার ঝাঁক নিয়ে নীলাকাশের অতন্দ্র মহিমা। রাধা! তোমায় মনে পড়ে যায়—জেগে ওঠে সেই ফেলে-আসা দিনগুলির তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্মৃতি কি অপূর্ব মহিমায়—ইচ্ছে করে ফিরে যাই। আমার অপরাধ কি আজও মার্জনা পায়নি ? জনারণ্যের মাঝে পথে পথে ঢের তো ঘুরলুম, তবু মন যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সেই বিশেষ মানুষটির জন্য! স্তব্ধ রাত যেন আরও স্তব্ধ হয়ে উঠেছে—এ নিঃসঙ্গ নীরবরতা আর যেন সহ্য হয় না। মনে হচ্ছে, চিৎকার করে বলি—ওগো! ধ্যানমৌন ধরিত্রী কথা কও! কথা কও! প্রাণের স্পন্দন জাগাও!

চারিদিকে এই আধো-আলোর আধো-ছায়ার রহস্যময় আবরণ মনকে বেদনাবিধুর করে তুলেছে। হঠাৎ শেয়ালেরা ডেকে উঠল দূরে কাছে রাতের প্রহর জানিয়ে—মনে হল যেন মহাকালের পার্শ্বচরেরা হেসে উঠল খল্‌খল্ করে—মাথার ওপর ডানা ঝাপ্‌টা দিয়ে উড়ে চলে গেল কয়েকটা নিশাচর জীব। হাহারবে বাতাস বয়ে গেল পাহাড়ের বুক বেয়ে। সর্ব অঙ্গে শিহরণ জেগে উঠল কি জানি কোন অজানা আতঙ্কে। সুদূর আকাশে দেখা যায় স্বচ্ছ ছায়াপথ। মন ভেবে চলে—

ঐ পথে কি চলেছে অশরীরী আত্মারা দলে দলে ? ওখানে কি জাগছে মৃতের ভীড় ? তারা কি চলেছে পার হয়ে একটার পর একটা বাধার তোরণ ? মানস-সমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে ! ঐ সব মৃত আত্মারা পৃথিবীর বন্ধন কি একেবারে কাটাতে পেরেছে—ওদের মনে কি জাগে না প্রিয় বিরহকাতরতা ? ওদের কানে কি পৌঁছায় না মর্ত্ত্যের ক্রন্দন ? এই জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে চেয়েছিলেন বালক নচিকেতা ! যে উত্তর তিনি পেয়েছিলেন সেই কি শেষ উত্তর ? সেই কি শেষ এই দুরূহ সমস্যার ! ইহলোক ও পরলোক দ্বারদেশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে যমরাজ। জীবন-মৃত্যুর সব রহস্য দেখছেন সেই মহাসাক্ষী। অদ্ভুত তত্ত্বদর্শী, মহাবিচারক সেই ধর্মরাজ নিষ্করুণ, নিষ্কম্প, নির্মম। মৃত্যুই কি জীবনের সব শেষ ? মন মানে না—

ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে—আকাশে জল্ জল্ করে শুকতারা। ছায়াচ্ছন্ন ম্লান বিশ্ব-চরাচর। রাত্রি ও দিন পরস্পরকে দর্শনাকুল হয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে।

"শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা—
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।"

মন বিহ্বল হয় এ কুহেলিকায় ! মন্থর পায়ে চলে যায় রাতের অন্ধকার। মৃত্যুতোরণ পার হয়ে যেন জীবন-জাগার আনন্দে মাতোয়ারা হয় আকাশ-বাতাস। গাছের পাতারা দোলা খায় ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়ায়। পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করে জাগেন আলোর অধীশ্বর···রৌদ্র-করোজ্জ্বলে ঝলমল করে ওঠে চারিধার—বনে বনে জাগে কলকাকলি ! আচ্ছন্ন মন আনন্দের আলোড়নে যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে !

ঘাট ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি দৃষ্টি পড়ল জলের মধ্যে। এখানেও দেখি ব্রহ্মকুণ্ডঘাটের মতই অজস্র মহাশীর্ষমাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভোরের প্রথম আলোয় খেলা করে বেড়াচ্ছে—রূপালী অঙ্গে গোলাপী ওড়না উড়িয়ে

যেন জলকন্যার দল ! ঘাটের ওপরেই রামচন্দ্রের মন্দির, লক্ষ্মণ এখানে তপস্যা করতেন। মন্দিরের সামনে ঋষিকুণ্ড নামে বাঁধান জলাশয়। ভোরের মাঙ্গলিক আরম্ভ হয়ে গেছে—কোন কোন যাত্রী তর্পণারম্ভে ব্যস্ত। হরিদ্বার এই লছমনঝুলা থেকে ১৭ মাইল, আর ১৬৪ মাইল বদরীধাম। মুনিকি-রেতির পূর্ব দিয়ে যে সরু পথ, সেই পথ ধরে শেষধারা বা লক্ষ্মণকুণ্ডে নামলুম। শোনা যায় রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র আর মেঘনাদবধের জন্য লক্ষ্মণ এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত করেন। ঋষিকেশের পথে পথে দিনটা কাটিয়ে আবার হরিদ্বারের পথেই ফিরে চললুম....

"বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ কুহরিছে পিকগণ
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিলো ওই।"

কি জানি কেন মন ব্যাকুল হয় বৃন্দাবনের জন্য—ফেরার আশায় যেন নীড়মুখী পাখী ! আমার এ আকুলতা কি অলক্ষ্যে রাধার কাছে পৌঁছায় না ? আমার এ আকিঞ্চনে সেও কি বিহ্বল হয় ?

ভোলাগিরির আশ্রমে পড়ে রয়েছি, জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে কেটে গেছে সারারাত। সর্ব অঙ্গে অসহ্য বেদনা। মন অজানা আশঙ্কায় ভয়হ্বিল ! আচ্ছন্ন মন ঘুমে সম্বিত হারায়। সব জ্বালা জুড়ানো ও কার করস্পর্শ কপালে অনুভব করি ? কে এমন নিবিড় মমতায় আমার সেবা করে ? ছন্নছাড়া পথশ্রান্ত পথিকের ঘরে এ কোন শ্রী ?

রাধা ! তুমি এসেছো ! আর আমার কোনও দুঃখ নেই....নেই কোনও আকিঞ্চন। জীবন আমার সফলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আমি ধন্য হয়ে গেছি ! দুঃখ-সমুদ্র মন্থন-করা অমৃত আপনি এসেছে আমার ঘরে !

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়...রাধা ! রাধা ! তুমি কই ? হায় রে দিবা-

স্বপ্ন, হায়রে আতুর মন। কোথায় রাধা ? ভোলাগিরির আশ্রমের শূন্য ঘরখানা যেন বোবা কান্নায় ডুক্‌রে ওঠে—

"সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না
কিসের পিয়াসে কোথা যে যাবে সে পথ জানে না।"

আজ আমার শ্রান্ত অবসন্ন রোগক্লান্ত মন যেন দিক হারিয়ে ফেলেছে। সর্বহারা ভিখারীর মত নিজেকে রিক্ত মনে হয়। অভিমান-ক্ষুব্ধ মন বারবার প্রশ্ন করে···রাধা! কেন তুমি এলে অমার চলার পথে ? কবে কখন দিলে এ অদৃশ্য বন্ধনহীন দারুণ বন্ধন ?

কয়েকটি ঝরা ফুলের পাপ্‌ড়ী—শুক্‌নো কয়েকটি Forget-me-not ফুল—কাকে স্মরণ করে কে কবে পাঠিয়েছিল জানি না, আর আপন-ভোলা কোন পাঠক তাকে এই বইয়ের পাতাগুলির মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল কে জানে।

কিন্তু তবু সেই অচেনা অদেখার ক্ষণিক আকুলতা আমার অন্তর স্পর্শ না করে পারল না।

আমায় ভুলো না— ভুলো না বন্ধু।

এ আকুলতা যেন অনুরণিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে বিশ্বভুবনের অণু-পরমাণুতে। ইথারের স্তরে স্তরে জাগছে এই অব্যক্ত বিহ্বল ব্যাকুলতা।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যায়। নিস্তব্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রত্যূষ মনকে আচ্ছন্ন করে। অব্যক্ত বেদনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি মহা-শূন্যতার পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে।

দুঃখ-সাগর মন্থন-করা অমৃত আমি পান করেছি, তবু কেন এ বিষাদ, কেন এ আতুরতা ? মন বলে আজও তুমি মাটীর মমত্বমুক্ত হতে পারো নি! হৃদয় আজও তোমার স্পর্শকাতর।

সহযাত্রীরা একে একে উঠে বসলেন। পাশের যাত্রীর হাতে

সযত্নে তুলে দিলুম তাঁর বইয়ের মধ্যে পাওয়া ঝরা ফুলগুলি—প্রথমটা চেয়ে রইলেন, তারপর দু-হাত পেতে নিয়ে নিলেন অনেকদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া বুঝি বা কোনও মধুর স্মৃতি।

গেরুয়া বসনের অনেক গুণ। বৈরাগীর ছাপ মারা যেন এ রংয়ে। বুঝিবা এই গেরুয়া বসনেরই টানে কাছে এসে বসলেন এক শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ। বসন তাঁর সাদা, কিন্তু মন বুঝি তাঁর সত্যকার বৈরাগ্যের রংয়ে রাঙ্গিয়ে উঠেছে। সঙ্গে একটি ছোট ঝোলা ও একটি পুঁটুলী। কথায় কথায় পরিচয় নিলেন। গন্তব্যস্থান ঠিকঠিকানাহীন শুনে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের গরীব মন্দিরে। বিনা চিন্তায় পরমানন্দে মেনে নিলুম সে নিমন্ত্রণ।

সযত্নে দেখালেন একটি কাঠের বাক্স সেই ছোট্ট পুঁটুলীটির মধ্যে—বেছে বেছে নিয়ে চলেছেন কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কিছু কবিরাজী পাঁচন, বড়ি—ঔষধির মূল ও পাতা। বায়োকেমিকেরও কয়েকটি শিশি আছে। এরই সংগ্রহে তাঁর বিশেষ করে আসা। গ্রাম-প্রান্তে তাঁদের বাস। নানা জন আসে ওষুধ-পত্র নিতে। ভালও হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস আছে কিনা! ওরে ভাই! অনেক দেখলুম, অনেক শিখলুম এ জীবনে—এ সংসারে বিশ্বাসেই সব হয় রে ভাই, এইটুকুই সার বুঝলুম। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর"—এ যে বৈষ্ণব-কথা এ যে অমৃত সমান।" বাইরের পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন জ্ঞান-বৃদ্ধ। ভোরের প্রথম আলো জানালা দিয়ে এসে তাঁর সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করলো। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম এই মুক্ত আলো আর মুক্ত প্রাণের কোলাকুলি।

হরিদ্বারের কাছে এক অখ্যাত ষ্টেশনে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি দুই মৌন পথিক! কিন্তু মনের চিন্তাধারা কি দুজনার এক? এই শ্বেতাশ্মশ্রু মৌনী কি ভেবে চলেছেন কে জানে, আমার কিন্তু বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে আর একদিনের সন্ধ্যার কথা। সেদিনও এমনি

গোধূলিতে মনে কৌতুক ও বিস্ময়ের দোলা নিয়েএক অজানিতার সঙ্গে পথ হেঁটে চলেছিলুম। কিন্তু তবু সেই আমিআর এই আমি কি এক? আজ আমার সুখ-দুঃখের কত সঞ্চয়, কত স্মৃতির কাঁটা! মাটীর অমৃত পরশে আমি ধন্য, তবু কেন এক না-জানা ব্যথা বুকের কাছে ঠেলে আসতে চায়। এই স্তব্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা মনকে কেন বেদন-বিহ্বল করে? জনারণ্যের মাঝখানে পথে পথে ঢের তো ফিরলুম—তবু মন মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে বিশেষ মানুষটির জন্য—মৌনা মন মুখর হয়ে তার সব সঞ্চয় কোলাহল করে যেন ঢেলে দিতে চায়!

আমরা ষ্টেসন ছেড়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে এসেছি। যতদূর দৃষ্টি যায় গঙ্গার দুই কূলে ধূ-ধূ করছে বালু, মাঝে মাঝে তারঝোপ-জঙ্গল। বনতুলসী ও সিদ্ধির গাছ সন্ধ্যার বাতাসকে সৌরভে মাতিয়ে রেখেছে। আত্মগতভাবেই হেঁটে চলেছেন এ বিজন পথে আমার নীরব সহযাত্রী। হয়ত তাঁর ধ্যানরত হৃদয়ে মনে মনে সন্ধ্যা-বন্দনা করছে তাঁর ইষ্টদেবের পায়ে। আমরা এগিয়ে চলেছি অস্তগত সূর্য্যের আভায় ছায়াচ্ছন্ন গাঢ় বেগুনে রংয়ের পর্বতমালা পেছনে ফেলে। ক্রমে আবছা হতে হতে তারা ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল দিগন্তের কোলে। যতই এগিয়ে আসি, দূরের নদী ততই মাঠের মাঝে একটি অস্পষ্ট রেখার মত মিশিয়ে যায়। দুই দিকে শূন্য প্রান্তর, আর তার মাঝে নদী কখনও হারিয়ে কখনও এঁকে বেঁকে ছুটে চলে! কে যেন জগৎ জুড়ে চাঁদের আলোয় একখানি আলো-ছায়ার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে!

আমরা যখন পৌঁছলুম, সন্ধ্যা তখনও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, মন্দিরে ধূপ-দীপ জ্বালানো হয়েছে। কে যেন ভিতরে আরতি করছেন। অঙ্গনের তুলসী-মঞ্চে জ্বলছে মাটির প্রদীপটি।

বৃদ্ধ দাওয়ায় উঠে ডাক দিলেন, "মাগো! আমি এসেছি।" তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এলেন একটি মেয়ে। দূর থেকে বুঝতে পারি নি, কাছে আসতে মুখের দিকে তাকিয়েআশ্চর্য হয়ে গেলুম—নিঃঝুম অরণ্য

প্রান্তে সাক্ষাৎ বনলক্ষ্মীর মত ইনি কে? আমায় দেখে থমকে দাঁড়ালেন, সপ্রশ্ন নয়নে তাকালেন গৃহস্বামীর পানে। শিশুর হাস্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সন্ন্যাসী বললেন:

"উনি আজ অতিথি আমাদের ঘরে—দেখিস্ মা কোনও কষ্ট হয় না যেন—অতিথি জীবন্ত দেবতা! আমার পূজোর জোগাড় করে রেখেছিস্ তো মা? তুই এঁর দেখাশুনা কর—আমি যাই আমার প্রভুর কাছে, আজ দু'দিন দেখিনি প্রাণটা যেন কেমন করছে মা!" বলতে বলতে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

পায়ে পায়ে আমিও দেউল-দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াই—ভগ্নপ্রায় মন্দির বিগ্রহ নিয়ে প্রাণময় হয়ে উঠেছে সহজ নিষ্ঠায়। এখানে দু'দণ্ড বসলে বুঝি সব ভুলে যেতে হয়, সার্থক হয়ে ওঠে বেঁচে থাকা! এ নির্জ্জন বনকুঞ্জে নদীর ধারের এই শ্যামল রম্য স্থান যেন স্পর্শকাতর! বনদেবী যেন অলক্ষ্যে এখানে বিরাজ করছেন! তাই মনে হয়, বুঝি কোন অদৃশ্য মঙ্গলহস্ত ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে এখানকার জলেস্থলে। মন চলে যেতে চাইল না এই স্থান ছেড়ে, অবাধ্য চরণ থেমে গেল। অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে হৃদয়ের আকাঙ্খা জানালুম সন্ন্যাসীর চরণে। স্মিতহাস্যে ঝরে পড়ল স্বর্গীয় সুষমা, মনে হল মর্ত্ত্যে যদি কোথও স্বর্গ থাকে, তা রয়েছে এইখানেই।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গল পাখীর কলকাকলিতে। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে প্রকৃতির এক অতুলনীয় রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে দেখছি এক রূপ। আর এখন প্রথম সূর্য্যের সোনার আলোয় চারিদিক যেন ঝলমল্ করছে। তপস্বীর এ যোগ্য তপোবনই বটে! বেশ কিছু জীবজন্তুর সমারোহ আশ্রমটিকে ঘিরে। কাছেই একটি ফলের বাগান। কিছু শাকশব্জী ও ফুলগাছও আছে। নদীর কিনারে আমলকির সারি। হালকা হাওয়ায় ঝিরঝির করছে পাতাগুলি,

ঝিক্‌মিক্ করছে প্রভাত-রবির প্রথম আলোয়। চারিদিকেই পরিচ্ছন্নতা ও নিপুণতা—কিন্তু কে এ সব করে? সকৌতুকে এদিক ওদিক দেখছি, দেখি আমার আশ্রয়দাতা আসছেন আমারই দিকে, আর তাঁর সঙ্গে আসছেন তাঁরই দুই অনুচর। প্রসন্ন হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো, না মশার কামড়েই ঝালাপালা?"

– জবাব দিলুম "আপনার আশ্রমে মশাও যে কামড় ভুলেছে।"

—সহাস্যে বললেন "তাই নাকি!"

পরিচয় করিয়ে দিলেন অনুচর দুইটির সঙ্গে—দুইটিই অবাঙ্গালী। কথায় কথায় শুনতে পেলুম রাতের দেখা সেই মেয়েটি আশ্রয়দাতার কন্যা এবং তার নাম মাধবী। এ আশ্রম তাঁরই প্রেরণায়, তাঁরই কর্ম্ম নৈপুণ্যে এমন শ্রীময়ী রূপ ধরে রেখেছে।

আমলকিকুঞ্জ ছাড়িয়ে ওধারে বটগাছতলায় ঘাটের কিনারে আপন মনে বসে আছি, এমন সময় মাধবী এলেন—হাতে তাঁর সদ্য প্রস্তুত গরম চা, কিন্তু পাথর বাটিতে। সপ্রতিভ হাস্যে বললেন "চা আমরা বড় একটা খাই না এখানে, তবে সময় বিশেষে কেউ যদি ইচ্ছে করেন তখন খাওয়া হয়। আপনার নিশ্চয়ই অভ্যাস আছে। হয়ত কত অসুবিধা—কত কষ্ট হচ্ছে!"

মনে মনে ভাবলুম মেয়েরা কি সর্ব্বত্রই এক! কথায় কথায় বললেন, "কত দিন যে বাঙ্গালীর মুখ দেখিনি। আপনাকে দেখে তবু দুটো কথা বলে বাঁচবো। আমি ত বড় একটা কোথাও যাই না এখান ছেড়ে, বাবাও তাই—সামান্য আমাদের প্রয়োজন, এখানেই তা মিটে যায়। তবু মাঝে মাঝে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে, দেশের কথা আপান জনদের কথা বড় মনে পড়ে যায়!"

গল্পে কথায় দূরত্বের মেঘ কেটে গেল, সহজ হয়ে উঠল পরিচয়। যাবার সময় বলে গেলন "আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনার ত আসক্তি মুক্ত। আমার কথায় মনে মনে হাসছেন বোধ হয়।" একটু বিস্মিত

হলুম বৈকি—ইনি আশ্রম-দুহিতা, অথচ ওঁর মন গত দিনের স্মৃতিতে বিধুর হয়ে আছে। মাত্র কয়েকটি কথা—তবু যেন অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে। হয়ত দেশে ঘরে সবই আছে, আত্মীয়-পরিজনও আছেন, কিন্তু তবুও কোনও বিশেষ কারণে উপস্থিত তাঁদের সঙ্গে এঁদের কোনও সম্বন্ধ নেই বলেই মনে হল। অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে অহেতুক কৌতুক এইখানেই শেষ করলুম। বিচিত্র এই সংসারে মানুষ বিচিত্রতর—তেমনি জটিল তার জীবন-পথ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি, আশ্রমটিকে ঘিরে সত্যই বড় মনোহর দৃশ্যের সমাবেশ। এ যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের যত্নে গড়া একখানি অপূর্ব্ব চিত্রপট। আশে পাশে মনুষ্য বসবাসের চিহ্ন চোখে পড়তে লাগল—চোখে পড়তে লাগল ছোট বড় নানা আকারের গ্রাম ও গ্রাম্য জনতা। নীলের কোলে দিগন্ত-প্রসারী শ্যামল ধানক্ষেত। মনে হয় বসুন্ধরার বুক জুড়ে সবুজ রংয়ের এক গালিচা যেন কোন বিরাটের পাদস্পর্শের জন্য প্রতীক্ষিত। ক্রমে আমার দুই পাশে ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা দেখা দিতে লাগল। বন ক্রমেই ঘন থেকে ঘনতর হয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। কি এক বুনো ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে আছে। এই বিজন বনভূমিতে এত রকম গাছ-পালা এত, রকম জীব-জন্তু এসে হাজির হতে লাগল যে মনে হল, আমি যেন মন্ত্রলোক দিয়ে চলেছি। বাস্তব জীবনে প্রতিটী মুহূর্ত্ত যে এমন সজাগ, এমন চমকপ্রদ হতে পারে এর আগে তা বুঝিনি। গঙ্গা কোথাও সরু কোথাও চওড়া হয়ে আপন মনোমত গতিতে চলেছে। সে যেন কাউকে মানতে চায় না, কিছুতেই তার ভয় নেই। এক জায়গায় একটি গাছ নদীর দিকে এতই ঝুঁকে পড়েছে যে মনে হচ্ছে, নদীর মধ্যেই বুঝি তার জন্ম। আর এক জায়গায় দেখি দু'টি স্বভাবভীরু হরিণ জল খেতে নদীর ধারে এসেছে। আমায় দেখে তারা জল খাওয়া ভুলে ডাগর দুটি কাজলপরা চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু পালালো না। দেখে মনে হল তারা

যেন মূর্ত্তিমতী নির্ভাবনা। মানুষের হিংসানাগিনী কি এ বনে ফণা-বিস্তার করেনি? বন্যেরা বনেই সুন্দর বটে!

"কোথায় পালিয়েছিলেন? আমি যে ঘর-বার করে মরছি। আশ্রমের সবাই জলযোগ সেরে নিয়েছে, আর আপনি একে অতিথি, তায় অভুক্ত হয়ে কি অন্যায়টাই না বাড়িয়ে তুলছেন? ভাগ্যে বাবার এখনও পূজো শেষ হয় নি, নয়ত আমায় কি ভাবতেন বলুন তো?"

যেন আমার একান্ত ঘরের জন—আজন্মের চেনা মানুষ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম—এঁর মুখের দিকে চেয়ে কেমন আমার রাধার কথা মনে পড়ে গেল। তুজনে কত তফাত—তবু কত মিল! মেয়েরা কি এমনই মমতাময়ী? ঘর ছেড়েও তারা পথে পথে পথের মানুষের জন্য মমতার জাল বিছিয়ে রেখেছে সেবায় স্নেহে প্রেমে।

"কি অত ভাবছেন সন্ন্যাসী?" সকৌতুকে শুধালেন মাধবী, "হাতে ও কি সঞ্চয় করেছেন?" বললুম, "কিছু না, কয়েকটি বুনো ফুল, বড় সুন্দর গন্ধ—পথ চলতে তুলে এনেছি।" ফুলগুলি তুলে ধরলুম তাঁর দিকে, তু'হাত পেতে নিতে গিয়ে আমার হাতে হাত ঠেকে গেল—কেমন যেন চম্‌কে তাকালেন। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্ত, কিন্তু তবু যেন সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। রাধা আর মাধবী ঘর ছেড়েছে তুজনেই, তবু কি এরা এক?

রাধা! সে যে পাষাণী—সে যে ধ্যানময়ী!

আশ্রম-প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালুম—মাধবী সযত্নে আসন পেতে খেতে দিলেন। চেয়ে চেয়ে দেখছি সে নিপুণতা। মেয়েরা না হলে বুঝি আমাদের মত বাউণ্ডুলেরা পৃথিবীটাকে ভূতনাথের পার্শ্বচরদের আবাসভূমি করে তুলতে পারতো। আহারান্তে উঠতে যাবো এমন সময় মাধবী হাতে গামছাটি এগিয়ে দিলেন—আর থাকতে পারলুম না, বললুম, "মাধবী দেবী! আপনি আমায় বারে বারে রাধার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।"

মাধবী চমকে উঠলেন, মনে হল হয় তো বা আমার ভ্রম—শুধালেন, "কে তিনি ?"

বললুম, "তিনি এক উদাসিনী।"

সকৌতুকে বললেন, "তাই নাকি ?"

সে দিনের মত সেইখানেই শেষ হল—আশ্রমের অন্যত্র তাঁর ডাক পড়েছে ততক্ষণে। কত তাঁর পোষ্য, কত তাঁর কাজ, আমার মত নিষ্কর্ম্মার পিছনে সময় নষ্ট করার মত অবসর তাঁর কই ?

পাগ্‌লা উত্তুরে হাওয়া বইছে। শুক্‌নো হাওয়ায় উড়ে আসছে একটা দুটো ঝরাপাতা। ঘাটের ধারে অন্যমনা হয়ে বসে আছেন মাধবী। যেন মূর্ত্তিমতী বেদনা! এ সময় তাঁর কত কাজ, কত ছুটোছুটি, কিন্তু কিসের ভাবনা এমন করে আজ তাঁর সব ভুলিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের তো এমন সব ভোলানো অবস্থা সহজে হয় না ? আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। এতই অন্যমনা যে তাঁর কিছুই খেয়াল হলো না।

একবার ভাবলুম ধীরে ধীরে ফিরে যাই, মুখর হয়ে চাপল্য করবো এই একান্ত মৌন মুহূর্ত্তটিতে ? আবার ভাবলুম সে কি উচিত হবে —উনি যে এখানে আছেন এ তো আমি জেনে আসি নি—কি করবো ভাবছি, এমন সময় দেখি এ অসময়ে তাঁর পুজোপাঠ ছেড়ে মাধবীরই সন্ধানে এসেছেন দাদাজী। আমার আশ্রয়দাতা এই নামেই পরিচিত এ আশ্রমে! আমার দিকে একবার তাকালেন, দেখলুম সে সদা-হাস্যময় মুখে আজ বিষাদের ছায়া—পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে, মাধবীর মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, "মা!" চমকে উঠলেন মাধবী, বৃদ্ধের দুই পা জড়িয়ে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কিছুই আমি বুঝতে পারলুম না, তবে এইটুকু অনুমান করলুম যে পিতা-পুত্রীর কি এক বেদনাময় কাহিনীর স্মৃতি-কাতর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের আমি অনাহুত দর্শক হয়েছি। যদিও

অনিচ্ছায়, তবুও এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে সংকোচ বোধ হলো, নিঃশব্দে পালিয়ে এলুম। কিছুই আর ভাল লাগলো না, মনে হলো এই বনশ্রীর সমস্ত শ্রী বুঝি ম্লান হয়ে গেল একটি ফুৎকারে—মাটীর ঘরে একটি স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলছিলো, হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় তা যেন নিভে গেল।

পরদিন আর মাধবীকে দেখতে পেলুম না—আজ কয়দিনই দেখছি তিনি বড় ব্যস্ত, কিন্তু আজকের মত এমন অদৃশ্য হতে আর তাঁকে কোনও দিনই দেখি নি। বিশেষ করে, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান তিনিই করে থাকেন। বাইরে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখছি যে আশ্রমের সর্ব্বত্রই কেমন যেন বিশৃঙ্খলা, সবাই যেন কেমন নীরব। এমন সময় দাদাজী এসে আমায় ডাক দিলেন।

"চল বাবা! একটু যাই গাঁয়ের দিকে। মাধবী-মা যে আমার আজ ঘরে আসে নি—ওদের ছেলেটার বড় অসুখ। পাগ্‌লী মা আমার তাকে নিয়েই কয়দিন ধরে পাগল হয়ে গেল—ছেলেটাও হয়েছে তেমনি, আপন মাকে ছেড়ে মাধবী-মাকেই চায়—ধরো তো বাবা ওষুধের বাক্সটা?"

চেয়ে দেখি এই প্রশান্ত বৃদ্ধও যেন কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কথায় কথায় একটি মাটীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। বৃদ্ধের পেছনে পেছনে ভিতরে গিয়ে দেখি কোলে একটি মৃতপ্রায় ছেলে নিয়ে কি গভীর মমতায় বসে আছেন মাধবী। মেয়েদের বহু রূপ দেখেছি, কিন্তু এমনটি বুঝি আর দেখিনি—স্বয়ং দেবতাও বুঝি মাথা নত করেন এঁদের পায়ে।

দাদাজীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মাধবী—বলে উঠলেন, "বাবা! ভগবান বুঝি চিরঞ্জীবকে ফিরিয়ে দিলেন! কি দুর্ভাবনায় না কালকের রাতটা কেটেছে।"

কাছে গিয়ে বসলেন দাদাজী—শিশুর নাড়ী দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠলো তাঁর মুখ, বললেন, "তাই বুঝি হবে মা ! ভগবান বোধ হয় আমাদের মুখ রাখলেন এ যাত্রা।"

এমন সময় শিশুটি চোখ মেললো—কি যেন বললো মাধবীকে, আবার ঘুমিয়ে পড়লো শ্রান্ত হয়ে। দাদাজী বললেন, "তুই এবার আশ্রমে চল্ মা ! কাল সারা দিনরাত যে একটু বিশ্রাম পেলি না, সারাটা দিন নাওয়া-খাওয়া করলি না—যার ছেলে তাকে এবার দিয়ে দে—তোর তপস্যা তো সার্থক হয়েছে মা। সাবিত্রী যেমন সত্যবানকে ফিরিয়েছিলেন, তুইও যে তেমনি যমরাজকে জয় করলি।

"ওকি বলছো বাবা ! আমরা কে ? যিনি দিয়েছেন তিনিই রেখেছেন।" ত্রস্তে বলে উঠলেন মাধবী।

"নারায়ণ। নারায়ণ। সত্যই তো আমার ভীমরতি হয়েছে মা। যাবার দিন এলো তবু আমি-আমি ঘুচলো না"—কথায় কথায় আশ্রমে এসে পৌঁছলুম—মনে হল ঘাটে যে বেদনার আমি নীরব সাক্ষী তার সঙ্গে এই ছেলেটির যেন কোথাও যোগ আছে ? কে জানে !

সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরছি, দেখি আধো আলো-ছায়ায় আমলকি কুঞ্জের ওপাশে নদীর জলের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে বসে আছেন মাধবী, একবার ভাবলুম ফিরে যাই—আবার মনে হলো না ফিরে কেন যাব—বরং কাছে গিয়ে বসি। যদি কথায় কথায় ওঁর মনের ভার লাঘব করে দিতে পারি—দোষ কি। আমায় দেখে একবার চোখ তুলে তাকালেন। বললুম, "ধ্যানে বিঘ্ন ঘটালুম না ত।" তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "সে কি ! আমরাই আমাদের নানা বিড়ম্বনায় আপনাকে বিড়ম্বিত করছি।"

নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ—স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলুম. "আচ্ছা. ঐ ছেলেটিকে আপনি বড ভালবাসেন. না ?"

সে প্রশ্ন এড়িয়ে বললেন, "আপনি তো সন্ন্যাসী, বলতে পারেন মনকে কেমন করে জয় করতে পারা যায়—চিত্তদৌর্বল্যের কাছে আমরা এমনি ধারাই কি শিশুর মত অসহায় ?"

কি থেকে কি কথা এসে পড়লো। বললুম, "এ প্রশ্ন কেন ?"

তিনি বললেন, "এই প্রশ্নই যে জীবনে সব কিছুকে আজ ছাপিয়ে উঠেছে !"

ক্ষণেক চুপ করে থেকে বললুম—"আমি সন্ন্যাসী নই, গেরুয়া বসন দেখে যদি তাই ভেবে থাকেন, তবে ভুল করছেন। আমি নিজেই আজও হাতড়ে বেড়াচ্ছি। পথে পথে ঘুরে মরছি কি জানি কেন ! মাঝে মাঝে পাই পরম অমৃতের পরশ অতি নিভৃতে, কিন্তু আবার হারিয়ে ফেলি…আমার মনের সেই আজন্ম বিরহীটা জেগে ওঠে—আমায় ঘরছাড়া ছন্নছাড়া করে দেয়। তোমার কথার জবাব আমি দিতে পারবো না মাধবী—সে শুধু পারে একজন, সে বৃন্দাবনের নতুন রাধা !"

"কে এ আপনার নতুন রাধা, বলতে পারেন ?"

মাধবীর কণ্ঠে যেন কাঠিন্য, একটু বা বিরক্তি….বার বার লক্ষ্য করেছি আমার মুখে রাধার নাম এঁর ভাল লাগে না, কিন্তু কেন ?

বললুম—"কে এই নতুন রাধা তা আমি নিজেই জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে কোনও ঘটনা বিপর্য্যয়ে ঘর ছেড়ে সে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল…এর বেশী কিছু জানতে কোনও দিন চেষ্টা করি নি। তবে যেটুকু পরিচয় তার আমি পেয়েছি সেই আমার অনেক।" কেমন যেন ম্লান হয়ে মাধবী বললেন—"তাঁকে যখন এতই ভালবাসেন তবে ছেড়ে এলেন কেন ?"

বললুম—"তাঁকে আমি ছেড়ে আসি আমার সাধ্য কি ? সেই আমায় বিতাড়িত করেছে।"

আশ্চর্য্য হয়ে মাধবী শুধালেন, "সে কি ?

বললুম—"তাড়িয়ে দিয়েছেন বললে অন্যায় করা হয়, আমারই অবিবেচনা, আমারই ভুল আমায় বিতাড়িত করেছে। সে আশ্রমের যিনি কর্ত্রী তাঁর কাছে আমি অপরাধী!"

মাধবী শুধালেন—"সে আবার কেমন কথা!"

বললুম তাকে আদ্যোপান্ত আমার বৃন্দাবনের ইতিহাস।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাধবী শুধালেন, "তারপর!"

—"তারপর আর কিছু নেই মাধবী!"

—"আপনি যেমন আপনার বুকের বোঝা রাধার কাছে নামিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়েছিলেন—আশীর্ব্বাদ করুন, আমিও যেন তেমনি করেই আপনার কাছে সব কথা বলে আমার বোঝা হাল্কা করে নিতে পারি।" এই কথা কয়টি বলেই হঠাৎ মাধবী আমার পায়ের ধুলো নিলেন, কি জানি কেন? অন্তর আমার বুঝি সত্যই তার জন্য প্রার্থনা করেছিল সেই অনির্বচনীয়ের পায়ে, সে ধ্যানমৌন সন্ধ্যায়!

রাধা সইতে জানে—অপরের দুঃখ ভার বইতে জানে। কিন্তু, এ যে আমার চেয়েও অসহায়, আমার চেয়েও চিত্তদৌর্ব্বল্যে বিধুর।

বললুম, "বল মাধবী তোমার কথা—যদি তাতে শান্তি পাবে মনে করো।"

মাধবী বলে চললো তার বিড়ম্বিত জীবন-ইতিহাস। বললো, "অনেক সয়েছিলুম, কিন্তু একদিন আর সইলো না আমার। মন এমনিতেই ব্যথায় উদ্বেল হয়েছিলো, জীবনে আমার ধিক্কার এলো। সেই নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে একা রাস্তায় পা বাড়ালুম। জাহ্নবীর শীতল জলে সব দুঃখ, সব দাহন শেষ করে দিতে চেয়েছিলুম, এমন সময় তথাগতের মত উদিত হলেন এই মহাপুরুষ—বললেন, 'কে মা তুমি?' থমকে দাঁড়ালুম—বুঝতে পারলেন সবই। করুণ ভর্ৎসনায় বললেন, 'ছিঃ মা! এমন কাজ কি করতে আছে?'

কী সে সৌম্য গভীর কণ্ঠস্বর! মনে হল, এই মরণ-মুহূর্ত্তে স্বয়ং

মৃত্যুঞ্জয় বুঝি নেমে এলেন তাঁর দুর্লভ সান্ত্বনা নিয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ধীরে ধীরে আমার পিঠে হাত রাখলেন তিনি। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলুম মাটি। কোনও প্রশ্ন করলেন না তিনি, কোনও কথা বললেন না, শুধু আমার মাথায় তাঁর হাত দুটি রাখলেন। সে স্পর্শে আমার অন্তরের সকল দাহন জুড়িয়ে গেল। সে আশীর্ব্বাদ আমায় জন্মজন্মান্তর পার করে পরজীবনের পারে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে ভোর হয়ে এলে বললেন, 'চল্ মা, তোকে তোর ঘরে দিয়ে আসি···এমন করে কি ঘর ছাড়ে রে পাগ্‌লী? অভিমান কার ওপর? তারা যে তোর পরম আপন—তোরা যে মায়ের জাত মা! সন্তানে কত অন্যায়, কত অত্যাচারই না করে, তা বলে কি মার রাগ করতে আছে? তোরা যে ধরিত্রীর মেয়ে, তোদের সহন-শক্তির কি সীমা আছে রে!'

ঘরে ঢুকতে যাবো কঠোর কণ্ঠে স্বামী বললেন, 'চলেছো কোথায়? এ ঘরের তুমি অযোগ্যা, এর দরজা তোমার জন্য চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে—আমাদের কাছে তুমি মৃত।'

ঘুম-ভাঙ্গা চোখে মা-মা করে ছুটে এলো আমার খোকা, জোর করে তাকে ঝাপ্‌টে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন তার ঠাকুমা। সহসা দেখলুম নিথর মেঘে নিদারুণ বজ্রের নির্ঘোষ, দেখলুম রুদ্রের তাণ্ডব এই ব্রাহ্মণের দু'নয়নে। বললেন, 'চলে আয় মা তোর বাপের আশ্রয়ে এ কলুষপুরী থেকে!' এমনি করেই বুঝি পরিত্যক্তা সীতাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাল্মীকি! তারপর কত তীর্থ, কত জনপদ পিতা-পুত্রী ঘুরে বেড়ালুম—কিছুতেই পাই না সান্ত্বনা, একটু আলো। আমার ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন এই করুণাময় বৃদ্ধ! বার বার করে

বোঝালেন। 'দৃষ্টি একটু খোল্ মা! দেখ্ বিশ্বের সব শিশুদের মধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছে তোরই ছেলে!'

ঘুরতে ঘুরতে একদিন এই জায়গাটা আমাদের বড় ভাল লেগে গেল....এইখানেই আমরা সেই থেকে আশ্রয় নিলুম। তবুও যে আজও আমায় পাগল করে তোলে আমার সেই কবে হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট খোকা। ছেলেটাকে যে আমি ভুলতে পারছি না—থেকে থেকে সে যে আমায় কেবলই হাতছানি দেয়।"

বসে বসে শুনছিলুম মাধবীর এ দুঃখের কাহিনী। বলার কি আছে, সান্ত্বনারই বা কি? মানুষের মাঝখানেই তো দেবতা-দানবের প্রকাশ। এ তো নতুন কিছু নয়—পৃথিবীতে এমন ঘটনা অহঃরহঃ কতই না ঘটে চলেছে, কে তার খোঁজ রাখে? তবু অকারণ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো—মনে হলো, আমার দ্বারা কি এই দুঃখিনীর কোনও উপকার হবে?

চেয়ে দেখলুম আপন মনোলোকে মৌন মাধবীর পানে। অনেক ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কেটে গেল। এক সময় বললুম—"মাধবী! এক পুত্রকে হারিয়ে বহু পুত্রের মধ্যে নিজেকে যদি ডুবিয়ে দাও, দোষ কি তাতে—তার চেয়ে বড় সুখ কি আর আছে।" বিস্মিত দৃষ্টি তুলে আমার পানে চেয়ে শুধালো—"কি বলছেন আপনি! আমি যে বুঝতে পারছি না।" বললুম—"মাধবী! তুমিই তো বললে বিশ্বের সব শিশুদের মাঝ থেকেই তোমার খোকা তোমায় হাতছানি দেয়। তবে কেন তুমি নিজেকে তাদের মাঝখানে হারিয়ে ফেলতে পারো না?"

খানিক স্তব্ধ থেকে মাধবী বললো, "গ্রামে গ্রামে পথে ঘাটে আমি তো সেই চেষ্টাই করে বেড়াই। তাদের রোগে ঔষধ-পত্র দিয়ে আসি, যখন যা জোটে খাইয়ে তাদের তৃপ্ত করতে চেষ্টা করি, প্রাণ ভরে সেবা করি, তাদের মুখের সে অমিয় হাসি আমায় অন্য লোকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সে আনন্দ আমি হারিয়ে ফেলি, আমার মন ভরে

না—কর্ম্মের অবসরে আমার নিরালা ক্ষণগুলি যে সেই কবে হারিয়ে-যাওয়া খোকার অভাবে বিধুর হয়ে ওঠে—এই বঞ্চিত জীবনে সেই যে আমার একমাত্র সম্বল—সে যে আমার দুঃখ-সমুদ্র মন্থন করা একটি মাত্র অমৃতবিন্দু।"

বললুম মাধবী—"তোমাদের এ আশ্রয় তো ঋষির আশ্রম। এ আশ্রমেই কেন এই সব শিশুদের ডেকে এনে আশ্রয় দাও না। মাধবী বুঝতে পারলো না, বললো—সে কেমন করে হয়? এ আপনি কি বলছেন? বললুম, "এ আশ্রমেই একটি বিদ্যালয় করো না—তারা সবাই আসবে তোমার কাছে, মানুষ হবে—নিজেদের দেশের কথা, বড় বড় মনীষিদের কথা শুনবে—তোমার পিতার ঋষিতুল্য চরিত্র দেখে তারাও তাদের চরিত্র গড়ে তুলবে। সে যে কতখানি আনন্দ, কত বড় দান, একবার ভেবে দেখ তো!"

আনন্দের আতিশয্যে ঝল্‌সে উঠলো মাধবী—"এ কি সম্ভব? এ আপনি কি বলছেন?" হেসে বললুম, "কেন নয়? ছাত্র-ছাত্রী—মানে তোমার পোষ্য পুত্র-কন্যার সংখ্যা তো বড় কম নয়!"

বললো—"যান্! এ আপনার ঠাট্টা। জানেন আমি কিছুই লেখা-পড়া জানি না। সামান্য যা শিখেছি সে শুধু বাবার চেষ্টায় ও সহায়তায়। এই বিদ্যে নিয়ে কি কাজ করা চলে?"

বললুম, "বেশ তো মাধবী—যদি দরকার হয়, আমি তোমার দোসর হবো। তা ছাড়া দাদাজী কি বলেন শুনে দেখলে হয়।"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে উঠলো—"এ তুমি সত্যি বলছ?—কিন্তু কেন? কেন তুমি আমার জন্য এ দায় নেবে?" সাগ্রহে বললুম, "কেন করব না ভাই? আমারও যে বেকার জীবন ভার হয়ে উঠেছে। তোমাদের মত মহতের আশ্রয়ে যদি একটা কাজ জোটে, তাকে যে পরম আশীর্ব্বাদ বলেই মনে করব।"

স্তব্ধ হয়ে বসেছিলুম দুজনা বহুক্ষণ···হঠাৎ রাতের প্রহর জানিয়ে দূরে কাছে শিয়ালেরা ডেকে উঠলো—

মাধবী সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো····কি যেন বলতে চাইলো, কিন্তু সঙ্কোচ বুঝি বাক্ রুদ্ধ করে রাখলো। তবু মনে হলো আজকের এই রাত আমাদের এমন এক গ্রন্থি দিয়ে বেঁধে গেল জন্মজন্মান্তরেও যাকে ছিন্ন করার শক্তি আর আমাদের নেই।

কাল সারাদিন মাধবীর দেখা পাই নি—বিকেলে আজ একবার দেখা হলো, আমার পানে দৃষ্টি তুলেই চলে গেল সে। কেমন যেন বিষন্ন ম্লান মনে হলো। কিছুই বুঝতে পারলুম না—মনে হলো হয়তো সেই ছেলেটির আবার কিছু হয়ে থাকবে, নয়তো আর কার। চেয়ে দেখি বাগানে নতুন চারা লাগান হবে, মাটী তৈরী করা হচ্ছে তাই। কেমন যেন বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে গেল ; নেমে পড়লুম বাগানের মাটী কোপানোর কাজে। সমস্ত সকালটা কোথা দিয়ে যে কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারলুম না। সঙ্গীরা আমার মহা খুসী আমায় পেয়ে। কতদিন তো এখানে এসেছি, কিন্তু এমন আনন্দ বুঝি একটি দিনও পাই নি। বেলা গড়িয়ে কখন সূর্য্য মাঝ গগনে উঠেছে বুঝতেই পারি নি আমরা। সারা অঙ্গে কাদা-মাটি মেখে হাল্‌কা মন নিয়ে এগিয়ে চলেছি আশ্রমের কুয়োতলার দিকে—হঠাৎ রান্নাঘরের দাওয়ায় দৃষ্টি পড়তে দেখি নিষ্পলক চোখে আমার পানে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। সহাস্যে কথা বলতে যাবো কাছে গিয়ে—নীরবে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতর। মনে কেমন যেন ধাক্কা লাগল, মাধবীকে তো কখনও এমন ধারা ব্যবহার করতে দেখি নি! আজ সকালে জলযোগের কথা আমি একেবারেই ভুলেছি। নিয়ম মত তার জন্য সত্যি মিথ্যা বহু কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথা। কিন্তু মাধবী যে একটা কথাও বললো না। মন বললো কোথাও

একটা তার কেটেছে নিশ্চয়। মনে মনে বললুম, ধৈর্য্য ধরো এখনি সব বুঝতে পারবে—আবার হয় তো মাধবী করবে অন্তর্ধ্যান আর দাদাজীর বাক্সবাহক কম্পাউণ্ডার হয়ে সব রহস্যের সমাধান করে ফেলবো আমি।

আহারে বসে বার বার চেষ্টা করলুম মাধবীর সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু সে অবসর সে দিলো না—নীরবে আমাদের পরিবেশন সমাধা করে আত্মগোপন করলো সে। আশ্রমবাসীদের সঙ্গে হৈ-চৈয়ে মেতে আমিও চলে গেলুম অন্যত্র।

সন্ধ্যার দিকে আশ্রমে ফিরছি, দেখি অন্যমনা হয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছে মাধবী—আমার উপস্থিতি সে বুঝতেও পারলো না। তার পাশে বসে শুধালুম—"কি মাধবী! অত কিসের ভাবনা?" চমকে উঠলো সে, আমার পানে ক্ষণেক ব্যথিত দৃষ্টি মেলে নত মুখে বসে রইলো। যতদিন এখানে এসেছি আমায় দেখে মাধবী কথায় মুখর হয়ে উঠেছে, মনে হতো এতদিন বাংলায় কথা না বলার যত অসুবিধা ঘটেছিলো আমায় দিয়ে মাধবী তা পূর্ণ করে নিতে চায়—পাথর-চাপা ঝরণা যেন ছাড়া পেয়েছিলো! কিন্তু আজ কয়দিন ধরে কেন এ ব্যতিক্রম? ভাল লাগলো না—শুধালুম, কি হয়েছে মাধবী? খোকার কথা মনে পড়েছে তোমার? এস! আজ আমায় তোমার খোকার কথা বলো। সব—সব শুনবো আমি সেই ছোট্ট বেলাটি থেকে—"

আপন মনেই আমি বকে চলেছি। মাধবী যে বাক্যহীনা সে দিকে খেয়াল নেই। অনুরোধ করে শুধাই—"বলো মাধবী! কি হয়েছে তোমার! ব্যথিত বিহ্বল দুই চোখ তুলে আমার পানে সে তাকালো—বললো, কিছুই হয় নি ভাই—আমি যাই, বাবার পূজো বোধ হয় সাঙ্গ হলো। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল ক্লান্ত চরণে—নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম আমি।

সকালে উঠেই চলে গিয়েছিলুম গ্রামের সেই ছেলেটির কাছে। তাকে নিয়ে হাজির হলুম আশ্রমে। দুই জনে মিলে চিৎকারে সচকিত করে তুললুম আশ্রম। পুজোপাঠ ফেলে হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন দাদাজী। কোথায় ছিল মাধবী, ছেলেটার ডাকাডাকিতে হাসিমুখে এগিয়ে এলো সে, দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে চলে গেল ছেলেটা মাধবীর কোলে। সকৌতুকে বললুম, দেখলে"তো মাধবী! কি অকৃতজ্ঞ—এতটা পথ যে কোলে করে বয়ে আনলুম, তার জন্য একবার ফিরেও তাকালো না....একেই বলে বেইমান্!" সহাস্যে দাদাজী বললেন, "এ তুমি ঠিক বলেছো ভাই! শুধু এ ছেলেটাই নয়, মাধবী-মার সব কটি পোষ্যই এমনি ধারা অকৃতজ্ঞ, মাকে পেলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়।" সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সহাস্যে আমার দিকে চেয়ে থাকে মাধবী। যাক্ মাধবীর মনের মেঘ যে কাটাতে পেরেছি সেই আমার ঢের। কৌতুক হাস্যে দাদাজী বললেন, "তুমি ভাই ভীষণ ভাল হবে হে—আমার সঙ্গে কাজে লেগে যাও!"

সহাস্যে শুধাই,"তুমি কি বল মাধবী? হাসিমুখে মাধবী বললো—"যান্ আপনি বড় দুষ্টু, কেবল মানুষকে ঠাট্টাই করেন!" প্রতিবাদ করে বললুম, "মিথ্যা কথা—একেবারেই অমূলক এ অপবাদ। মাধবী ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে—যেতে যেতে কটাক্ষে শুধু কৌতুক তাড়না করে গেল।

হাল্কা মন নিয়ে আমিও পরম উৎসাহে নেমে গেলুম মাটী কোপানোর কাজে। হাসিমুখে আমাদের উৎসাহ দিতে এসে বসলেন স্বয়ং দাদাজী।

সন্ধ্যার দিকে দাদাজী আমলকি তলায় পায়চারী করছিলেন। কি সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি! অন্যমনে গুণগুণিয়ে ভজনের একটি কলি আওড়ে চলেছেন। নীরবে তাঁর সহচারী হলুম। প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে একবার তাকালেন। গান থামিয়ে শুধালেন—কি ভাই শরীর

ভাল তো! ক্ষণপরে বললেন—একটু চিকিৎসা-জ্ঞান সবারই থাকা ভাল। বিশেষ করে এ রকম অস্থানে যাদের বাস করতে হয়। কি বল হে! বুড়ো হয়েছি, এ আর ভাল লাগে না। মন ছুটি চায়, কিন্তু এমনই জড়িয়ে পড়েছি এদের নিয়ে! বিশেষ করে মাধবী মার অনুরোধ আমি যে কিছুতেই এড়াতে পারি না—বেচারী একা আর কতই বা সামলায়। লোকগুলোও হয়েছে তেমনি, হাঁচি-কাশিতেও এসে উৎপাত করে। আবার ভাবি তবু আমার মাধবী মাতো এদের নিয়ে কিছুটা ভুলে আছে। আহা! বেচারী জন্মদুঃখিনী, এমন মেয়ের কপালে নারায়ণ এমন দুঃখও লিখেছেন। সবই ভবিতব্য বাবা—জন্মান্তের কর্ম্মফল মার আমার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে কেটে গেল কিছুক্ষণ—আবার বললেন, "তুমিও বাবা একটু একটু আরম্ভ করে দাও! তোমাদের হাতে ভার দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।" বললুম,"বেশ তো আপনি আমায় একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিন। আমারও বেকার জীবনের একটা হিল্লে হয়—সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে লোকের যদি এত উপকার হয়, তার বড়ো আর লাভ কি দাদাজী!" মহা খুসী হয়েদাদাজী বললেন—"তুমি যে এ কথা বলবে এ আমি জানতুমবাবা! আশীর্ব্বাদ করছি ভাল হবে তোমার!" কি জানি কেন সেই বন্দনাময় গোধূলি লগ্নে এ মহামানবের চরণ স্পর্শ করে আমার মনে হলআমি যেনধন্য হয়ে গেলুম। কথায় কথায় জানালুম তাঁকে আমাদের পাঠশালা খোলার কথা। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন তিনি—তাই করো বাবা! তাই করো! মাধবী-মা আমার একটু যেন আনন্দ পায়!

ভোরবেলা নিঃশব্দে আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম হরিদ্বারের পথে। উদ্দেশ্য নতুন পাঠশালার জন্য সামান্য যা উপকরণ—অর্থাৎ শ্লেট-চক-প্রথমপাঠ কয়েকটি ও আরও যা টুকিটাকি লাগবে কিনে নিয়ে গিয়ে মাধবীকে একেবারে অবাক করে দেবো। সারাদিন যখন

কারণে অকারণে টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছি কেবলই মনে পড়ছে মাধবীর মুখ। আশ্রমে ফিরে কেমন করে তাকে অবাক করে দেবো মনে মনে তারই মহড়া দিয়েছি। পথে দেখি এক জায়গায় ছোট মেলার মত বসেছে। নানা অল্প মূল্যের গ্রাম্য জিনিষ-পত্র বিক্রি হচ্ছে এখানে ওখানে। মাধবীর নতুন স্কুলের শিশু ছাত্রদের জন্য শিশুর মনোলোভন কিছু রঙ্গীন খেলনাও সঞ্চয় করে নিলুম। এটা ওটা দেখতে দেখতে এক জায়গায় দু'টি গালার বালা বড় পছন্দ হয়ে গেল—মনে পড়ে গেল মাধবীর নিরাভরণ হাত দু'খানি। আশ্রম-দুহিতা সে, কিন্তু সামান্য এ মাটীর অলঙ্কার এ কি অশোভন হতে পারে? সযত্নে সে দুটি সঞ্চয় করে নিলুম। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দ্রুত পায়ে পথ কেটে চলি ঘরে ফেরার আগ্রহে। মানুষের বন্ধন সে বুঝি চিরন্তন! এক বন্ধন যায় অন্য বন্ধন আসে—আজ যে কেবলই মাধবীর কথা মনে পড়েছে! শুধু মনে পড়াই নয়, এই যে গৃহে ফেরার জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যস্ততা বোধ করছি এ তো মাধবীরই জন্য এ আমি অস্বীকার করবো কেমন করে? আমার অজান্তে কখন এসে আপন স্থান করে নিয়েছে আমার মানসলোকে মাধবী এ তো আমি বুঝতেও পারি নি। নানা অবান্তর চিন্তায় ছেদ টেনে চোখের সামনে দূরে স্বপ্নের মত চন্দ্রালোকে ফুটে উঠলো ছোট আশ্রমটি। মানুষের আশ্রয় যে কত কাম্য হয়ে ওঠে এক এক সময় তা এই সব মুহূর্তগুলিতেই বুঝতে পারি। আমার দেহমন যেন আকুল হয়ে উঠল ঐ গৃহাঙ্গনের মাটী স্পর্শ করার জন্য। দূর থেকে দেখতে পেলুম আশ্রম দ্বারে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। আমায় দেখে খুসীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার পথ-চাওয়া চোখ। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে বলে উঠলো, "কোথায় পালিয়েছিলে সারাটা দিন! এত রাতে ফিরলেই বা কোথা থেকে? আমার যে কি ভাবনায় কেটেছে সারাদিনটা।" মনে হলো আশ্রমের সমস্ত আকর্ষণ যেন শেষ

হয়ে গেছে। ইচ্ছে হলো যে দিকে দু'চোখ যায় আমিও চলে যাই। তুমি বড় বে-হিসেবী—বড় নিষ্ঠুর! তুমি বোধ হয় সারাজীবন শুধু মানুষকে ভাবিয়েই বেড়িয়েছো ?

বড় আনন্দ, বড় হাল্‌কা মন নিয়ে এ আশ্রমে এসে পৌঁছেছিলুম —মাধবীর কথা আমায় বড় আঘাত দিলো—মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা। বিস্মিত বিহ্বল হয়ে তার পানে তাকালুম—তবে কি মাধবীও আমায় ভালবেসেছে। এ কয়দিনের বহু তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে গেল। মনের ভেতরটা অকারণে হাহাকার করে উঠলো—স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম তার পানে চেয়ে।

ততক্ষণে মাধবীও সম্বিত ফিরে পেয়েছে। মুখে কৌতুক হাস্য ফুটিয়ে বলে উঠলো, "সওদাগরীতে যাওয়া হয়েছিলো তা বলে গেলেই হতো।"

বললুম, "মাধবী তোমায় অবাক করে দেওয়ার নিছক আনন্দ-টুকুর লোভ সংবরণ করতে পারি নি, তাই পালিয়েছিলুম কিছু না বলে—তুমি কিছু মনে করো না!"

কপট ক্রোধে মাধবী বললো, "থাক্ আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না —ঢের হয়েছে মশাই।"

চেয়ে দেখি পুঁটুলি খোলা হয়ে গেছে ততক্ষণে মাধবীর। শিশুর মত আনন্দে মুখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই সব শিশুর মনোলোভন বস্তুগুলি নিয়ে। বললুম, মাধবী, এ তোমার নতুন স্কুলের নবীন অতিথিদের জন্য—কাল দাদাজীকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি তোমার এই স্কুলকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। উচ্ছসিত হয়ে মাধবী বলে উঠলো, "বেশ হবে ভাই—এই সামনের মাঘী পূর্ণিমায় দাদাজীর জন্মদিন, সেই শুভদিনেই আমরা আমাদের স্কুল আরম্ভ করে দেবো—কি বলো ? বললুম, তাই হবে মাধবী! ধুলো পায়েই দাওয়ায় বসতে যাচ্ছি, মাধবী তাড়া দিয়ে উঠলো—এখানে নয়, একেবারে স্নান সেরে খেতে বসবে

চলো, রাত ঢের হলো যে। জানো বাবাও আজ কতবার তোমার খোঁজ করেছেন, কি অন্যায় বলো তো তোমার! যাই দেখি তিনি জেগে আছেন নাকি—তুমি এসেছো এবং কোথায় বা ছিলে সারা দিন—এ সংবাদটা তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে আসি।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল—আমার পর দেখি মাধবী সামান্য এক পাত্রে সামান্য তার আহার নিয়ে খেতে বসলো—আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধালুম—এ কি মাধবী! তুমি কেন খাও নি? আমি যদি আজ না ফিরতে পারতুম তুমিও কি উপবাসে থাকতে? এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় মাধবী—একান্তই বাড়াবাড়ি। মুখখানা তার ম্লান হয়ে গেল—বললো, "ও তুমি বুঝবে না! তবে আমারও ভুল হয়ে গেছে।" অবাক হয়ে শুধালুম, "কি?"

বললো—এই তোমার সামনে খেতে বসায়—নইলে তুমি তো জানতেও পারতে না, খেয়াল করি নি। ভাবলুম এত রাতে আর শূন্য রান্নাঘরে একা একা না খেলেই কি নয়! এক আধ দিন না খেলে শরীর ভালই থাকে, তা ছাড়া এ আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু ভেবেছিলুম তুমি নিশ্চয়ই থাকবে আমায় একা একা খেতে দেখলে, আর সেই অবসরে আমারও শোনা হয়ে যাবে তোমার সারা দিনের সওদাগরীর কাহিনী। সহাস্যে কাছে বসে বললুম, "তাই বলো—তা এক সঙ্গে বসলেই হতো।" জবাব দিলো—"যাও! তাও কি হয়!"

বললুম, "কেন হয় না? আমি কিন্তু ঢের বেশী খেয়ে ফেলতুম এমন একজন আহারসঙ্গিনী পেলে।" বললো, "চুপ করো! তোমার সকল কথায় ঠাট্টা।"

গল্পে গল্পে বহুক্ষণ কেটে গেছে; খেয়াল করি নি—সম্বিত ফিরে পেয়ে মাধবী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, "অনেক রাত হলো ভাই, তুমি সারা দিনের পথক্লান্ত, আমি শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের ইচ্ছেই পুরো করে যাচ্ছি—ছি! ছি! কিছু মনে করো না ভাই!"

এমন হাল্কা, এমন উচ্ছসিত আমি মাধবীকে কখনও দেখি নি—এ যেন চিরজানার মধ্যেও হঠাৎ এক নতুন আবিষ্কার। কি এক যেন অকারণ পুলকে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে···তার মনের সে আনন্দ-তরঙ্গের শব্দ আমার মনেও যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে চায়।

মাধবী চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ তাকে ডেকে বললুম, শোন মাধবী। কাছে এসে দাঁড়লো সে—উত্তরীয় প্রান্তে আমার তার জন্যে আনা সেই মাটীর বালা জোড়াটি ছিল, গোপনে বের করে তার হাতে তুলে দিলুম—বললুম, সামান্য এ আমার উপহার, তুমি যদি গ্রহণ করো বড় খুসী হবো। তোমায় মনে করেই এ আমি সংগ্রহ করেছি। তোমার ঐ নিরাভরণ হাত দু'টি দেখে বড় ব্যথা পাই।

কি থেকে কি হয়ে গেল—কি জানি কিসের ব্যথায় মাধবী ম্লান হয়ে গেল। শুধু বললো, তোমার এ সামান্য দান অসামান্য হয়ে রইল আমার মনে—এমন দিন এর আগে আর আমার জীবনে কখনও আসে নি। চেয়ে দেখি তার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে। নিঃশব্দে সে বালা দু'টি মাথায় ঠেকিয়ে আপন ঘরের দিকে চলে গেল। রাতের সে স্তব্ধ প্রহরে বোবা ব্যথায় ডুক্‌রে উঠলো আমার মন—কি জানি কেন নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হলো।

সকালে বাগানের দিকে চলেছি—দেখি মাধবী সেখানে শাক-শব্জী সংগ্রহের তাগিদে উপস্থিত রয়েছে। সদ্যস্নাতা শুচিশুভ্র রূপ। গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়ীখানি যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্য্যকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার উপহারের মর্য্যাদা দিয়েছে মাধবী—অসামান্য হয়ে উঠেছে সে মাটির কঙ্কন দু'টি। অকারণ আনন্দে ভরে উঠল মন। নিঃশব্দ পায়ে কাছে গিয়ে বসলুম, আশ্রমে কি আজ বনলক্ষ্মীর আবির্ভাব? চমকে উঠলো মাধবী—আমার আগমন সে লক্ষ্য করে নি। আমি তার হাত দু'টির দিকে চেয়ে আছি দেখে

সে বললো—জানো ওখান থেকে এসে কাল আমার আর কিছুতেই ঘুম এলো না—এমনি গিয়ে বসেছিলুম বাবার দরজাটায়। কখন তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, কাছে এসে বসলেন। এমন আমাদের কত রাতই কেটেছে! ওঁকে কি আমি কম দুঃখ দিয়েছি! আমার হাতে তখনও এ বালা দুটি ধরা ছিল। হঠাৎ বললেন, পরো না মা! এমন তিনি কতবার বলেছেন। তোমার মতই আমার এ নিরাভরণ হাত তাঁরও সয় না। তাঁকে সব বললুম—বললুম তোমার সারা দিনের পালানোর কথা। হঠাৎ সস্নেহে বলে উঠলেন, কেউ যদি তোকে স্মরণ করে এনে থাকে—কেন নিবি না মা তার শ্রদ্ধার দান, স্নেহের দান। মনকে কি সঙ্কুচিত করতে হয় মা! খুলে দে তোর মনের বন্ধ কপাটখানা—দেখবি সেই খোলা পথেই আসবেন তোর জীবন-দেবতা। নিজের হাতে তিনি পরিয়ে দিলেন আমায় তোমার এ উপহার। আজ সারা সকাল থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে তাঁর কথাগুলি তোমায় বলে আসি। তিনি বহুবার বারে বারে এ কথা বলেছেন—কিন্তু আমার অন্তর কিছুতেই তার বন্ধ কপাটখানা খুলে রাখতে পারে নি। যদি বা বহু চেষ্টায় তা খুলেছি, আবার বন্ধ হয়ে গেছে—মুক্ত আলোর কোলাকুলি কিছুতেই যে স্থায়ী করতে পারি না সেখানে, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু যে দিন থেকে তুমি এলে কেমন যেন এক পরিবর্ত্তন এল মনে। আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে বড় মন চায়—যদি কিছু মনে না করো তো বলি। বললুম, বল তুমি তোমার জিজ্ঞাসা নিঃসঙ্কোচে—আমার জ্ঞানে যেটুকু মনে হবে তা আমি অকপটে তোমায় জানাবো। তোমার কাছে তো আমার গোপন কিছু নেই।

বললো—বল তো সংস্কার বড় না মনের সত্য বড়?

বললুম—এ বড় জটীল প্রশ্ন মাধবী,—তবে আমার কাছে মনের সত্যের বাড়া কোনও ধর্ম্ম নেই। আমি সমাজ-সংস্কার ওসব

কিছুই জানি না। তবে তোমার এ জিজ্ঞাসার সমাধান তিনিই সব চেয়ে ভাল দেবেন যিনি তোমার অন্তর্য্যামী—তোমার পথ-নির্দ্দেশ, তোমার জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান সে তো তোমার মনই করবে মাধবী! আমার পক্ষে এ যে স্পর্দ্ধা, এ যে অনধিকার! হঠাৎ বলে বসলো—ধরো, এ প্রশ্ন যদি তোমার বৃন্দাবনের রাধা করতেন কি জবাব দিতে তুমি তাঁকে? স্তম্ভিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তার পানে—একান্তই অপ্রত্যাশিত এ প্রশ্ন। তারপর যা সত্য তাই বললুম তাকে, অন্ততঃ আমি যেটুকু জেনেছি রাধার মনের কথা। বললুম—এমন প্রশ্ন সে কখনও করবে না মাধবী! সব চিত্ত-দৌর্বল্যকে জয় করেছে সে—সে আমাদের চেয়ে অন্য লোকের মানুষ মাধবী! আমার একান্ত আতুরতার যে জবাব সে আমায় আভাসে দিয়েছিল সেই কথাটিই শুধু তোমায় বলতে পারি, তার বেশী নিজেই যে তার সম্বন্ধে কিছু জানি না। অনুনয় করে মাধবী শুনাল—বল তুমি! সেইটুকুই যে আমার জানতে সাধ হয়। মন বলতে চাইল না, তবু বলতে হলো—বললুম, জান মাধবী! সে শুধু আমায় একটা গানের কলি শুনিয়েছিল, আর কিছুই নয়!

সাগ্রহে সে বললো—বল তুমি আমায় গানের সে কলিটি!

বললুম—সে গেয়েছিলো "মেরে ত গিরিধারী গোপাল দুসরা ন কোই"। মাধবী যেন কোন অপ্রত্যাশিত আঘাতে ম্লান হয়ে গেল। মন আমার উদ্বেল হয়ে উঠলো অকারণ বেদনায়। বললুম—ব্যথা পেয়ো না মাধবী! রাধার এ কথা আমি আজও মেনে নিতে পারি নি, তাইতো ছটফটিয়ে বেড়াই, পথে পথে হাতড়ে মরি! আমাদের চোখে সে যে অন্য লোকের মানুষ, মাধবী!

মাধবী শুধু জবাব দিলো—তোমার কথাই সত্য ভাই! সত্যই সে পাষাণী! মরদেহে মর্ত্তের ক্রন্দনকে সে কোন মন্ত্রে জয় করেছে বলতে পারো? ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে তাকে একবার শুধাই যে কি

পেয়েছ তুমি ? কোন পরশমণির ছোঁয়া ? আশ্রমের কাজে ডাক এসে পৌঁছেচে মাধবীর ততক্ষণে, বিষণ্ণ ম্লান মুখে নীরবে সে চলে গেলো। বিড়ম্বনায় ভরে উঠলো আমার মন, মনে হল মাধবীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমি কেবল নতুন সমস্যারই সৃষ্টি করছি পদে পদে। সারা বিশ্বের রং যেন ঘোলাটে হয়ে গেল !

পরের দিন অপরাহ্নে দাদাজী চলেছেন মাঠের পথে, সঙ্গে তাঁর একটি অনুচর। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গ নিলুম। আমায় দেখে প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠলো তাঁর মুখ। পড়ন্ত রৌদ্রের স্তিমিত আলোয় দেখলুম অস্তাচল মহিমা। দিনান্তের কূলে শ্রান্ত সূর্য্য দূরের পাহাড় চূড়ায় থমকে দাঁড়িয়েছে যেন—শেষ বারের মত সে যেন তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে বসুন্ধরার বুকে !

মহর্ষি কাকে বলে দেখি নি, দেখলুম জীবন-সায়াহ্নের গোধূলি লগ্নে আপন মহিমায় মহিমান্বিত আমার সামনে দণ্ডায়মান এক মহামানবকে। দেখলুম সে সৌম্য অন্তরে করুণার ফল্গুধারা চির-প্রবাহিনী—দেখলুম তপস্যা তাঁর বিশ্বের কল্যাণপথে ধাবিত।

রূপ কাকে বলে জানি না—কিন্তু এই পড়ন্ত রৌদ্রে এই নির্জ্জন বনপ্রান্তের ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে জীবন্ত অপরূপকে দেখার সৌভাগ্য আমার হলো—সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করলুম আমি আমার এ সৌভাগ্যকে।

হাসির আলোয় নির্জ্জন প্রান্তর উদ্ভাসিত করে দাদাজী বললেন—এস ! এস ভাই !

অনুচরটিকে বললেন, তুই এবার যেতে পারিস্ বাবা ! একজন কেউ কাছে না থাকলে আজকাল আর ভরসা পাই না ভাই ! বুড়ো হয়েছি, আর এ প্রাণহীন যষ্ঠিতে নির্ভয় হতে পারি না—বলে সহাস্যে দেখালেন তাঁর লাঠিখানি। বিনীত হাস্যে জবাব দিলুম—বহু

সৌভাগ্যে এ সচল যষ্ঠি হবার সুযোগ জোটে—মাধবীকে আমি ঈর্ষা করি এ বিষয়ে, ভাল করেই জানি কি না ও মনে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ব্যথিত হয়ে বললেন—মাকে আমার ঈর্ষা করার কিছু নেই বাবা! মা আমার চিরবঞ্চিতা—চিরদুঃখিনী। কোন শৈশবে বাবাকে হারিয়েছে, তার অনাথিনী মা অতি কষ্টে তাকে লালন করেছিলেন। গাঁয়ের সমাজ আজও বড় নিষ্ঠুর - দুর্ব্বলের সব সময়েই বিপদ। পাঁচজনার চাপে অবস্থার বিপাকে ওর মা বাধ্য হয়েছিলো এক হতভাগার হাতে ওকে তুলে দিতে। জীবনের সবটাই মার আমার দুঃখের ইতিহাস বাবা! সে আর বলে লাভ কি—এ কিছু নতুনও নয়, অসাধারণও নয়, অহরহঃ কত মানুষের এমন অপমৃত্যু ঘটে চলেছে, কে খোঁজ রাখে তার! দেবতা-দানবের লীলা তো ইচ্ছাময় এই পৃথিবীতেই দেখিয়ে চলেছেন—কিন্তু বাবা একটা কথা আজও ভাল করে বুঝতে পারি নি—তাঁর রাজ্যে নির্দ্দোষ কেন শাস্তি ভোগ করে? নিরপরাধ কেন ব্যথা পায়? এর মাঝেও নিশ্চয়ই কোনও না কোন কল্যাণ আছে—দৃষ্টিবান্ না হলে তো সব জিনিষটা ভাল করে দেখা যায় না। মানুষ কূপমণ্ডুক, সে তার আপন অভিজ্ঞতার চারপাশেই মাথা কুটে মরে, তার সমুদ্র যে সেই গোষ্পদেই সীমায়িত—তবু বাবা মন মানতে চায় না। মায়ের আমার অমন রূপ, এত গুণ, কিন্তু চিরবঞ্চনায় সে কোন বিড়ম্বিতা? মানুষ বুঝি সত্যকার কিছু না পেলে সত্যকার ত্যাগী হতে পারে না—ক্ষোভের জ্বালা যে বড় জ্বালা বাবা!

শুধু আঘাত, শুধু বঞ্চনা, শুধু নির্য্যাতনের ইতিহাস নিয়ে কি পথ চলা যায় বাবা! মানুষ যে পাথেয় চায়, পথের সম্বল চায়।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি আমার সহযাত্রীর পানে—এ যেন সেই রাধার কথারই প্রতিধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি এ মহামানবের মুখে। কাকে এঁরা বার বার পাথেয় বলে উল্লেখ করেন? পথের সম্বলটাই

বা কি? স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালবাসার মধ্য দিয়েই তবে কি ত্যাগ আসে? এ কিসের ইঙ্গিত করেন এই তপস্বীরা?

আপন আপন চিন্তায় মগ্ন দুই মৌন পথিক পথ কেটে চলেছি। ফেরার পথে দাদাজী বলেন—জানো বাবা! কয়দিন আগে হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে—যা ভেবেছিলুম তাই, মাধবী-মা দালানের ওপর সিঁড়ির ধাপে চুপ করে বসে আছে। আপন দুঃখ-সাগরে এমনই ডুবে আছে সে যে আমার উপস্থিতি বুঝতেও পারলো না। মার আমার দুঃখ ছাড়া তো মনে পড়ার কিছু নেই বাবা। একেবারেই কোন সম্বল নেই। কাছে গিয়ে দেখি দু-চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে তার—নিরাভরণ হাত দু'খানি চাঁদের আলোয় আরও যেন রিক্ত হয়ে উঠেছে – মা আমার যেন মূর্ত্তিমতী রিক্ততা। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, হাতে মায়ের দু'টি কঙ্কন। আর একদিনের ঘটনা মনে পড়ে গেলো—মাকে আমি অনুরোধ করেছিলুম তার নিরাভরণ হাত দু'টিতে কিছু পরতে—আমি গৃহত্যাগী, তবু ও যে আমার কন্যারও অধিক। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিলো, এ তুমি বলো না বাবা। যার জন্য আভরণ সেই যে আমায় নিরাভরণা করেছে। বিচলিত ব্যথিত মাধবী আমায় স্তম্ভিত করে বলে উঠেছিলো তার মর্মজ্বালা। বিয়ের সময় ভিখারিণী মা তার অনেক কষ্টের সম্বল বালা দু'গাছি মেয়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এ দুটো নষ্ট হতে দিস নে মা, এ তোর বাপের দান জানিস্। কত দুঃখ, কত অনটন তাদের গেছে, কতদিন অনাহারে অর্দ্ধাহারে কেটেছে, তবু কখনও তার মা এ দু'টি নষ্ট করার কথা ভাবতেও পারেন নি। সে বালা দুটীতে তার মায়ের যে অনেক সুখের স্মৃতি, দুঃখের কথা জড়ানো ছিল—তিনি যখন তাঁর প্রায় শৈশবে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন, তাঁর শাশুড়ী-ঠাকরুণ তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন এ দু-গাছি বালা। ধনী তারা কোনও দিনই ছিল না বটে, তবে দুঃখও কিছু ছিল না তাঁর প্রথম জীবনে।

দেবতার মত স্বামী, মায়ের অধিক স্নেহময়ী শ্বাশুড়ী, মাধবীর মত কন্যা। তারপর মাধবীর পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আরম্ভ হলো দুঃখভোগের ইতিহাস—একে একে সব গেল, মায়ের আমার বিয়ে হয়ে গেল যখন একান্তই নাবালিকা সে। তারপরের ইতিহাস আর বলার কিছু নেই—সে পাষণ্ড পতি তার একটি দিনের জন্যও তাকে একটু স্নেহ-শ্রদ্ধা করেনি—সামান্য কিছুও কখনও দেয় নি সে বালিকা বধূর মন তোষণে। একদিন মত্ত অবস্থায় কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল মাধবীর মালা দু'টি নিদারুণ লাঞ্ছনার পর—লোকমুখে শুনেছিল মাধবী সে দু'টি গিয়ে উঠেছে তারই হাতে যার কাছে সেই দূরাচারের বেশীর ভাগ রাত কাটে। শ্বাশুড়ী এর বিনিময়ে তাকেই দিয়েছিলেন গঞ্জনা, ছেলেকে ঘরে বাঁধতে না পারার অপরাধে। নারীত্ব তার আজন্ম ধিক্কৃতই হয়েছে বাবা! কোনও দিনও সে একটু আনন্দ পায় নি। আপন দুঃখিনী মায়ের কাছে এ কাহিনী গোপনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো সে, কিন্তু পারে নি—মৃত্যুর আগে এ চরম লাঞ্ছনা তাঁকে জেনে যেতে হয়েছিলো। মাধবী-মা আমার মন থেকে কিছুতেই এ জ্বালা মেটাতে পারে নি, ভুলতে পারেনি এ অপমান। মা যে আমার বড় অভিমানী—কিন্তু বাবা সে রাতে যখন তোমার আনা বালা দুটি পরিয়ে দিলুম কিছু বললো না। আমায় শান্ত হয়ে প্রণাম করলো—মনে হলো তার মনে ধীরে ধীরে আসছে সেই চিরসুন্দরের আবাহন। আশীর্ব্বাদ করি সে নিজেকে খুঁজে পা'ক্—আমিও মুক্তি পাই। মার ভাবনায় আমার বুঝি মরণেও সুখ নেই!

কথায় কথায় আশ্রমে এসে পৌঁছেছি। মাধবী দাঁড়িয়ে ছিলো পথ চেয়ে—কপট অভিমানে দাদাজীকে বললো তুমি এই বাবা! হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে তার মাথায় হাত রেখে দাদাজী বললেন,—দূর পাগ্‌লী! তোর কাছে কি কেউ দাঁড়াতে পারে রে! তুই যে আমার দেবতার চিন্তাও ভুলিয়েছিস্ মা!

ভোর হতে না হতেই আজ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে আশ্রম—একটি দু'টি করে মাধবীর বহু ভক্তের আগমন হয়েছে। মেয়ে-পুরুষ বালক-বালিকায় মিলে বেশ একটি ছোট-খাটো জনতা। সকৌতূকে শুধাই—ব্যাপার কি? সহাস্যে মাধবী এসে বলে—মাঘীর মেলা হবে চার ক্রোশ দূরে মোহন গাঁয়ে—আমরা চলেছি সেইখানেই, তোমাকেও আমাদের সঙ্গী হতে হবে, না হলে ছাড়বো না আমরা!

বিব্রত হয়ে বলি—এ জনতার মাঝখানে আমায় কেন মাধবী? উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো সে—শুন্‌বো না কোনও কথা, যেতেই হবে তোমাকে!

এমন সময় দাদাজী এসে বলেন—জানো বাবা! এই বুড়োকে নিয়েও মা আমার টানাটানি লাগিয়েছে। কি যে হলো মায়ের! তা যাও বাবা—তুমিই না হয় যাও! কেউ না গেলে কি আর রক্ষা আছে!

কলকোলাহলে মুখরিত পথে চুপচাপ্ এগিয়ে চলেছি। মাধবীর আজ কিসের যেন আবেগ এসেছে মনে, উদ্দামতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে চির ধীর মানুষটা। জনতাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে এল সে। মনে হল, তার মনও এ জনতা থেকে আজ বহু দূরে এগিয়ে চলেছে। সেই পথপ্রদর্শক আমি তো নবাগত—পথে ঘাটে এ গ্রাম্য জনতার অর্দ্ধেক যে তার পরিচিত। মাঝ বরাবর এসে একটি গাছতলায় জমিয়ে বসলো সে···প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত করে তুলতে চাইলো আমাকে। যত বলি শৈশবের কথা কিছু মনে নেই, মাধবীর অনুরোধ উপরোধ ততই বেড়ে চলে। বারবার প্রশ্নের ঠেলায় বিব্রত হয়ে বলি—তোমারই মত আপন বলতে আমারও কেউ নেই মাধবী—নেই তাই কোনও পেছু টান।

—হঠাৎ বলে উঠলো—তবে এ গেরুয়া বসন কেন ভাই?

বললুম—নিছক মনের খেয়াল, তাছাড়া দেখতে পাওনা কত সুবিধে এতে, ধুলো-ময়লা সহজে ধরা পড়ে না। আমাদের মত কুঁড়ে মানুষের এ যে একটা আশীর্ব্বাদ মাধবী!

কৌতুক হাস্যে মাধবী বললো—এটা কিন্তু ঠিকই বলেছো ভাই—এমন অকেজো, এমন আল্‌সে আমি দু'টি দেখি নি।

সহাস্যে জবাব দিলুম—ভাগ্য কিন্তু আমার সুপ্রসন্ন মাধবী—এ তোমায় মানতেই হবে। আমাকে নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘুরতে হয় না বেশী দিন—দেখছো না বৃন্দাবনের আখড়া ঘুচে তোমাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় জুটে গেল। সেখানে ছিল শ্রীদামের মত সুহৃদ, রাধার মত হিতাকাঙ্ক্ষিনী—আর এখানে পেলুম দাদাজীকে, পেলুম তোমাকে!

হঠাৎ মাধবী শুধালো—আচ্ছা বলতো আমি যদি মরে যাই, আমার কথা কি তোমার মনে পড়বে?

চুপ করে রইলুম—তারপর বললুম—এ প্রশ্ন কেন মাধবী? কি শুনতে চাও তুমি! চেয়ে দেখি, মুখ তার রাঙা হয়ে উঠেছে হঠাৎ বলে ফেলা এ প্রশ্নে।

বললো—কিছু না, এমনি মনের খেয়াল!

বললুম—এর জবাব তো তোমার মনেই পাবে মাধবী! আমায় কি তুমি ভুলে যেতে পারো?

ম্লান হয়ে সে বললো—জন্ম-জন্মান্তরেও নয়।

নীরবে কেটে গেল বহুক্ষণ—নীরবতা ভঙ্গ করে মাধবী বললো—আচ্ছা তুমি জন্মান্তর মানো?

বললুম—এ প্রশ্ন কেন?

বললো—এইটেই যে আমার সবার বড় ব্যথা হয়ে উঠেছে।

বললুম—কেন?

জবাব দিলো—বন্ধনহীন বন্ধনের জ্বালায় একটা জন্ম জ্বলে পুড়ে

যাচ্ছে—এদের সম্বন্ধ যে আমি আর কামনা করি না। বলতে পারো—কেন এ শাস্তি? জীবনে যে আমায় কখনও ভালবাসলো না, কখনও ভালবাসেনি, তারই সম্পর্ক আমায় জন্ম-জন্মান্তর ধরে বিড়ম্বিত করে চলবে?

কি জবাব দেবো এর। মনে ব্যথা বাজলো। বললুম, এর জবাব আমি কেমন করে দেবো মাধবী—এ যে মানুষের বিশ্বাসের কথা, এর সমাধান এক অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কে দেবে বলো?

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে বললো—তবে কি জন্মান্তরেও মুক্তি নেই আমার এ ভুলের বন্ধন থেকে?

বললুম, মাধবী দাদাজীকে জিজ্ঞাসা করো, হয় তো তিনি তোমার জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে পারবেন—আমি যে একান্তই অজ্ঞ, একান্তই অর্বাচীন ভাই! তবে এইটুকুই তুমি শুনে রাখো, আমার কাছে যে মনের ধর্ম্ম ছাড়া সত্য নেই—আমি তো ভাই সেই পরমতমের ইচ্ছায় সব ইচ্ছা লীন করে দিতে পারি নি!

মাধবীর অনুচর সহচরেরা এসে পৌঁছেছে ততক্ষণে—কলকোলাহলে আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে সে নির্জ্জন প্রান্তর।

সারাটা দিন আজ টো-টো করে কেটেছে মেলার এখানে ওখানে ঘুরে। কারণে অকারণে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নানা জিনিষের বোঝা জমে উঠেছে আমার ও মাধবীর হাতে—মাধবীরই ইচ্ছায় বা খেয়ালে। গোধূলি-ধূসর পথে ফিরে চলেছি আমরা। কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে এ প্রান্তর। ধীরে ধীরে বিশ্ব-চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেল। শীতের সন্ধ্যা কিসের যেন বেদনায় বিধুর বলে মনে হতে লাগলো—মনের কোণে যত রাজ্যের বিফল বাসনা জেগে উঠে ভারাক্রান্ত করে দিল মন। মাধবীর দিকে চেয়ে দেখলুম ম্লান মৌন মুখে স্তব্ধ হয়ে সে পথ কেটে চলেছে। কোথায় হারালো সেই

আনন্দমুখর কলহাস্যময় মানুষটি সকালে যে আমায় পথ দেখিয়ে এনেছিলো ?

কিসের চিন্তায় সে এমন বিধুর হয়ে উঠেছে ? যা কিনেছিলো, সাঙ্গপাঙ্গদের বিলোতে বিলোতে পথের বোঝা পথেই সে প্রায় হাল্কা করে এনেছে।

কিছু দূরে এসে আধো অন্ধকারে দূরে অগ্রবর্ত্তী একটি দলকে দেখা গেল—তারা গান করছে পথে চলতে চলতে—সঙ্গীতের মধুর গুঞ্জনে ভরে তুলছে এ উদাসী প্রান্তর। হাঁটা পথে ব্যবধান কমে ক্রমে আমরা সেই দলের সঙ্গে মিশে গেলুম। গানে গানে পথক্লান্তি আপনি যেন কমে এলো—মন কৌতুহলী হয়ে উঠলো এ উদাসী দলটিকে দেখে—কিছুক্ষণ পরে একটা পথের বাঁকে তারা চলে গেল—আলাপচারীর আর সুযোগ হল না ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। শুধু অকারণ প্রশ্ন মনে মনে উদ্বেলিত হতে লাগল—কোথায় চলেছে এ বৈরাগীর দল ?

বহুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাধবী শুধালো—আচ্ছা ! বৃন্দাবনের রাধার কথা তোমার সব সময়েই মনে পড়ে যায় না ?

বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালুম—সত্যই যে সবার অলক্ষ্যে মন আমার তার কথাই ভাবছিলো—ভাবছিলো সেই প্রথম দিনের কথা যেদিন তার সঙ্গে এমনি ধারাই অচেনা পথ কেটে সর্ব্ব অঙ্গে ব্রজের ধূলি মেখে তার আখড়ায় গিয়ে জুটেছিলুম !

কিন্তু মাধবী কেন এ প্রশ্ন করলো ? তার আচরণ যে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে ! একবার ভাবলুম তাকে প্রশ্ন করি—কি ভেবে চলেছো তুমি এই দীর্ঘ পথ অন্যমনে ? কি আছে তোমার মানস-লোকে ? অহেতুক এ কৌতুক মনেই লয় হয়ে গেল—সারা পথ আর একটি কথাও হলো না। আমায় এড়িয়ে মাধবী আশ্রমে অন্তর্ধান করলো—সে রাতের মত আর তার সঙ্গে দেখা হলো না।

মন আজ অকারণেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলো শীতের একান্ত উদাসী এ সন্ধ্যায়। অশত্থতলায় চুপ করে বসে আছি, এমন সময় মাধবা এলো প্রদীপ দিতে। আমায় দেখে কাছে এসে বসলো। কথায় কথায় বলে ফেললুম—জানো মাধবী ? মানুষ চির একা—মনে মনে মনের মানুষটির জন্য তার চিরন্তন অভিসার। পায় না, তবু খুঁজে মরে। তাই তার অন্তরে গোপন ব্যথার ফল্গুধারা চিরপ্রবাহিত।

আমার এ কথায় চম্‌কে উঠলো সে—বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণেক তাকিয়ে রইলো আমার পানে। হাতে তার সন্ধ্যাপূজার উপচার তেমনি ধরা রইলো। বললো—শোন বন্ধু! আর মিথ্যার আবরণ টানবো না। আমার এ পূজার ডালা দেবতার জন্য নয়, মন আমার এ নৈবেদ্যের ডালা তোমাকেই অর্পণ করেছে। শুনেছি সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নেই—এই আমার একান্ত গোপন মর্ম্মযাতনা। তোমায় না জানালে এ বোঝা আমার বজ্রের মতই ভারী, বজ্রের মতই নির্ম্মম হয়ে পড়ে। পথ আমার হারাতে বসেছে। বলে দাও! বল তুমি! এ কি আমার অপরাধ ? চমকে উঠলুম, ক্ষণিকের জন্য মন মূঢ় হয়ে গেল একথা শুনে, বল্লুম—এখন থাক, তুমি বড় উতলা হয়েছো, এর জন্য হয় তো তুমি লজ্জিত হবে, ব্যথা পাবে, অকারণে মন হয়ে উঠবে বিড়ম্বিত। কি থেকে কি হয়ে গেল, এ তো আমি কোনও দিনও কল্পনা করি নি।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বললে—না বন্ধু! এ আমার ভুল নয়—এ অপরাধ নয়। আমার হৃদয়ের সত্যই আমায় পথ চিনিয়ে দিয়েছে—দিয়েছে পথ-নির্দ্দেশ। তুমি যদি এ অর্ঘ ফিরিয়ে দাও তাতে আমার ব্যথা নেই—নেই কোনও বিড়ম্বনা। শুধু এই জেনো যে আমায় নিয়ে তোমার কোনও দায় নেই। স্তব্ধ হয়ে দুজনা বসে রইলুম—মাধবী যেন মূর্ত্তিমতী শূন্যতা। মন তার কোন্ গহনে কি হাত্‌ড়ে মরছে সেই জানে!

অকারণে মন ভার হয়ে উঠলো—রাধা চিরপাষাণী, সে যে

মানবীয় সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে গেছে। বারবার মনে হলো এর কাছে কিছু গোপন করবো না, অকপটে বলবো মনের সব ভাবনা, সব দ্বন্দ্ব। সেই বললো স্তব্ধতা ভঙ্গ করে—তুমি কেন বিচলিত বন্ধু? আমি তো কিছু নিতে আসি নি, আমি যে শুধু দিয়ে যেতেই এসেছি। পূজারী তার নিবেদনের বোঝা নামিয়ে দিয়ে যায়—সে তো দেখে না, সে তো বিচার করে না দেবতা তার একান্ত নিবেদন নিলেন কি না।

দূরে কাছে শেয়ালেরা ডেকে উঠল রাতের প্রথম প্রহর জানিয়ে। ডানা ঝাড়া দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা নিশাচর পাখী। স্বচ্ছ আকাশ তারার ঝাঁক নিয়ে নির্ব্বাক সাক্ষী হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে—কম্পমান জলে নেচে উঠছে তার ছায়া। কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখি জনশূন্য ঘাটে কেউ কোথাও নেই—কখন সে নীরবে চলে গেছে বুঝতেও পারি নি। নিঃশব্দ পায়ে কুটীরের দিকে এগিয়ে গেলুম, তার ঘরের সামনে দিয়েই আমার যাবার পথ—দেখি সে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বাইরের পানে চেয়ে—খোলা জানালাটা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার চোখে মুখে। মনে হলো, তার দুই চোখ উথ্‌লে জল পড়ছে। কি জানি কেন অব্যক্ত ব্যথায় মন টন্‌টন্‌ করে উঠলো—নিজেকে বার বার ধিক্কৃত করতে ইচ্ছে হলো—মনে মনে ঠিক করলুম আর না, এ আশ্রমও আমায় ছাড়তে হবে এবং আজই।

এক টুক্‌রো কাগজ লিখে রাখলুম—মাধবী আজ আমি চলে যাচ্ছি, হয় তো আবার একদিন ফিরে আসবো তোমার কথার জবাব দিতে—কিন্তু যাবার আগে তোমায় প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি। না জেনে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, অপরাধ করে থাকি তবে ক্ষমা করো! তোমার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে—মনে থাকবে আমার একান্ত দরদী আপন জন বলে। জীবনে যদি কোনও দিন নিজেকে অসহায় মনে করো, নিজেকে একা মনে করো, তবে বৃন্দাবনে রাধার কাছে যেও

সেই তোমায় পথের খবর দিতে পারবে। তাকে ভুল বুঝো না মাধবী! সে আমাদের চাওয়া-পাওয়া, ঈর্ষা, অসূয়ার বাইরে। আমার চেয়ে সে অনেক উর্দ্ধে, তার কাছে আমার কোনও ভয়-ভাবনা ছিল না, আমাকেই সে রক্ষা করেছে অকল্যাণের হাত থেকে। কিছু মনে করো না মাধবী—আমি তুমি প্রায় একই মাটিতে দাঁড়িয়ে। আমার যে গেরুয়া বসন ও কিছু না। আমার দ্বারা পাছে তোমার কোনও অকল্যাণ হয় তাই দূরে সরে যাচ্ছি। বড় ভালবাসা কি শুধু কাছেই টানে মাধবী? এ যে আমার রাধার কাছে শেখা! তোমার কাছে আমার গোপনও কিছু নেই—জেনে রেখো রাধার পাশে তোমার নাম অক্ষয় হয়ে রইল আমার জীবনে। যাবার আগে একান্ত মনে এই আশীর্ব্বাদই করে যাই তোমার সব দোলা, সব দ্বন্দ্ব লীন হয়ে যাক্ সেই আনন্দময়ের পায়ে!

পথের ঝোলা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লুম—যাবার আগে একবার এই দেবর্ষির দরজায় প্রাণের একান্ত প্রণাম নিবেদনের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করতে পারলুম না। আবার ফিরে চলেছি সেই পথ ধরে যে পথে একদিন এসেছিলুম অচেনা মানুষ হয়ে। যিনি সবার সব জানেন সেই পরমতমের কাছে রইলো আমার জিজ্ঞাসা—মাধবীর কাছে কি আমি অপরাধী হয়ে রইলুম?

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	১৬	পংক্তি	৭	অতন্ত্র	স্থলে	অতন্দ্র
,,	২২	,,	১	ব্রহ্মপুত্র	,,	ব্রহ্মাপুত্র
,,	২৮	,,	২৪	সসএঞএগ্রী	,,	সমএঞএগ্রী
,,	৪২	,,	৮	ময়ন্তর	,,	মন্বন্তর
,,	৪৫	,,	২৩	রাজপুরাধীশ	,,	জয়পুরাধীশ
,,	৬৪	,,	২৩	য়চায়ে	,,	রচায়ে
,,	৭৭	,,	১৬	এ ভরা ভাদর	,,	ঈ' ভরা বাদর
,,	৮৬	,,	২	জানলেন	,,	জানালেন
,,	১০৯	,,	১৩	বুঝিলে	,,	বুঝিবা
,,	১২৮	,,	১৬	সন্ধানে	,,	সন্ধান
,,	১৪৫	,,	২৬	অথর্ব্বাবেদ	,,	অথর্ববেদ
,,	১৬৯	,,	২১	উচ্ছসিত	,,	উচ্ছ্বসিত
,,	১৭২	,,	১৩	ভীষণ	,,	ভীষক
,,	১৭৬	,,	৫	আমার	,,	খাওয়ার
,,	১৭৯	,,	১৩	শুনাল	,,	শুধা'ল
,,	১৮১	,,	১৯	কোন	,	কেন